বাংলার মূল

(ORIGIN OF BANGLA)

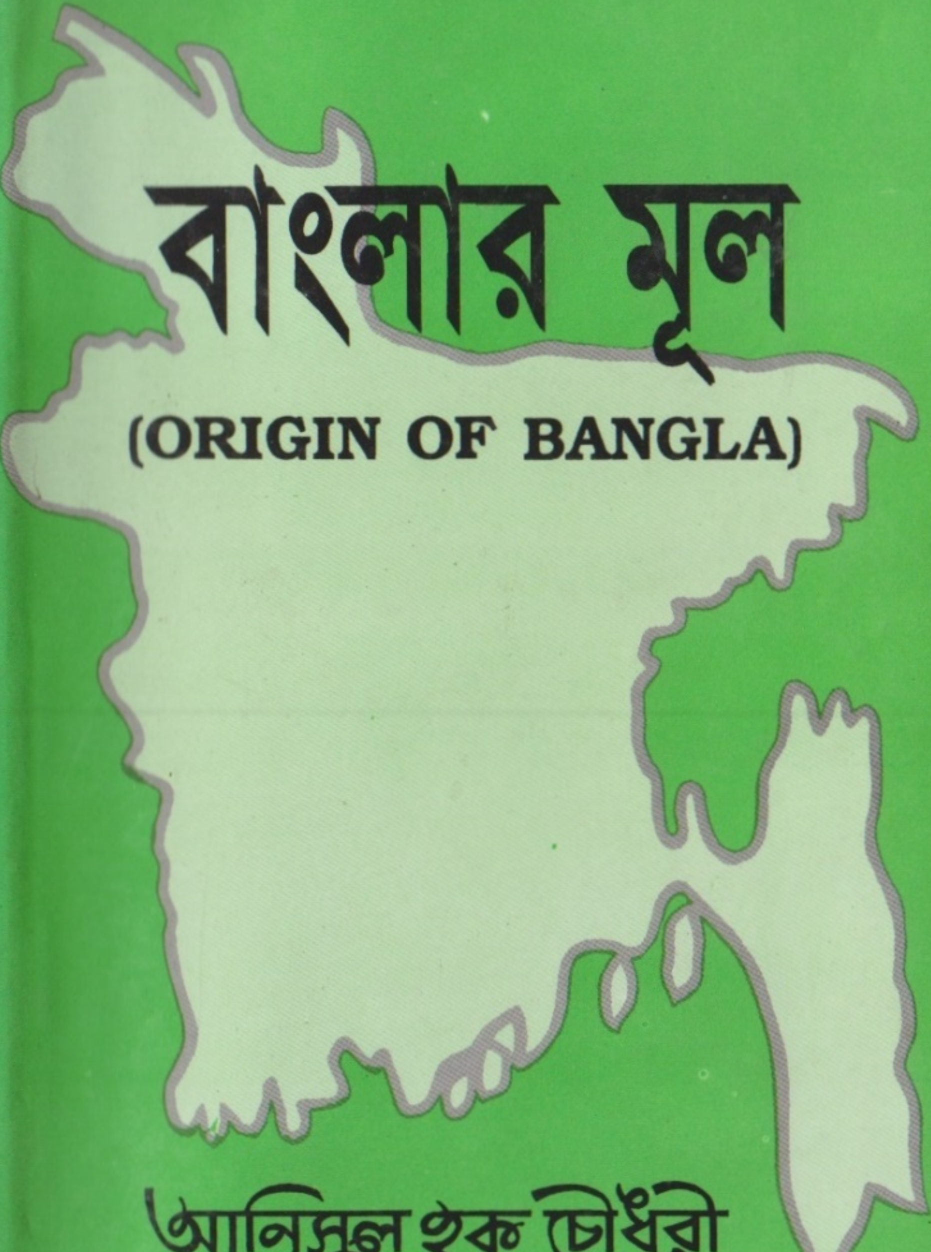

আনিসুল হক চৌধুরী

www.pathagar.com

বাংলার মূল

[ORIGIN OF BANGLA (i.e., Bangladesh)]

বাংলার মূল আরবী তথা ভূ-তাত্ত্বিক
অতীতের প্রাচীনতম যোগসূত্রে বাংলাদেশের
মাটি ও মানুষের মূল ইতিহাসের কথা

অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, এম-এ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
আবদুল গাফফার
ডিরেক্টর
আধুনিক প্রকাশনী,
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২১২
সর্ব স্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ

শাবান	১৪১৬
পৌষ	১৪০২
ডিসেম্বর	১৯৯৫

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ বি, আর্ট

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণে ঃ
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BANGLAR MOOL [Origin of Bangla (i.e., Bangladesh)]

A research work on the diseourse of Arabic origin of the word Bangla and history of the origin of the soil and people of Bangladesh in relation to its oldest geological past by Prof. Anisul Haque Chowdhury, M. A. and published by Abdul Gaffar from Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka—1100, Bangladesh.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Price: Taka 170.00 Only.
U. S. $: 10 Only.

©

www.pathagar.com

উৎসর্গ

"He has a good Knowledge of Bengali. If he gets an opportunity, I believe, he can make valuable contribution to the Bengali literature."

এই কথা কয়টি লিখিয়া আমার সম্বন্ধে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া যিনি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় এম. এ-র শিক্ষা সমাপনান্তে একটি একাডেমিক সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এই উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জ্ঞান তাপস ও বহু ভাষাবিদ পন্ডিত অধ্যাপক

মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র,

আমার

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম বজলুল হক চৌধুরীর

এবং

পরম শ্রদ্ধেয়া মা **মরহুম উম্মে কুলসুম যোবেদা খাতুন (যমুনা)**-র পাক্ রূহের মাগ্‌ফেরাত কামনায় ও পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

www.pathagar.com

"সত্য প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, সাধারণের গ্রহণযোগ্য হোক কি না হোক, তাকে খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে, প্রচার করতে হবে।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

"যে সত্য আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার অপেক্ষা করেনা, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোন মূল্য নেই সেই হল বৈজ্ঞানিক সত্য।... আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটিতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়।"

(পৃষ্ঠা-২৭, ২৮, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

"What a pity is that we live in an age where sensational but erroneous information is likely to capture the public imagination than carefully weighed judgements expressing reservations and pointing toward the existence of facts as yet unknown." (page-12, What is the origin of man, Dr. Maurice Bucaille, 1983.)

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

১৯৭৩ সালের ১২ই মে হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস সম্মেলনে আগত ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলিয়াছেন–"ভারত বর্ষে আগে বাঙালীদের আর্টিকুলেশনের (অর্থাৎ মুখ খুলিয়া কথা বলার) পথ বন্ধ ছিল। তাহাদের কোন সামাজিক ক্ষমতা ছিল না। এখন শতাব্দীর পর (অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর) সে সুযোগ এসেছে---- কিছু করার যা না করলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যত ক্ষমা করবে না।"(সাপ্তাহিক বিচিত্রা. ঢাকা, ২৫শে মে ১৯৭৩, পৃষ্ঠা–৮।)

শতাব্দীকাল ধরিয়া বাঙালীদের আর্টিকুলেশনের পথ বন্ধ ছিল বলিয়া বাংলার ও বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস যে রচিত হইতে পারে নাই তাহা বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায়ও সুস্পষ্ট—

"বাঙলার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র। বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙলার ভরসা নাই। কে লিখিবে ?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব; সকলেই লিখিবে, যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।"(বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।)

সঙ্গত কারণেই, প্রখ্যাত গীতিকার, কবি ও প্রবীণ অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও সাহিত্য লইয়া আজীবন চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই চিন্তা ভাবনা ও গবেষণার ফল "বাংলার মূল" শিরোনামে এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়া এ যাবৎকাল বিস্মৃত ও অনাবিষ্কৃত বাংলার ও বাঙালীর প্রকৃত মূল ইতিহাসের অনেক কৌতুহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর সত্য প্রকাশ করিয়া Truths are stranger than fiction কথাটির সত্য ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই কৌতুহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকও চমৎকৃত হইবেন বিবেচনায় আমরা গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি, গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে।

আবদুল গাফফার
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

প্রথম ভাগ

বাংলার মূল আরবী

পৃষ্ঠা

১. পরিচিতি (মরহুম আবুল মনসুর আহমদ লিখিত) ১৩

২. ভূমিকা ১৫

৩. কৈফিয়ত (অধ্যায়-১) ২৭

৪. বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের চাবিকাঠি আরবী (অধ্যায়-২) ৩৫

৫. আরবী ভাষার সামগ্রিক পরিচয় (অধ্যায়-৩) ৫২

৬. বাংলার মূল আরবী (অধ্যায়-৪) ৭৩

৭. বাংলাদেশের বাংলা ভাষার সমস্যা ও সমাধান (অধ্যায়-৫) ১০৫

৮. দ্রাবিড় জাতির রহস্য (অধ্যায়-৬) ১২২

৯. বেঙ্গলী ডিভিশন—বাঙ্গালী জাতি (অধ্যায়-৭) ১৩০

১০. বাঙ্গালীর হিন্দু নামের ভ্রান্তি (অধ্যায়-৮) ১৩৪

১১. আর্য নামের ভাঁওতা (অধ্যায়-৯) ১৪৪

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরবীয় পরিচয় (অধ্যায়-১০) ১৫২

১৩. বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ। (অধ্যায়-১১) ১৫৭

দ্বিতীয় ভাগ

ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের প্রাচীনতম যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মূল ইতিহাসের কথা

পৃষ্ঠা

১. বাংলার ইতিহাস নাই (অধ্যায়-১) ১৬৫

২. বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের পরিচয় (অধ্যায়-২) ১৭৬

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা

৩. বাংলাদেশ ভারতের কোনও অংশ নহে (অধ্যায়-৩)	২০২
৪. অতীতে ভারতবর্ষ বা আর্যবর্ত নামে কোন দেশ ছিল না (অধ্যায়-৪)	২০৪
৫. বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামের প্রাচীনতা (অধ্যায়-৫)	২০৮
৬. বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী (অধ্যায়-৬)	২১৫
৭. উপজাতিরা বাংলাদেশের মূল অধিবাসী নহে (অধ্যায়-৭)	২৩৮
৮. বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল (অধ্যায়-৮)	২৪২
○ মুসলমান শাসনামলে বাংলার অনেক পরিবার সোনার থালায় ভাত খাইত।	২৪৭
○ বঙ্গদেশের নাম হইতে বঙ্গোপসাগর নামের কারণ	২৫৪
৯. লৌহিত্য সভ্যতা (অধ্যায়-৯)	২৬৪
১০. পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনার কালপঞ্জী (অধ্যায়-১০)	২৭১
১১. পরিশিষ্ট (১৩৩২-এর বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত বৌদ্ধগান ও দোহার আলোচনা।)	২৮৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মরহুম আবুল মনসুর আহমদ লিখিত পরিচিতি

পরিচিতি

আমার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী তাঁর রচিত 'বাংলার মূল আরবী' পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি সানন্দে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে গৌরব বোধ করিতেছি।

অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী সাহেবের 'বাংলার মূল আরবী' পুস্তকখানি পড়িয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এ আনন্দ অনেক খানি প্রশংসা সূচক বিস্ময় মিশ্রিত। সে প্রশংসা অধ্যাপক সাহেবের প্রাপ্য। তিনি আমার কল্পনাতীত একটা নতুন কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক সাহেব ধ্বনি বিজ্ঞানী ভাষাবিদ। ধ্বনি বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি এই বই-এ প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের দেশের নাম যে বাংলা, এই 'বাংলা' শব্দটাই আরবী মূল হইতে উদ্ভূত।

কথাটা একাধিক কারণে একাধিক দিক হইতে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। এ তাৎপর্য বরাবরই ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে সে তাৎপর্যের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র, নেশন স্টেট্। এই দেশের অধিবাসীরা আমরা একটি নেশন। একটি রাষ্ট্রীয় জাতি। আমাদের জাতির নাম বাংগালী। রাষ্ট্র জাতি হিসাবে আমরা নবজাত হইলেও সভ্য মানব গোষ্ঠী হিসাবে আমরা সুপ্রাচীন। এই প্রাচীনত্ব কত দিনের, সে সম্বন্ধে ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। যথেষ্ট গবেষণার অভাবই এই মতভেদের হেতু। সব মতভেদ ডিংগাইয়া যে সত্যটা আজ সকলের স্বীকৃতি পাইয়াছে তা এই যে আমরা আর্যদের বংশধর নই সত্য, কিন্তু এমন এক জাতির বংশধর যারা আর্যদের চেয়েও উন্নত মানের প্রাচীনতর সভ্য জাতি। এই জাতির নাম দ্রাবিড় ; অর্থাৎ সেমিটিক আরব। দ্রাবিড় আখ্যায়িত এই আরবরাই মহোঞ্জাদারো ও হারাপ্পার স্রষ্টা। এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র সেদিন—বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। তার আগে বাংগালী অভিজাতেরা নিজেদের অনার্যগোত্র স্বীকার করিতেন না। সবাই পশ্চিমা পিতৃকুল দাবি করিতেন। মুসলমানরা করিতেন আরবী-ইরানী-তুরানী খান্দানের দাবি ; আর হিন্দুরা করিতেন আর্যত্ব দাবি।

আজ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি তা মানিয়া লইয়াছেন যে খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে মহেঞ্জদারো-হারাপ্পার

www.pathagar.com

অধিবাসীরাই ভারতের দক্ষিণ উপকূল বাহিয়া বাংলাদেশে আসে ও বসবাস শুরু করে। বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই তাদের স্থাপত্য নিদর্শন অনেক ছিল। কিন্তু নরম মাটি ও অতিবৃষ্টির দেশ বাংলার আবহাওয়া স্থপতির দীর্ঘায়ু হওয়ার অনুকূল নয়। উক্ত অধিবাসীদের সাথে পরবর্তী কালে খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে আসিয়া যোগ দেয় অন্যান্য আরব বণিকরা। এই যুগে আরবরা হাজার বছরের অধিককাল সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে এক চেটিয়া মালিক ছিল। তারা ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশের সর্বত্র বিপুল বাণিজ্য পরিচালনা করিত। এইসব জল পথের বহু উপকূলে তারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এইসব উপনিবেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশেষ করিয়া শাতিল গংগা (পরবর্তী কালে চাটিগাংগ বা চিটাগং) আরবদের অন্যতম বৃহৎ উপনিবেশ নগরে পরিণত হয়। আরব জাতি উদ্ভূত এই বাংগালীরাই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মে ও পরে ইসলাম ধর্মে দলে দলে দীক্ষিত হয়। তাই পশ্চিম হইতে পীর দরবেশ ও দিগ্বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পাঁচশ বছর আগে এবং সিন্ধু দেশে মোহাম্মদ বিন কাসিমের পদার্পণের সত্তুর বছর আগে বাংলাদেশের বাশেন্দাদের মেজরিটি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অনেকের ধারণা পশ্চিম হইতে মুসলিম দিগ্বিজয়ীদের আগমনের পর আটশ বছর স্থায়ী মুসলিম শাসনের ফলেই এদেশের জনসাধারণ, বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কথাটা সত্য নয়। বখতিয়ার খিলজীর তিন শ বছর আগে যেসব পীর দরবেশ বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আসিয়াছিলেন স্থানীয় মুসলমানদের দাওয়াতে। কেউ কেউ আসিয়াছিলেন হিন্দু রাজাদের অত্যাচার হইতে মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করিবার জন্য।

আবর দেশ হইতে আগত বাঙালীদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কারণ সুস্পষ্ট। নিজেদের আদি জন্মস্থানের ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি টান থাকা তাদের জন্য স্বাভাবিক। কাজেই আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতকেই এরাও ইসলামে আকৃষ্ট হইয়াছিল স্বাভাবিক কারণেই।

অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী তাঁর আলোচ্য বই-এ ভাষা বিজ্ঞান ও ধ্বনি বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই কারণে অধ্যাপক আনিসুল হকের এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আরও গবেষেণা হওয়া আবশ্যক। এই পুস্তক এই দিকে অনেকের অনুপ্রেরণা যোগাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আরয গোযার
আবুল মনসুর আহমদ
১০ই জুলাই, ১৯৭২।
৫৪ এ-এল ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা।
রোড নং-১৩ (পুরাতন)।

www.pathagar.com

ভূমিকা

নামকরণ ঃ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আমার রচিত 'বাংলার মূল আরবী' শিরোনামের বইটির বর্তমান দ্বিতীয় সংস্কারণে বইটির উক্ত নাম পরিবর্তন করিয়া শুধুমাত্র 'বাংলার মূল' নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ, 'বাংলার মূল আরবী' বইটির প্রথম সংস্করণে 'বঙ্গ' ও 'বাংলা' নামে দেশ বাচক নাম শব্দ দুইটির মূল কেমন করিয়া আরবী হইতে পারে তাহারই বিবেচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহার একটি বিস্তৃত পটভূমিকার প্রয়োজন আছে বিবেচনায় বইটির এই দ্বিতীয় সংস্করণে বাংলাদেশের ভৌগলিক, ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে বিধায় আলোচনার পরিধি আরবীকে ছাড়াইয়া এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে 'বাংলার মূল আরবী' নামে তাহা স্পষ্ট হয় না। সঙ্গতকারণেই, "বাংলার মূল আরবী তথা বাংলার মূল ইতিহাসের কথা" নামেই বইটির নামকরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম।

কিন্তু ইহা জানিতে পারিয়া, আমেরিকা প্রবাসী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসনাত মোহাম্মদ চৌধুরী জানায় যে উক্ত নামটি অনেক বড় হইয়া পড়ে। তাই সে প্রস্তাব রাখে যে, এতবড় নাম না দিয়া অল্প কথায় শুধুমাত্র "বাংলার মূল" নামকরণ করিলে "বাংলার মূল আরবী তথা বাংলার মূল ইতিহাসের কথা" দু'টির অর্থ "বাংলার মূল" নামে একটি মাত্র ছোট নাম শব্দে সুন্দর ও সার্থক ভাবেই প্রকাশিত হইতে পারে। তাহার এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় এই বইটির "বাংলার মূল" নামকরণ করাই সমীচীন বোধ করিয়াছি।

অতপর, আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য বইটিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে 'বাংলার মূল আরবী' এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রথম ভাগের পট ভূমিকা হিসাবে ভূ-তাত্তিক অতীতের প্রাচীনতম যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মূল ইতিহাসের কথা ও অন্যান্য বিষয় বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, এখন হইতে প্রায় দুই যুগ পূর্বে আমার রচিত উক্ত 'বাংলার মূল আরবী' শিরোনামের বইটি প্রকাশিত হইবার সংগে সংগে সুধীমহলে অত্যন্ত চমক, বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্য সুস্পষ্ট—

www.pathagar.com

"কবি ও গীতিকার অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, এম-এ সাহেব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আজীবন চিন্তা ভাবনা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বাংলার মূল আরবী শীর্ষক পুস্তকে দৃঢ়তার সংগে পেশ করেছেন। তা পণ্ডিত মহলে আলোড়নের ঢেউ তুলেছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ বেতার ও টি. ভি. গীতিকার হিসেবে সুধী মহলে তাঁর স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু সরকারী মহল থেকে কোন রকমের স্বীকৃতি তাঁকে এ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সুযোগ পেলে তাঁর প্রতিভার প্রয়োগ দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হতে পারতো। তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হোক এবং উদ্যম কর্মে প্রযুক্ত হোক এ কামনা করে তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।"

(ডঃ) কাজী দীন মুহম্মদ
প্রফেসর বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
তারিখ ৩১-৭-৮০ইং

বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূল যে আরবী হইতে পারে তাহা ধারণা করা তো দূরের কথা, কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই বলিয়াই উপরিউক্ত চমক বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছেন। সুধী মহলে যাঁহারা চমকিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ মরহুম আবুল মনসুর আহমদের নাম সবিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। কেননা, তিনি 'বাংলার মূল আরবী' বইটি পড়িয়া এতদূর বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে আমাকে তাঁহার প্রশস্ত বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং আরও গবেষণা চালাইয়া বইটির বাস্তব সম্মত একটি বিস্তৃত দ্বিতীয় সংস্করণ রচনার ও প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে আহবান জানাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সে আহবানে সম্মতি জানাইয়া বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ জানাই। আমার সে অনুরোধে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও দীর্ঘ একটি পরিচিতি লিখিয়া দিয়া তিনি আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এই পুস্তকের প্রারম্ভেই যুক্ত করা হইয়াছে।

উপরন্তু, উল্লেখ্য যে "বাংলার মূল আরবী" বইটি দুষ্প্রাপ্য বিধায় বইটির দুইটি ফটোগ্রাফ কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে A-175027 RBB-491/442.CHB, C2, সংযোজন সংখ্যায় রক্ষিত করা হইয়াছে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক আবুদর রাজ্জাক সাহেব "বাংলার মূল আরবী"

www.pathagar.com

বইটি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়া একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকার চেক দিয়াও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। (সোনালী ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চেক নং $\frac{SB}{1}$ NO.145395, 12 . 7. 1977.)

এতদ্ব্যতীত, উল্লেখ্য যে আমার রচিত 'বাংলার মূল আরবী' বইটির একাধিক কপি আমার কাছে না থাকায় এবং বইটি বাহিরেও দুষ্প্রাপ্য বিধায় বইটির কোনও কপি পাঠাইতে না পারিয়া বইটির গবেষণার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এককালে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রয়াত অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া জানাইলে তিনি আমার গবেষণার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক অভিমত ব্যক্ত করিয়া আমাকে যে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রথম চিঠি

Asutosh Bhattacharyya

Phone-45-2547
32, Becharam chatterjee Road
Calcutta-34

১৬. ৯ . ৭২

কল্যাণভাজনেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। একখানি বই না পাইলে আমি কি ভাবে ভূমিকা লিখিতে পারি ? সুতরাং সম্ভব হইলে একখানি বই পাঠাইবার চেষ্টা করিও।

তোমার মতামতের মধ্যে অনেক নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং তাহা পরীক্ষা ও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আশী ঃ
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

Bara Bazar Postal Seal

স্ট্যাম্প
INDIA

অধ্যাপক মুহম্মদ আনিসুল হক চৌধুরী
শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়,
পোঃ নান্দাইল,
জিলা- ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় চিঠি

৩২, বি. আর. চ্যাটার্জি রোড
কলিকাতা–৩৪
৭-৬-৭৩

কল্যাণভাজনেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। 'বাংলার মূল আরবী' বইখানি না দেখিয়া আমি ইহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে পারি না। কারণ, এই বিষয়ে আমি এখনও ভিন্ন মত পোষণ করি। তোমার বইখানি পড়িয়া যদি আমার মত পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ করি, তবে অবশ্যই তাহা করিব। কিন্তু বইখানি না পড়িয়া এমন কি, চোখে না দেখিয়া ইহার সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারিব না।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

Post card
Address Only

ষ্ট্যাম্প
INDIA

Postal Seal

অধ্যাপক এ. এইচ. চৌধুরী, এম, এ
'একতা বিতান'
৩৫৮, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট,
ধানমন্ডি, ঢাকা–৫, বাংলাদেশ।

সে যাহা হউক, প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ সুশীল কুমার দে-র নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যও এতদস্থলে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য—

"বর্তমান ভাষা বিকৃতি ও সাহিত্যিক আত্মভ্রষ্টতার যুগে এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হয়ত আদৃত হইবে না। কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আজকালকার দিনে যাহারা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক বা যুগন্ধর সমালোচক বলিয়া স্পর্ধা করেন, তাহাদের অধিকাংশই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের ------ ধারা সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। --------বিংশ শতাব্দীটিই নাকি একমাত্র শতাব্দী;

www.pathagar.com

ইহার পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্য ছিল, ইহা তাহারা জানেন না, বা মানেন না। কিন্তু যে—অতীতের মগ্ন চেতনা ও অনুভূতির উপর বর্তমান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

মুটে-মজুরের কাজ সকলে করিতে চাহে না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সৌধ নির্মাণে মুটে-মজুরের কাজই এখন একমাত্র কাজ। আপাত দৃষ্টিতে এই কাজ তুচ্ছ ও সামন্য হইলেও, বর্তমান সময়ে ইহারই একমাত্র আবশ্যকতা ও উপকারিতা আছে। বড় বড় সৌখিন বই লিখিয়া গৌরব অর্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানীর অকিঞ্চিৎকর অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিবেশ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা সেরূপ সুলভ নয়।

প্রাচীন বাংলাদেশ বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য না বুঝিলে চলিবে না; কিন্তু এই সাহিত্যের একটি সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। উদাসীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কাজের যোগ্যতাও অধিকার সকলের নাই"-----(ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কৃত "বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থের ভূমিকা)।

ইংরেজী ১৯৪০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আমার সম-সমায়িক সহপাঠী ও সাহিত্যিক বন্ধুরা যেখানে গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখিয়া যশস্বী হইয়া নানাবিধ পুরস্কার, প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করিয়া, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মন্ত্রী ও জাতীয় অধ্যাপক পর্যন্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন, সেখানে ডঃ সুশীল কুমার দে কথিত উপরে উল্লেখিত ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক সৌধ নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্যতার আশংকার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ তুচ্ছ ও সামান্য মুটে-মজুরের কাজই আমি এযাবৎ কাল করিয়া আসিয়াছি ; যাহা এই পুস্তকের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছি। ইহাতে আমি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, না হইয়াছি তাহা বিজ্ঞ পাঠকই বিচার করিবেন।

বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ঠ একটি ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণা চালাইতে গিয়া বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বাস্তব ভিত্তিক কোন খাঁটি ইতিহাসের সন্ধানই খুঁজিয়া পাই নাই। বরং বাংলাদেশের ইতিহাস নামে যাহা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস অনুসন্ধানের পথে পদে পদেই বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিপদগামী হইয়া বিভ্রান্তিতেই পড়িতে হইয়াছে। ইহারও কারণ, বাঙালী আর্যজাতির পূর্ববর্তী প্রাগার্য সভ্য জাতি সম্ভূত একটি জাতি হইয়া থাকিলেও বাঙালীকে প্রাগার্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া দুরভিসন্ধিমূলকভাবে আর্যদের অধীনস্থ আর্যেতর জাতিরূপে অনার্য

www.pathagar.com

আখ্যা দিয়া আর্যাজাতির সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের যে চেষ্টা এযাবৎ কাল করা হইয়াছে তাহাতেই উক্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙালীর সহিত আর্যদের এই রূপ ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা অনেক করা হইয়া থাকিলেও বাঙালীর সহিত 'অনার্য' অর্থাৎ প্রাগার্য জাতির ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা এ যাবৎকাল মোটেই করা হয় নাই। বাঙালীর সহিত অনার্য আখ্যায়িত প্রাগার্য জাতির ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করা হইলে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল ও গৌরব বৃদ্ধি হইত। নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—

"আর্য সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব সময় হইতে বঙ্গ নামে দ্রাবিড় জাতির একটি রাজ্য ছিল এবং সে দেশ হেয় বা হীন বীর্য ছিল না। এখনো আমরা বহুতর দ্রাবিড় সন্তান লইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেছে। ইহারা এখন বিদ্যা বুদ্ধিতে এবং চরিত্র গৌরবে কাহারো অপেক্ষা হীন নহেন। সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আর্য দ্রাবিড় মিশ্রিত। কাজেই একমাত্র আর্যের কথায় ভারত ইতিহাস আরব্ধ বা শেষ হইতে পারে না। দ্রাবিড় কাহিনী, ভারত ইতিহাসের মুখ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"(বঙ্গনামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-৪৩৩,'নব্য ভারত', কার্তিক, ১৩১৭, কলিকাতা।)

উপরের এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে যে দ্রাবিড় জাতির কথা বলা হইয়াছে, সে দ্রাবিড় জাতি বলিতে যে আরব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি আরব গোত্রকেই বুঝিতে হইবে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে- "That so far as the Dravadian civilization was derived form outside source, its origin is to be traced to Egypt and Mesopotamia. linked up with India by sea commerce. (The Dravadian element in Indian Culture. H. J. Fleure.) । অর্থাৎ দ্রাবিড় সভ্যতা যতখানি বাহিরের সূত্র হইতে আগত হইয়াছিল ইহার মূল ভারতের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বারা সংযুক্ত প্রাচীন মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এমতাবস্থায়, তথাকথিত আর্যজাতির স্বকপোলকল্পিত কীর্তি ও গৌরবের কল্প কাহিনীর গল্প যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াই পথ চলিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকেও তাই বলিতে হইয়াছে—"এটা অবশ্য স্বীকার্য যে অনেক কিছু বাদ দেওয়ার আছে, অনেক কিছু আছে যা ঝেটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।" (পৃষ্ঠা-৪৪, ভারত সন্ধানে।)

www.pathagar.com

সঙ্গত কারণেই, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছেন, "একমাত্র আর্যের কথায় ভারত ইতিহাস আরব্ধ বা শেষ হইতে পারে না। দ্রাবিড় কাহিনী ভারত ইতিহাসের মুখ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে," সেই দ্রাবিড় কাহিনীই (যাহা প্রকৃত পক্ষে আরব কাহিনীই) এই পুস্তকে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বিষয় হিসাবে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহা করিতে যাইয়া আমার সুদীর্ঘ দিনের গবেষণালব্ধ বিবরণের স্বপক্ষে বিশ্বাস যোগ্যতার জন্য পরিপূরক দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ হিসাবে বাস্তব ভিত্তিক অনেক তথ্য ও সত্যের উদ্ধৃতি দিতে হইয়াছে বিধায় বইটির পৃষ্ঠার সংখ্যাও বাড়িয়াছে বলিয়া দুঃখিত।

আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। তাই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নাই। তবে বিচারালয়ের মামলায় বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকেই যেমন মামলার মূল বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বৈধ দলিল পত্র ও তথ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া মামলায় জয়লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হয়, আমিও ঠিক তেমনি বাংলাদেশের "বাঙ্গাল" আখ্যায়িত নির্ভেজাল খাটি বাঙ্গালী মানুষের বিচারালয়ে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বৈধ ও অনেক বাস্তব ভিত্তিক তথ্যের ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বস্তুনিষ্ঠ একটি নির্ভেজাল খাঁটি ইতিহাসের ধারণা আমার অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা এই পুস্তকে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অতঃপর উল্লেখ্য যে যাঁহাদের সূত্র ও লেখা হইতে এই পুস্তকে বিভিন্ন তথ্য ও উদ্ধৃতি সমূহ দিয়াছি তাঁহাদের সকলেরই নাম এই পুস্তকে উল্লেখ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি না করিলেও কিছু কিছু সূত্রের ও লেখকের নাম খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়া উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। কেহ তাহা জানিলে এবং আমাকে জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখিত হইবে। তবে যাঁহাদের সূত্র ও লেখা হইতে এই পুস্তকে উদ্ধৃতি সমূহ দিয়াছি তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক রচনায় বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, অধুনালুপ্ত বেঙ্গলি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী-গ্রন্থাগার, বিভিন্ন স্কুলকলেজের গ্রন্থাগার, বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এবং বিদেশে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী ও লস এঞ্জেলেসের পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুস্তকাদি তথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদি হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের বিষয়ের আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডঃ আব্দুল লতিফ, প্রবীন অধ্যাপক মনিরুল হক ও অধ্যাপক ফজলুল হক আমার মত একজন সাধারণ গবেষককে যে উৎসাহ দান করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাদের জানাই সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ।

আর এই পুস্তকে আরবী ভাষা বিষয়ের আলোচনায় ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুযোগ্য অধ্যাপক আলহাজ্জ মরহুম আলাউদ্দীন আজহারী সাহেব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের আরবীর অধ্যাপক আলহাজ্জ আবু রায়হান আলী হায়দার সাহেব, "মদীনা" পত্রিকা সম্পাদক আলহাজ্জ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব ও বড় কাটারা মাদ্রাসার মোদার্রেস তথা লালবাগ-পিলখানার ভাট মসজিদের পেশ ইমাম আলহাজ্জ মাওলানা নূরুদ্দীন ফতেহপুরী সাহেব আমাকে যে সহযোগিতা দান করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাদিগকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ। বিশেষ করিয়া অধ্যাপক মাওলানা আলহাজ্জ মরহুম আলাউদ্দীন আজহারী সাহেব যে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য দান করিয়াছেন তজ্জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি, আল্লাহ তাঁহার রূহের মাগফেরাত দান করুন ও বেহেস্ত নসীব করুন। আমীন।

এই পুস্তকের প্রতি যাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য ও অপরিসীম ভালোবাসা আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাইয়া এই পুস্তকের অত্যন্ত জটিল ও সুকঠিন গবেষণা ও রচনা কার্যে সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া আমাকে নিয়োজিত রাখিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সম্পাদিকা বিশিষ্ট গল্প লেখিকা অধ্যাপিকা নয়ন রহমানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অতপর, যাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইতেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মরহুম ডঃ হাসান জামান, বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব পরিচালক মরহুম মীর আনোয়ার আলী, ঢাকা হাই কোর্টের সুপ্রীম কোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাষ্টিস মোস্তফা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবুল হাসান শামসুদ্দিন, প্রখ্যাত উপন্যাসিক আবু ইসহাক, রেডিও বাংলাদেশের উপ-পরিচালক সৈয়দ শামসুল হুদা, অধ্যাপক মোফাখ্যারুল ইসলাম, আমেরিকার কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গোলাম মোস্তফা, নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক 'প্রবাসী' পত্রিকার লস এনজেলেসস্থ প্রাক্তন প্রতিবেদক ইংরেজীর অধ্যাপক নুরুন্নবী সরকার প্রভৃতি। নামের তালিকা বৃদ্ধির আশংকায় আরও অনেকের নাম অনুল্লেখিত রহিল বলিয়া দুঃখিত। তবে ইহাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

আমার এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক ও নোটের কাগজ-পত্র সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া, বিশেষ করিয়া ইংরেজী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালে আমার ও আমার পরিবারের সকলের জীবন রক্ষার জন্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটাছুটি করিবার কারণে হারাইয়া যাওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া তথা স্থান বিচ্যুত হইয়া ওলট পালট হইয়া যাওয়া হইতে অত্যন্ত পরিশ্রম, যত্ন ও ধৈর্য সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আমার স্ত্রী রোকেয়া চৌধুরী, পুত্রত্রয়—মোহাম্মদ হাসনাত চৌধুরী (হাসু) ওরফে হাসানাত মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হায়াত চৌধুরী ও মোহাম্মদ তালাত চৌধুরী আমার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়া এই পুস্তক রচনার কার্যে যে সহযোগিতা দান করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে জানাই অফুরন্ত দোয়া ও ভালোবাসা।

পুস্তকটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পুস্তকটি শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য যোগ্য প্রকাশক খুঁজিয়া পাইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান, অধ্যাপক ডঃ আবদুল আজিজ সাহেব যে সক্রিয় সহযোগিতা দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমার নাই।

পরিশেষে, বর্তমানে কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে চরম প্রকাশনা সংকটের মধ্যেও দুঃসাহসী হইয়া বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুল গাফফার সাহেব বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মূল বা আদি বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণা প্রসূত অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক এই পুস্তকটি শীঘ্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার সুগভীর ও অকৃত্রিম স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের প্রকাশই ঘটাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের অস্তিত্বের মূল বিষয়ে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ নির্ভেজাল খাঁটি ইতিহাস সম্পর্কে জানিবার প্রয়োজন মিটাইতে এই পুস্তক যদি পাঠকের কিছুমাত্রও কাজে লাগে তাহা হইলেও আমার সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কালের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিনীত

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ মুইজী আবু দায়েম মুহাম্মদ আনিসুল হক চৌধুরী

একতা বিতান,
হাতির পুল,
ঢাকা-১২০৫।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম ভাগ

বাংলার মূল আরবী

(অর্থাৎ বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দের মূল আরবী)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়—১

কৈফিয়ত

(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

আরবী ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়নের প্রতি আমাদের বর্তমান উচ্চ শিক্ষিত সমাজের এক শ্রেণীর লোকের এক প্রকার বিরূপ মনোভাবের ফলে "বাংলার মূল আরবী" নামে আমার এই পুস্তকের নামকরণ দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। এমন কি কেহ কেহ হয়ত রুষ্টও হইবেন বিবেচনায় এই পুস্তকের প্রারম্ভেই এই কৈফিয়তটা জুড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

এই কৈফিয়তে আমার বক্তব্য যে আমি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ও আরবী ভাষা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা বলিয়াই আমি এই পুস্তকে আরবী ভাষার মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হই নাই। তবে যাহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট সত্যরূপে প্রতিভাত ও কল্যাণকর তাহা প্রচার করা যেমন প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য তেমনি 'বঙ্গ' ও 'বাংলা' নাম শব্দ দুইটির মূলে আরবীকে একটি সুস্পষ্ট সত্যরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া আমি তাহাই এই পুস্তক মারফৎ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এই পুস্তক পাঠ করিলেই পাঠক তাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন। সুতরাং এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া শুধুমাত্র নাম দেখিয়াই কেহ এই পুস্তক ও এই পুস্তকের অক্ষম লেখক সম্পর্কে কোন অযৌক্তিক ও অন্যায় ধারণা পোষণ করিবেন না, এইমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

দেশ বাচক "বঙ্গ" ও "বাংলা" নাম শব্দ দুইটির মূল যে আরবী হইতে পারে তাহা ইতঃপূর্বে আমারও ধারণার বাহিরে ছিল। কিন্তু বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়ন কালে বঙ্গ ও বাংলা শব্দ দুইটির উৎপত্তির বিষয় বাদ দিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস রূপে যাহা আমাদের পাঠ্য ছিল তাহাতে আমার মন সন্তুষ্ট হইত না বলিয়া বঙ্গ ও বাংলা শব্দ দুইটির মূলে প্রকৃতপক্ষেই কি শব্দ ছিল বা কি শব্দ থাকিতে পারে এই প্রশ্নটাই আমার মনে সদা সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে জাগ্রত হইতে থাকে। কেননা, বঙ্গ ও বাংলা শব্দ দুইটির ধ্বনিমূল ও অর্থ জানিতে পারিলে তাহা হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস সহজেই জানা যাইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা হয়।

www.pathagar.com

অবশেষে পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক বঙ্গবাণী (১৩৩১-৩২ মাঘ, দ্বিতীয়ার্ধ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ) পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত 'ফরিদপুরের প্রাচীন তাম্র লিপি' শিরোনামের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্বে প্রাচীন বঙ্গদেশের (অর্থাৎ বাংলাদেশের) জনসাধারণ কর্তৃক আরবী দীনার মুদ্রার দ্বারা স্থানীয় ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের খবর জানিতে পারিয়া এবং বড় বড় নদী বেষ্টিত নদী বহুল তৎকালীন প্রাচীন বঙ্গদেশে নৌকা বলিতে বড় বড় সমুদ্রগামী নৌযান তাহাদের সকল কাজের একমাত্র সম্বল ছিল তথা ভারতের নানা স্থানের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্কও ছিল জানিয়া, এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধের লেখক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যও দীনার মুদ্রাকে আরবী মুদ্রা বলিয়া সাব্যস্ত ও স্বীকার করিয়াও "তখনও জগতে মুসলমানের আবির্ভাব হয় নাই। ------এই সকল লোকের জাতি কি ছিল ?" বলিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করায় সঙ্গতকারণে স্বাভাবিকভাবেই আমার ধারণা হয় যে ঐ সমুদয় প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ মুসলমান না হইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষেই মুসলমানের আবির্ভাবের বহুপূর্ব কালের আরব জাতির লোকই ছিলেন। তবে তাহারা ছিলেন ইসলামের পূর্বকালের পৌত্তলিক ও জড়পূজক আরব। আর ইসলামের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব হইতেই আরব জাতির লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রের জল পথে পৃথিবীর বহুদূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়াও পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

আরবের মেসোপটেমিয়ার ৯৬০ হইতে ১১২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের যে রঙ্গীন নক্ষত্র মানচিত্র চীনদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে খবর প্রকাশিত হইয়াছে[১] উহা যে আরব ভূখণ্ডে অবস্থিত প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার

---

১. হংকং, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৭৫ (এনা)

লিয়াঁও শাসনামলের একটি সমাধি মন্দিরে একটি প্রাচীন রঙ্গীন নক্ষত্র মানচিত্র পাওয়া গেছে। মানচিত্রটি ৯৬০ থেকে ১১২৭ খৃষ্ট পূর্ব সময়ের। প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মীরা হোপি প্রদেশের সুয়ান হুয়া গণ কমিউনের উপকণ্ঠে এই মানচিত্রটি আবিষ্কার করে। গণচীন বার্তা প্রতিষ্ঠান সিনহুয়ার খবরে প্রকাশ ১৯৭১-এর বসন্তে উক্ত এলাকায় যখন একটি সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তখন সেই সমাধি মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। এর ইট গুলি ৮০০ বছর আগের। ছয় মিটারের বেশী মাটির নীচে মন্দিরটি ছিল। কাঠের তৈরী চীনা বাড়ীর অনুকরণে এটি তৈরী হয়। এর সামনে ও পেছনে দু'টি কক্ষ রয়েছে। এবং মন্দিরটির পেছনের কক্ষের ভেতরের দিকে ছাদে এই রঙ্গীন মানচিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

ছাদটির মাঝে একটি ব্রঞ্জের আয়না খচিত রয়েছে। এর দু'দিকে রয়েছে দু'টি পদ্মগুচ্ছ আঁকা। আয়নার বাইরে রয়েছে অঙ্কিত নক্ষত্র মালা এবং সুন্দরভাবে আঁকা চন্দ্র কলার ছবি। ২৬টি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছে, সূর্য, চন্দ্র এবং ৫টি গ্রহ বুধ, শুক্র, মঙ্গল,

www.pathagar.com

(বর্তমান ইরাকের) আরবী ভাষা ভাষী বণিক ও নাবিকগণই সমুদ্রের জল পথে চীন দেশে পৌছাইয়া দিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই সত্য হইতেই যে তৎকালে বর্তমানের মত সুগম স্থলপথ যখন ছিল না ; স্থল পথ ছিল অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল দুর্গম পাহাড় পবর্ত, গভীর খাদ, দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র বন্য জীব জন্তু পরিপূর্ণ ; তখন পৃথিবীর একস্থান হইতে দূরবর্তী অপরস্থানে যাতায়াতের অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ তথা অত্যন্ত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য একমাত্র পথই ছিল সমুদ্রের জল-পথ। আর সেই সমুদ্রের জল-পথে চীন দেশে গমন করিতে উক্ত আরবী ভাষাভাষী আরব জাতীয় মেসোপটেমিয়ার বণিক ও নাবিকগণ যে তিব্বতে উৎপন্ন বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরিয়াই যাইত তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই সত্য হইতেই যে ঐতিহাসিক অধ্যাপক টয়েনবি উল্লেখ করিয়াছেন, তিব্বতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত চীনের পীত নদীর[২] সংযোগ ছিল। চীন দেশের পীত নদীর সহিত তিব্বতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর সংযোগ ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক টয়েনবি যে কথা বলিয়াছেন বিশিষ্ট ভূ বিজ্ঞানী (Dr. H.G.E Pilgrim) ডঃ পিল গ্রিমের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উহার পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে- "When the sea covered the whole of the western Himalayas, such a river must have been risen on a watershed connecting Rajmahal hills and continuing in to China." (Extracts from 'Rivers we live with', (5) M.I. Chowdhury, the Pakistan observer, January, 24, 1965, Dacca.)

বৃহস্পতি এবং শনি, মেরু নিকটবর্তী নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় বিভাজন এবং চন্দ্র কলার ছবি। চন্দ্র কলার ২৮ ভাগকে ৭ভাগ করে একদিকে নির্দেশ করা হয়েছে। ৭টি ভাগে বিভক্ত চন্দ্র কলার প্রতিটি একই দিকে ফেরানো।

প্রাচীন চীনা পুস্তকাদিতে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাশি চক্রের বারোটি চিহ্ন বারো ভাগে বিভক্ত করে কক্ষপথে উপবৃত্তাকারে সজ্জিত রয়েছে। প্রাচীন কালে পশ্চিম এশিয়ায় নভ পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবহৃত রাশি চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, হান শাসন আমলের (২০৬ থেকে ২২০ খৃষ্ট পূর্বে) পুস্তকাদিতে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ছবি বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই রঙ্গিন নক্ষত্র মানচিত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে চীন এবং পশ্চিম এশিয়ার (আরব ভূখণ্ডের) জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। (পৃষ্ঠা-৩, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২রা আশ্বিন ১৩৮২ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।)

২. Hwang HO—The second Largest river of China, flowing 2900 miles east from the Tibetan high lands aeross China to the gulf of Chili : also yellow river, Hoang Ho."(page- 617. Funk and wagnalls New International Dictionary of the English Language.)

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত, তিব্বতের প্রাচীন দলিল দস্তাবেজের বাতিলকৃত কাগজ পত্রের মধ্যে কখনও কখনও যে আরবী লিখিত কাগজের টুকরা বাহির হইয়া পড়ে উহাতেও তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরিয়া আরব বণিক ও নাবিকদের চীনদেশে যাতায়াতের অকাট্য প্রমাণ মিলে। "Paper scraps with Arabic writing are occasionally found among old Tibetan and Sakyan rubish,"(North Indian Antiquity.)।

সঙ্গত কারণেই, আরবী ভাষাভাষী প্রাচীন আরব বণিক ও নাবিকগণ তাহাদের আরবীয় স্বদেশ প্রাচীন সিরিয়া, বাহরাইন, ইয়েমেন, জেদ্দা প্রভৃতির সামুদ্রিক বন্দর হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপলক্ষে লোহিত সাগর আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক জল পথে যাত্রা শুরু করিয়া বাহরাইন হইয়া সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) পৌছিয়া সিংহল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের জল-পথ ধরিয়া মাদ্রাজ হইয়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত নদী পথে সংযুক্ত বঙ্গদেশে পৌছিয়া বঙ্গদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রবাহিত তিব্বতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরিয়া তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন দেশের পীত নদীতে পৌছিয়া চীন দেশে যাতায়াত করিত বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়।[৩]

৩."Pliny (Historia Naturalis, book .vi. 82) shows that Ceylon (now Srilanka) traded with China in pre-historic times------

The sea was the natural road not the jungle of India. With Ceylon as a geographical intermediary in the east and Bahrain in the west, the Indus civilization was not necessarily ignorant of many major nation along coastal Asia in the epoch when their ships began to plow the seas.

Chronologically all the great civilizitions of antiquity known to us today appeared one by one in the centuries immediatly after 3000 B.C. They all followed the break through in the circum Arabian river valleys.

Science itsell is bewildered. There has been no time to revise the text books and they are no heretical."

(Pag- 324, 325, The Tigris Expedition, Dr. Thor Heyerdahl.)

৩ (ক). ইসলামপূর্ব কালে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের কাছে একটা আরব উপনিবেশ ছিল। (পৃষ্ঠা-২৪৭, ভারত সন্ধানে, জওহর লাল নেহেরু।)

৩. (খ) A. small excavation carried out at Kodungalur (crangamore) uncovered Chinese and Arab wares but no Roman'. (Page-296, The Periplus of the Erythraen sea, translation and commentary by Lionel Casson.)

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগর হইতে রাজমহল গিরিশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তারিত বিশাল অগভীর জল সমুদ্রে প্রাচীন বঙ্গদেশ যখন কিঞ্চিৎ উত্থিত ও কিঞ্চিৎ নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল তখন উহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ সদৃশ যে সমুদয় ভূমি পরিদৃষ্ট হইতেছিল উহাতে কোন জনমানুষের পদার্পণের বহু পূর্বে উক্ত আরব বণিক ও নাবিকগণই সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাদের আরবীয় স্বদেশ হইতে সুদূর চীনদেশে যাতায়াতের পথকে কিয়ৎ পরিমাণে সুগম করিয়া বহুদূর পথের দূরত্বের ক্লান্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে প্রয়াস পাইয়া কালক্রমে স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়া বংশ পরম্পরায় বসবাস করিয়া বাংলাদেশের প্রাচীনতম আদিম অধিবাসী হইয়া অবশেষে বাংলাদেশের "বাঙাল" আখ্যায়িত আদি ও খাটি বাঙালী জাতিতে রূপান্তরিত হয় বলিয়া আমার ধারণা হইতে থাকে।

এমতাবস্থায় "বঙ্গ' ও "বাঙ্গালা" নাম শব্দ দুইটির মূল ও অর্থ আরবীতেই অনুসন্ধান যোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় এবং বঙ্গ ও বাঙালা শব্দ দুইটির মূল ও অর্থ আরবীতেই অনুসন্ধানের জন্য আমি সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা বোধ করি।

"ফরিদপুরের প্রাচীন তাম্রলিপি" শীর্ষক পূর্ব বর্ণিত প্রবন্ধের অংশ বিশেষে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

"দক্ষিণ ফরিদপুরে আবিষ্কৃত এই সকল নিদর্শন (ধর্মাদিত্য ৫৫০–৫৬৫ খৃ. গোপচন্দ্র ৫৬৫–৫৮৫ খৃ. ও সমাচার দেব ৫৮৫–৬০২ খৃ. সময়ের ৪খানা তাম্রলিপি) কেবল ফরিদপুরের নহে সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত জড়িত। ইহাতে খুব প্রাচীন কালের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন নিম্ন বঙ্গের সেরূপ চিত্র আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।" (পৃষ্ঠা–৬৫৫, মাসিক বঙ্গবাণী, মাঘ, ১৩৩১-৩২ দ্বিতীয়ার্ধ)

"প্রথম তাম্র লিপিতে ----- ভূমি কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই; ---- তৃতীয় তাম্রলিপির জমি কাহার নিকট হইতে ক্রীত হইল বোঝা যায় না।----- চুতর্থ তাম্রফলকে ----ভূমি পূর্বে কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই।"(পৃষ্ঠা-৬৬৯, ঐ)।

"ভূমির মূল্য যে দীনারে নির্দিষ্ট হইত তাহা হইতেও বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ----ভিন্ন দেশীয় বণিকদিগের সহিত ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

প্রতিকূল্য বপনোপযোগী ভূমির মূল্য ৪দীনার এই হিসাবে কৃষ্ট ভূমির মূল্য নির্ধারিত হইত। এক 'কূল্যব্যাপ' কতটা জমি এবং 'দীনার' শব্দে ঠিক

www.pathagar.com

কিরূপ মুদ্রার পরিমাণ বুঝাইত তাহা এখনও গবেষণার বিষয়। আরবী স্বর্ণমুদ্রা দীনারের ওজন ছিল ৬৫ গ্রেন, এদেশে ৩২ রতি ওজনের ও অন্যান্য প্রকার দীনারের উল্লেখ পাওয়া যায়।"(পৃষ্ঠা–৬৭০, ঐ)।

"তাম্রলিপিতে অনেক লোকের নাম আছে,---------তখনও জগতে মুসলমানের আবির্ভাব হয় নাই।----কিন্তু এ সকল লোকের জাতি কি ছিল ? 'সেন' দেখিয়াই বৈদ্য অথবা 'ঘোষ' 'দত্ত' দেখিয়াই কায়স্থ মনে করা নিরাপদ নহে।......জাতি বাচক কায়স্থ শব্দের তখনও প্রচলন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ---- স্থানুদত্তের 'দত্ত' শব্দ নামেরই একাংশ।"(পৃষ্ঠা-৬৭১, ঐ)

"যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সেটা আদিশুর ও শ্যামল বর্মা রাজার পূর্ববর্তী সময়। এই সকল তাম্রলিপিতে বর্তমান রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের পূর্বপুরুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সকল তাম্রলিপিতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গের যে চিত্র পাওয়া যাইতেছে সেটা সভ্যদেশের চিত্র।----- এই---সময়ে ইংলণ্ডে এক প্রকার অরাজকতা।"(পৃষ্ঠা-৬৭২, ঐ)

সে যাহা হউক, অতঃপর ইংলণ্ডের ওকিং-সারে হইতে প্রকাশিত 'দি ইসলামিক রিভিউ' (The Islamic Review, vol XL vii, No.1, January 1959) পত্রিকায় জনাব আবদুল হক বিদ্যার্থী রচিত Arabic : The mother of all languages— Sanskrit : Its Incognito offspring শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখিতে পাই ঃ Thousands of years ago, the inhabitants of India spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured in to various forms and gave rise to the hundreds of languages we now find in India. The founder of Arya samaj movment Swami Dayanand, has stated in his book Satyarth Parkash, that Kurus and Pandwas discussed confidential matters in Arabic. The words for mountains rivers, towns, heaven, earth, names of relations, names of posts, exclamations of happiness, bedding and coverings, house, etc. are all in Arabic.The only difference in most cases is that if the words are read from right to left they sound Arabic and if they are read from left to right they sound sansk.it, -----(page-10, Ibid.)

উপরে উল্লেখিত আরবী নাম শব্দ সমূহের বিষয় অবগত হইয়া বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির ধ্বনি মূল ও আরবীতেই অনুসন্ধানের জন্য আমার

www.pathagar.com

পূর্ব বর্ণিত প্রাথমিক অনুপ্রেরণা অধিকতর ভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং আমি এক অদম্য কৌতুহল ও উৎসাহের বশবর্তী হইয়া আরবী ভাষার শব্দ সমূহের মধ্যে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দের উৎপত্তির মূল খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই।

ফলে 'কিম্ আশ্চর্য মতপরম' যে বহুযুগ সঞ্চিত অজ্ঞতার ও জটিলতার দুর্ভেদ্য গাঢ়তম অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির মূল অকস্মাৎ আরবী শব্দের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করিয়া উঠিয়া আমার নয়ন সম্মুখে বাংলা ভাষা, লিপি, দেশ ও বাঙ্গালী জাতির এযাবৎকাল অজ্ঞাত ও অচিন্তনীয় অথচ অতি সত্য ইতিহাসের এক নব দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া এক অভুতপূর্ব আবিষ্কারের যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে আমাকে অভিভূত করিয়া তোলে। "বাংলার মূল আরবী" কথাটি তাই এতদিন অবিশ্বাস্য মনে হইলেও আজ এমনি করিয়া আমার কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়া আজ আমি আমার সমগ্র সত্তায় উপলব্ধি করিতেছি "Truths are stranger than fiction" সত্য ঘটনা গল্প কাহিনী অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

সে যাহা হউক, আমার উপরিউক্ত যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের কথা বলিবার জন্য এবং এই সঙ্গত কারণেই আরব জাতি ও আরবী ভাষার সহিত আমাদের "বাঙ্গাল" আখ্যায়িত খাঁটি বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষার যে বহু দূরাগত এক সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার শব্দ-সম্পদে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আজ পরিপূর্ণ। এই সমুদয় শব্দ-সম্পদের দ্বারা বাংলা আজ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষা। আরবী মূলীয় খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে অন্যান্য ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াই বর্তমান বাংলা ভাষা যে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী ভাষা হইতে পারিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষাই অন্য ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। ইহাতে ঐ সমুদয় ভাষার গৌরব যেমন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তেমনি উক্ত ঋণ গ্রহণের ফলে বাংলার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে বলিতে হইবে।

সুতরাং বাংলা ভাষার এই ঋণ গ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক অনুশীলন ও উন্নতির জন্য বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূলে যে আরবী ভাষা তাহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

www.pathagar.com

আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই সংস্কৃত, ইংরেজী, পর্তুগীজ, তুর্কী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্কের কথা যেমন আমাদিগকে জানিতে হইবে তেমনি আরবী ভাষার সহিত বঙ্গ ও বাংলা শব্দ দুইটির তথা বাংলা ভাষার যে মৌলিক রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহাকেও আমাদের অবশ্যই জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটির উৎপত্তির মূল যে স্থলে আরবীতেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িতেছে তদস্থলে আরবী ভাষাটাকে যে একটু বেশী করিয়াই জানা কর্তব্য তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিবেন। আর ইহা উপলব্ধি করিয়াই আমি "বাংলার মূল আরবী" শিরোনামে এই পুস্তকটি রচনার তাগিদ অনুভব করিয়াছি।

www.pathagar.com

অধ্যায়-২

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের চাবিকাঠি আরবী

বাংলাদেশ ও আরবের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত গুরু সদয় দত্ত মহাশয় ১৩৪৭-এর আশ্বিনে "বাংলার শক্তি" (৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছেন—

"তিন বৎসর আগে মহাত্মা গান্ধী তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, যদিও তিনি সারা জীবন মানুষের মধ্যে শান্তির ও ঐক্যের সন্ধানে সাধনা করেছেন বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তির ও ঐক্যের—তবু তিনি এখনও শান্তির প্রণালী ও ঐক্যের বিজ্ঞান আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি। ------ ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আজ এই ঐক্য-বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণার ও তার মূলীভূত উপাদান ও কার্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন অন্য সকল প্রয়োজনের চেয়ে গুরুতর, তা বলা বাহুল্য।"(পৃষ্ঠা-৩, ঐক্য বিজ্ঞান।)

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উপরিউক্ত শান্তি ও ঐক্যের বিষয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে গিয়া, গুরু সদয় দত্ত মহাশয় আরো উল্লেখ করিয়াছেন—

"আজকাল জাতি গঠনের আহবান আমাদের দেশে সবক্ষেত্রে এসেছে। কিন্তু জাতি গঠনের মূলীভূত প্রণালী সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেরই ধারণা আছে। জাতি গঠনের সবচেয়ে মূলীভূত প্রণালী আপন দেশের প্রাচীন প্রথার মধ্যে যেগুলি নির্দোষ ও বলদায়ী, সেগুলি সযত্নে পরিপোষণ ও প্ররক্ষণ করা এবং জীবনে চালু রাখা। আর একটি মূলীভূত প্রণালী দেশের সকল সম্প্রদায় যে প্রথাগুলিকে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করে সেগুলির প্রবর্তন করে সকলের মধ্যে ঐক্য ও অভিন্ন ভাব স্থাপন করা।---বস্তুত ডান হাত উত্তোলন করে "তামান্নি" নামক অভিবাদন প্রথা যে প্রাচীনকালে অর্থাৎ (আরবের) খলিফাদের সময়ে (আরব ভূখণ্ডের) বোগদাদ রাজ্যে প্রচলিত ছিল, তা ব্রতচারী সামসুল উলেমা কামাল উদ্দিন আহমদজী আমাদের জানিয়েছেন, সুতরাং ব্রতচারী প্রথায় ডান হাত তুলে অভিবাদনে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের গৌরব অনুভব করা উচিত।" (পৃষ্ঠা-২, বাংলার শক্তি, শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ব্রতচারী আভাষণ, গুরু সদয় দত্ত)।

www.pathagar.com

"ব্রতচারী আভাষণে ডান হাত তোলা হয় সোজা উপরের দিকে শরীর ও মাথার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে; নাৎসীর বা ফ্যাসিষ্টদের মত সামনের দিকে হাতটি হেলিয়ে দেওয়া হয় না। পাঁচটি আঙ্গুল এক সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন থাকে। তাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে পাঁচটি আঙ্গুল ক্রমভাবে জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ—ব্রতচারীর এই পঞ্চব্রত সূচিত করে। এবং পাঁচটি আঙ্গুল এক সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকায় পঞ্চব্রতের যুগপৎ অনুষ্ঠান সূচিত হয়। হাতটি সোজা উপরে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের উচ্চতম আদর্শ ও আকাঙ্খা সূচিত হয়।

রায় বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণ এই আভাষণের সঙ্গে "ই-আঃ" আরাবটি ব্যবহার করেন। ইহার কি সাংঘাতিক অর্থ, তাহা তাহাদের স্মরণ নাই, তাই আমি অনেক চিন্তার পর ইহার যোগ্য অর্থ নির্দ্ধারণ করেছি-"ইষ্ট" কথাটির প্রথম অক্ষরে "ই" এবং "আভাষণ" কথাটির প্রথম অক্ষর "আঃ"। সুতরাং "ই-আঃ"এই সঙ্কেত দ্বারা "ইষ্ট আভাষণ" সূচনা অস্বাভাবিক নয়। তাই ব্রতচারী আভাষণে "ই-আঃ" কথার অর্থ "ইষ্ট আভাষণ; অর্থাৎ মঙ্গল ইচ্ছা।"(পৃষ্ঠা-৩, ঐ)।

উপরে উল্লেখিত "ই-আঃ" আরাবটির যোগ্য অর্থ "ইষ্ট আভাষণ" নির্ধারণ করিয়া গুরু সদয় দত্ত মহাশয় "ই-আঃ" আরাবটির প্রকৃত অর্থের অনেকটা নিকটবর্তী হইলেও ইহাতে আরাবটির সম্পূর্ণ প্রাকৃত অর্থ ধরা পড়ে নাই। "ই-আঃ" আরাবটির উক্ত "ইষ্ট আভাষণ" অর্থ হইতেও যোগ্যতর বাস্তব অর্থ হইতেছে "ইলা' (অর্থাৎ ঈশ্বর এক) শব্দটি মূলত আরবী ও হিব্রু দুইটি ভাষায়ই রহিয়াছে। এই "ইলা" শব্দটিই এতদ্দেশে "ই-আঃ" শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। রূপান্তরিত হইবারও কারণ—প্রাকৃত উচ্চারণ রীতিমতে দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত "ল" শব্দের বিলুপ্তি। যেমন-ই+ল+আ (ইলা) শব্দের "ই" এবং "আঃ" মধ্যস্থিত "ল" লোপ পাইয়া হইয়াছে "ই-আঃ"। এই "ইলা" (ঈশ্বর এক) শব্দটি আবার "উলু" শব্দেও রূপান্তরিত হইয়া এতদ্দেশের হিন্দুদের উলুধ্বনি বা জোকার ধ্বনি আখ্যা লাভ করিয়া "মঙ্গল-ধ্বনি" অর্থও পাইয়াছে। আর বর্তমানে আরব দেশেও উক্ত একই "উলুধ্বনি" প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়াও জানা যায়। আরব দেশে এই উলুধ্বনিকে জেকের বলা হয় এবং ইহাও মঙ্গল ধ্বনি রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একই উলু-ধ্বনি বাংলাদেশে জোকার এবং আবরদেশে জেকের আখ্যা লাভ করিয়া এবং একই মঙ্গল অর্থ প্রকাশ করিয়া আরবদেশের মানুষের সংস্কৃতির সহিত বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির অভিন্নতা ও ঐক্য প্রদর্শন করিয়া দুইদেশের মানুষের মৌলিক অভিন্নতা ও ঐক্যই প্রদর্শন ও প্রতিপন্ন করে। নিম্নের উদ্ধৃত সংবাদ ভাষা হইতেও এই সত্য প্রতিপন্ন হইবে।

www.pathagar.com

"হুলুধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। ফিরে গেলাম আমার ছেলে বেলায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল মেঠোপথ, বটগাছ, মন্দির, ঘরের আঙ্গিনা, তুলসী গাছ, হিন্দু পূজারিণী—হুলুধ্বনি। গোধূলী শেষে, শীতের সন্ধ্যায় পাখিরা কুলায় ফেরে—দূরের গ্রামকে মনে হয় শিল্পীর তুলির আচর—ভেসে আসে হুলুধ্বনি।

মনে পড়ে ছোট বেলায় হিন্দু বন্ধুদের হুলুধ্বনির বিকৃত রূপ দিয়ে টিটকারী দিতাম। মনে করতাম হুলুধ্বনি হিন্দুদের বানানো রীতিনিছক পাগলামী। হিন্দুদের বিবাহ অন্যান্য উৎসবে 'হুলু' দেবার রীতি শুধু আমাদের উপমহাদেশেই ছিল বলে মনে করতাম। ধীরে ধীরে কখন যে এই হুলুধ্বনি হারিয়ে গেল টেরও পেলাম না। আজ এতদিন পর সৌদী আরবে এসে 'হুলু' শুনব কল্পানাও করিনি। সৌদী আনন্দ উৎসবে বা বিবাহোৎসবে 'হুলু' না দিলে অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই এখানে যখন তখন হুলুধ্বনি শুনতে পাই, আর মন চলে বাংলার গ্রামে। যে তুলসী গাছের এতযত্ন—যার বেদীতলে হিন্দুরা পূজা দেয়—হুলু দেয়। সেই তুলসী গাছেরও এখানে অনেক কদর। মাঝে মাঝে বাজারেও বিক্রি করতে দেখা যায় তুলসী পাতা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই তুলসী গাছ থাকে। আদর করে তুলসী পাতার সুগন্ধির জন্য।

জানিনা আমাদের দেশের হুলুধ্বনি আর এ দেশের হুলুধ্বনির মাঝে কতুটুকু সম্পর্ক? কবে থেকে এর শুরু? ইসলামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা? কোথা থেকে তার উৎপত্তি এসব জানার একটা আগ্রহ জাগে। কেউ কি বলতে পারেন তার গোড়ার কথা? বাহাউদ্দীন মোল্লা, জেদ্দা।" (পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই অক্টোবব, ১৯৮১; ২৯শে আশ্বিন, ১৩৮৮, ১০ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।)

উপরের উদ্ধৃতির সংবাদ ভাষ্যে সংবাদ দাতা বাহাউদ্দীন মোল্লা প্রশ্ন রেখেছেন—**(১) আমাদের দেশের হুলুধ্বনি আর এ দেশের (অর্থাৎ আরব দেশের) হুলুধ্বনির মাঝে কতটুকু সম্পর্ক?**

উত্তর—সম্পর্ক খবুই গভীরে নিহিত এবং সে সম্পর্ক উভয়ের বহু দূরাগত একই মূল প্রাচীন আরব জাতির মধ্যেই রহিয়াছে।

প্রশ্ন (২)—কবে থেকে এর শুরু?

উত্তর—জগতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে প্রাচীন কালে সমুদ্রের জল পথে বাংলাদেশের সহিত আরব দেশের প্রাচীন নাবিক ও বণিকদের প্রাচীন যোগাযোগের তথা বাংলাদেশে উপনিবেশ ও বসতিস্থাপন করিয়া বসবাসের সেই প্রাচীন কাল হইতে ইহার শুরু।

www.pathagar.com

প্রশ্ন (৩)—ইসলামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কি না ?

উত্তর—ইসলামের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তবে ইসলামের আবির্ভাবের পরেও ইসলাম পূর্ব যুগের পৌত্তলিক ও জড় পূজক আরবদের স্বদেশীয় একটি বা একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা হিসাবেই তাহা বর্তমান আরবীয় সমাজেও প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রশ্ন (৪)—কোথা থেকে তার উৎপত্তি ?

উত্তর—ইসলাম পূর্ব যুগের আরব দেশেই এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার উৎপত্তি এবং ইসলামের পূর্ব যুগের আরব নাবিক ও বণিকদের মাধ্যমেই এই প্রাচীন পৌত্তলিক আরবীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা প্রাচীন বাংলাদেশেও আসিয়া আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের অমুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু সমাজেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা হিসাবেই প্রচলিত রহিয়াছে। বাংলাদেশের বাহিরে ভারতের কোথাও এই প্রথার প্রচলন নাই। ইহাতে বাংলাদেশের মানুষ যে মূলত প্রাচীন আরব জাতি সম্ভূত একটি জাতি তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। আর ইহাতে ভারতবাসীদের সহিত বঙ্গবাসির যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে তাহাও প্রকারান্তরে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হয়।

সে যাহা হউক, আরব দেশ হইতেই যে উক্ত হুলুধ্বনি দিবার প্রথা বঙ্গদেশে আসিয়াছে, ইহারও প্রমাণ প্রাচীন পৌত্তলিক ও জড়পূজক আরব বণিক ও নাবিকগণই সমুদ্রের জলপথে প্রাচীন বঙ্গদেশে আসিয়াছিল এবং উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়া স্থানীয় অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীন কালের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাস পাঠেও জানা যায়। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ আরবদেশে যায় নাই। সুতারাং বাংলাদেশ হইতে উক্ত হুলুধ্বনি দেওয়ার প্রথা যে আরব দেশে প্রচলিত হইতে পারে নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ যে বঙ্গদেশের বাহিরে আরব দেশে বাণিজ্য করিতে যায় নাই তাহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বর্ণিত হইয়াছে।

“এই সব সহরে যত সৈদাগর বৈসে;
কত ডিঙ্গা নয্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে।।
সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গ্রন্থ হইলেও উহাতে অনেক ঐতিহাসিক সত্যও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণও যেহেতু অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন

www.pathagar.com

সেহেতু চণ্ডীমঙ্গলের উপরে উল্লেখিত বিবরণ মিথ্যা বা শুধুমাত্র কবি কল্পনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না বিধায় প্রকৃত সত্য বলিয়াই উহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

১৩২৮ সনের ভাদ্র মাসের (৫ম সংখ্যা, ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড) প্রবাসী পত্রিকায় "বাঙ্গালীর ইতিহাস" শিরোনামের একটি প্রবন্ধে শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এতদ্দেশে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের মূলীভূত উপাদান ও কার্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজনে সবিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য—

"আমি বাঙ্গালীর কথা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। স্থানভেদে বাঙ্গালা দেশে আবহাওয়ার যতটা পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ও স্থানে স্থানে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখনকার রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীকে ঠিক চেনা যায় না। তখন তাহারা যেভাবে থাকিতেন, এখন তারা সেভাবে নাই। বিভিন্ন সময়ে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর সর্ব বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এত পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার পূর্বের স্বরূপ বাহির করিতে পারা যায় কিনা তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার। বাঙ্গালীর বর্তমান পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার সমাজ ও ধর্মের খুঁটি নাটির ভিতর দিয়া তাহার স্বরূপ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। "আমি কি ছিলাম", তাহা হয়ত "আমি এখন কি" তারই মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে। আমার বাহিরটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে—তাহার ভিতর আমার অন্তসত্তাকে পাওয়া যায় কিনা--------

--------কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাবিরুষের (অর্থাৎ বেবিলনের) সভ্যতার স্রোত ভারতীয় আর্যদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যদি ১৪০০ খৃঃ পূঃ এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডের উপর বাবিরুষ প্রভুত্ব করিয়া থাকে। তাহা হইলে উহার প্রভাব ভারতবর্ষ পর্যন্ত আসিয়া পড়া অসম্ভব নয়। পারস্য ও তুর্কীস্থানের মধ্যদিয়া যে বড় বড় বাণিজ্য পথ গিয়াছে, সেই সমস্ত নিশ্চয়ই ইয়ুফ্রেটিস, টাইগ্রিস উপত্যকার শাসনকর্তাদের তত্তাবধানে ছিল। বেলুচিস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে সাহেবেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পূর্বকালে ঐ স্থান অত্যন্ত উর্বর ছিল এবং ঐ প্রদেশের মধ্য দিয়া ইয়ুফ্রিটিস-টাইগ্রিস হইতে সিন্ধু উপত্যকা সকলের মধ্যে যাতায়াত করিতে ও খবরাখবর লইতে পারা যাইত। খৃঃ পূঃ ৭ম কিংবা ৮ম শতকে বাবিরুষের সহিত ভারত বর্ষের

www.pathagar.com

সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বাণিজ্য পথ দিয়াই প্রাক সেমিটিক অক্ষর আসিয়াছে। এই অক্ষর-ভিত্তির উপর তাহারা ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাবিলনীয় ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা যে পরস্পর সম্যক রূপে মিলিয়া যায়, তাহা বাহির করিবার অনেক রকমের সূত্র ইঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন—পীড়া ও অপদেবতাদিগকে তাড়াইবার বা তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাবিলনীয়গণ যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করিত এবং এ সম্বন্ধে তাহাদের অন্যান্য আবাহন শ্লোক অথর্ব বেদের মন্ত্রাদির সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইহাদের যাদু মন্ত্র, শুভ অশুভ দিন সকলে বিশ্বাস হিন্দুদের তুল্য; যে সকল কুমারীর স্বামী জুটিত না, তক্ষশিলায় সেই সকল কুমারীর বিক্রয় প্রথা বাবিলোনিয়ায় প্রচলিত ছিল। ইষ্টক নির্মিত পেটিকায় কবর দিবার প্রথা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল; বাবিলোনিয়ায়ও ঠিক এই প্রথার অনুরূপ ইষ্টক নির্মিত পেটিকায় কবর দিবার নিয়ম ছিল।.........এই রকম অনেক বিষয়ের তুলনা করিলে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা ৬৩১-৬৩৭, প্রবাসী ভাদ্র, ১৩২৮)।

জনাব জাহিদুল হুসাইন লিখিত "পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) পৌত্তলিক আরব" শিরোনামে একটি প্রবন্ধেও উপরে বর্ণিত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে। পাঠকের অবগতির জন্য প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ভারতের কোন জাতির দ্বারা আরব আক্রান্ত হয়নি। তথায় কেউ উপনিবেশও স্থাপন করেনি। পক্ষান্তরে আরবেরা পাক-ভারত আক্রমণ করেছে, উপনিবেশ স্থাপন করেছে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে। আরবেরা মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আবিসিনিয়া, সিন্ধু নদীর মোহনায়, মালাবারে, বাংলায়, জাভায় উপনিবেশ স্থাপন করেছে। আরব বলতে যদি ইসলামের উত্থানের পরবর্তী আরবদের মাত্র মনে করা হয় তবে ইতিহাসকে শুধু নয়, নিজেকেও ফাঁকি দেওয়া হবে এবং এই ফাঁকিতে পড়েছেন বলেই অনেকের মন বিভ্রান্ত।--------

১৮২০ খৃষ্টাব্দে আরব সওদাগর সেখদের (Gulf-Sheikhs) সংগে ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধি হয়ে সমুদ্রে বাণিজ্যের অধিকার না হারানো পর্যন্ত আরবেরা ভারত মহাসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। কি দ্রাবিড়, কি মংগল, কি আর্য, কি মোগল, পাঠান ভারতীয় কোন শক্তিই আরবদের সমুদ্র হতে বিতাড়িত করতে পারেনি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতের বাইরের দু'টো শক্তি আরবদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিল—রোমক ও গ্রীকেরা। মিসর দখল করে রোমকেরা এবং ইরাক দখল করে গ্রীকেরা কিছুকালের জন্য দক্ষিণ সমুদ্রে

www.pathagar.com

বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু আরবদের দ্বারা তারা অল্প দিনের মধ্যেই এই অধিকার থেকে ফের বঞ্চিত হয়।

আরবের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের অধিবাসীরাই সামুদ্রিক বাণিজ্যে এবং মক্কার কোরেশেরা আরবের আন্তর্বাণিজ্যে অধিকার বিস্তার করে রেখেছিল ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। আরবেরা ছিল পৌত্তলিক—সুতরাং ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে যেসব আরব অন্যত্র গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারাও নিশ্চয়ই পৌত্তলিক ছিল।

প্রাচীন কাব্য-কাহিনী, স্বর-ভংগি, ভাষা, পূজা পদ্ধতি ইত্যাদি থেকে একটা জাতির হারানো ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে) যে পৌত্তলিক আরবেরা উপনেবিশ স্থাপন করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এগুলোর মধ্যে।------ এরা এসেছিল সওদাগর হিসাবে। প্রাচীনকালে তেজারতি ছিল নৌকার উপর নির্ভরশীল—তবু বাংলা-আসামই নয়, সুদূর কাশ্মীর থেকেও মাল-পত্র বাইরে যেতো বাংলার নদী পথে। সংখ মিত্রাও এই বাংলার বন্দর দিয়েই লঙ্কায় বুদ্ধের ডঙ্কা বাজাতে গিয়েছিলেন।

পৌত্তলিক আরবেরা এখানে এসে বসতি করার এই সুবিধার উপরে আরেক সুবিধা ছিলো এই যে, ভারত আক্রমণকারীদের বহুদূর পাল্লায় ছিল তখন বাংলা ; ইতিহাসের অন্তরালে নির্বিবাদে এরা বসতি বিস্তার করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের) পৌত্তলিক আরবদের দেবদেবী দ্বিবিধ—লৌকিক দেবী এবং পৌরাণিক দেবতা। মংগল কাব্য-গুলিও তাই দ্বিবিধ।

লৌকিক অর্থে স্থানীয় অধিবাসীদের এবং পৌরাণিক মানে আর্যদের থেকে গ্রহণ করা দেবদেবী।

আর্যজাতি পুরুষ দেবতার এবং সেমিটিক (আরব) জাতি মেয়ে দেবীর উদ্গাতা। পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের) হিন্দুদের লৌকিক দেবী যখন সবই মেয়ে এবং এই মেয়ে দেবীরা যখন পাক–ভারতের আর কোথাও পূজা পায় না, তখনই বলতে হয়, এই দেবীরা এসেছে পৌত্তলিক আরবদের সংগে আরব থেকে।

শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) হিন্দুদের লৌকিক দেবীর সম্পর্কে কতকগুলি শব্দ ব্যবহার হয়, যা খাঁটি আরবী শব্দ—সংস্কৃত,

www.pathagar.com

পালি বা তামিল নয়। অথচ (আর্যদের) পৌরাণিক দেব দেবীর নামে বা পূজা অর্চনায় আরবী শব্দের চিহ্নও নেই।

কুজা শব্দটি আরবী—মেঘের দেবীর---নাম কুজা। কোজাগরী পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ বাংলাদেশের) হিন্দুদের নিজস্ব পার্বণ। আর্যদের (মেঘের) দেবতা বরুণ। বাংলার হিন্দুরা সকল মংগল অমঙ্গলের "উলু" ধ্বনি দেয়—পাক-ভারতের আর কোথাও তা করে না। "উলু" শব্দটা আরবী হিব্রুর— 'এলি' আরবী 'এলা' (ইলা) আর বাঙ্গালী হিন্দুর "উলু" আরবী হরফ আলিফ, লাম, হে-র উপর হরকতের হেরফের মাত্র। এই "উলু" ধ্বনিটিকে বলা হয়—'জোকার' এ-ও আরবী শব্দ 'জিকির' এরই অপভ্রংশ। হজের মওসুমে মক্কায় নেমাড়িক আরবেরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে "উলু" ধ্বনি দেয় এখনও।

বাংলার হিন্দুরা কোনো কিছু মানত করে—এ-ও পৌত্তলিক আরবদের নামজাদা দেবী মানত-এর স্মৃতি বহন করে।

কৃত্তিবাস ওঝা সাগ্রহে আরব দেবী "ওজজার" কীর্তির বর্ণনা রেখে গেছেন।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর একটি বিশিষ্ট পার্বণ—পাক-ভারতের আর কোথাও এ পূজা প্রচলিত নেই। যদিও বাল্মিকীর রামায়নে দুর্গার নাম গন্ধও নেই, কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর বাংলা তর্জমায় রামচন্দ্রকে দুর্গার পদতলে নতশির করে ছেড়েছেন।

মনসাও পৌত্তলিক আরবেরই দেবী—তার অধিষ্ঠান ভূমিকে বলা হয় আটন (?)। "ওয়াতান" পাক-ভারতে "বতন," "বাথান," "আটন" স্থান ভেদে হয়েছে অপভ্রংশ।

মক্কার কাবাখানায় ইসলামের আলো এসে পড়ার আগে একুনে তিন শত ষাটটি দেবী মূর্তি পূজিত হত—এদের নামের ফিরিস্তি জানিনে। মনসা, দুর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীরা অপভ্রংশ নামে যে পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) প্রচলিত হয়ে আছে, তা আরবী শব্দের সংগে যোজিত নামে মালুম হয়ে যায়।

দেবী পূজা করা সত্ত্বেও সেমিটিক (আরব) জাতি একেশ্বরবাদের উদ্গাতা। ইহুদী, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্ম এদেরই একেশ্বরবাদের সাধারণ ফল।

পৌত্তলিক আরবদের ন্যায় এখানকার হিন্দুদের-----দেবীরাও মৌসুমী—এরা দুর্গাকে বিসর্জন দেয়, স্বরস্বতী মূর্তি পূজার পরের দিন থেকেই ফেরার।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম সংস্কারের যত আন্দোলন হয়েছে তার মূল কথা ছিল একেশ্বরবাদ এবং সংস্কারকেরা ছিল অ-আর্য এবং অ-দ্রাবিড়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের সামাজিক কাঠামোটার দিকে নজর করলে সহজেই দেখা যায়—তিনটি ধারা—শুদ্র, কায়েত, ব্রাহ্মণ। কায়েতেরা শুদ্রদের থেকে ফারাক এবং ব্রাহ্মণদের থেকে আলাদা। দত্ত, গুপ্ত, বোস, দাস, সোম, দে, কুণ্ড, সাহা ইত্যাদি দৈহিক গঠনে মানসিকতায় সব রকমেই ঐ দু'টো (ব্রাহ্মণ শুদ্র) ধারা থেকে বিলকুল ভিন্ন এবং নিজেদের দ্রাবিড়দের চেয়ে উচু ঠাওরায় এবং ব্রাহ্মণদের চেয়ে খুব হীন মনে করে না। (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রায় সম মর্যাদা দাবি করে)। "দেব-দ্বীজে" ভক্তি নেই বলে বাঙ্গালী হিন্দুর একটা অপবাদ আছে, সেটা এই কায়েতদের কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে। 'কায়েত' আরবী শব্দ, মানে নেতা।.......আরব দেশ থেকে এদের আগমনের পর থেকেই হল এদেশ সোনার বাংলা। হল ইতিহাসের, সাহিত্যের এবং সমাজ বন্ধনের সূত্রপাত।

কায়েতদের গোত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেও পৌত্তলিক আরবদের গোত্রগুলির 'ফসিল' আলগোছে নজরে আসবে। আরবদের গোত্রের অহমিকা এবং সেটা আলাদা করে রাখার প্রতিভা প্রচুর। এদের দেশের প্রতি ভক্তিটাও যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মূলতঃ 'নোমাডিক' বলে স্বদেশ ত্যাগের বাসনাটাও বাহুল্যে ভরপুর। ------পৌত্তলিক আরবদের গোত্রগত গৌরব এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও স্বদেশ ত্যাগের নোমাডিক বাসনা পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ বাংলাদেশের) হিন্দুদের মধ্যে হুবহু দেখা যায়।

আরবদের গোত্র ও স্থানের নামের সংগে এই কায়েতদের উপাধির অপভ্রংশ আজো বিদ্যমান। বনি গঘফান (গুপ্ত), সানা (সেন) সেহেল (দক্ষিণ উপকূল) সাহা, কিন্দি (কুণ্ডু), ঘাসানাইড (ঘোষ) ইত্যাদি।

আরবের কোরেশেরা ছিল কাবার ঠাকুর (তাগুত দেবতা)। বাংলার ঠাকুরেরা এই পৌত্তলিক কোরেশদেরই বংশধর।

বর্তমান যশোহর শহরের মাইল এগারো উত্তরে পুরাতন "গংগা-রদ্দি"-র (গংগা রিড্ডি) Periplus of the Erythraean sea নামক গ্রন্থে যে উল্লেখ দেখা যায় সেখানের অনেকগুলো পুরাতন দীঘির নাম আরবী নামের সংগে সংশ্লিষ্ট। মনে হয়, গংগার শাখা প্রশাখার দ্বারা রদ্দি বা খণ্ড বিখণ্ড বলে আরবেরা এর নাম দিয়েছিল গংগা রদ্দি। গ্রীক ভাষায় "দ" নাই "ড" হয়ে গেছে তাই।

www.pathagar.com

প্রাচ্য দেশে ইসলাম প্রচারের একটা কৌতুকাবহ বিষয় এই যে,বাণিজ্য ব্যাপদেশে এসে পৌত্তলিক আরবেরা যে সব জায়াগায় বসতি করেছে, যেমন সিন্ধু, মালাবার, পূর্ব পাকিস্তান (অর্থাৎ বাংলাদেশ) ও জাভা—এ সব জায়গায় মুসলমানও বেশী। ---প্রাচ্য দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা মুসলমান, তারা তাদের পৈতৃক সেমিটিক ধর্মই কেউ নিয়ে এসেছে আরব থেকে—কেউ গ্রহণ করেছে বসতি করার পর—বসতি করার পরও এখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি, তারা কায়েত—পৌত্তলিক আরবীয় কালচার, আরবীয় দেবী, আরবীয় কণ্ঠ-ধ্বনি, আরবী শব্দ, আরবীয় কাব্য-প্রতিভা, আরবীয় নেতৃত্বের ব্যবসায় এখনো তাই তাদের মনে ভরপুর। [পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) পৌত্তলিক আরব, মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৬৭, ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা]।

অতঃপর বাংলাদেশের হিন্দুদের সর্ব প্রধান পূজা যে শারদীয় দুর্গাপূজা, এই দুর্গাপূজা বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ ব্যতীত ভারতের কোথাও প্রচলিত নাই। দুর্গাপূজা তাই একক বাঙ্গালী হিন্দু সমাজেরই পূজা। ইহা হইতেও সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে বাঙ্গালী হিন্দু ও ভারতীয় হিন্দু এক ও অভিন্ন জাতি নহে বরং বাঙ্গালী হিন্দু ভারতীয় হিন্দু হইতে আলাদা একটি ভিন্ন জাতি।

"দুর্গাপূজা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় উৎসব। স্বাভাবিক ভাবে অনুসন্ধিৎসা জাগে এর ঐতিহাসিকতা, প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে। ---- ব্যাবিলনিয়া ও আসেরিয়ার ভক্তরা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতেন My goddess, my sins are seven time seven, for give my sins."---

হিন্দুরা যে দুর্গাপূজা করে তাও এই দেবী অর্চনা বা শক্তি পূজা----শক্তি পূজা বা মাতৃভাবের সাধনা বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও দুর্গাপূজা বর্তমানে যেভাবে প্রচলিত তা বোধ হয় মাতৃ সাধনার বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত রূপ।---দুর্গাপূজার যে অসুর নাশিনী সিংহবাহিনী মূর্তি এ ধারাও প্রাচীন।..........সিংহবাহিনী এই দেবী মূর্তিই দেবী দুর্গার ধারার উৎস। ----- বর্তমান দুর্গাপূজার যে মহিষাসুর মর্দিনীরূপ, এর প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে মধ্যভারতের উদয়গিরিতে—দ্বিতীয়, চন্দ্র গুপ্তের কালে নির্মিত প্রস্তর মূর্তিতে। এই মূর্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের। মূর্তিখানি দ্বাদশ ভূজা। প্রতিভূজে বিবিধ প্রহরণ।

দেবীর মহিষ মর্দ্দিনী রূপ সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ব্যাখা দেখা যায়। এই মতে, দুর্গা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাইর্গো (virgo)। ইনি সমরপ্রিয়া

www.pathagar.com

দেবী। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলবাসিগণ কর্তৃক মনস্মের জাতির বিজয়েই মহিষ মর্দ্দিনীর মূল কথা। মনস্মেরগণ একটি মিশ্র নৃ-জাতি, খানিকটা কাসপিয়ান, খানিকটা অষ্ট্রলইড, কিছুটা আলপাইন। ইহাদের সংস্কৃতির সংগে মহিষের একটি যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গরু যেমন পবিত্র হয়ে উঠেছিল মনস্মেরদের মধ্যে মহিষও সেরূপ পবিত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, মনস্মের মর্দ্দনী মহিষ মর্দ্দন। ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমর দেবী হলেন বাইগার্বো দুর্গা। তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মনস্মের বিজয়ই রূপ ধারণ করল দুর্গার মহিষ মর্দ্দিনী মূর্তিতে। -------

দুর্গা পূজার যে অসুর নাশিনী সিংহবাহিনী মূর্তি এ ধারাও প্রাচীন।--- সিংহবাহিনী এই দেবী মূর্তিই দেবী দুর্গার ধারার উৎস। মাতৃসাধনার দুর্গা নাম কিভাবে এবং কেমন করে এলো তা বলা শক্ত। (দেবী পূজা ও দুর্গা পূজা, স্বামী উমানন্দ, পৃষ্ঠা-২, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই কার্তিক, ১৩৮১; ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৪, ঢাকা।)

উপরের উদ্ধৃত ভাষ্যে "মাতৃসাধনার দুর্গা নাম কিভাবে এবং কেমন করে এলো তা বলা শক্ত" বলিয়া প্রবন্ধকার স্বামী উমানন্দ যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর শক্ত হইলেও অসম্ভব নহে। এম, এস, ডাওয়ার (M.S. Dower)-এর নিম্ন লিখিত ভাষ্যে সে প্রশ্নের উত্তরের প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। "Hittite army marched down the Euphrates in to Babylonia and sacked the capital, carrying off its God " Marduk" among the spoil."(Page-3, Chapter 2. The Legacy of Egypt. Edited by S.R. K. Glanville, The political approach to the classical world, M.S. Dower.) অর্থাৎ সুদূর কাপ্পাদিয়া হইতে হিট্টি সৈন্যবাহিনী ইউফ্রেতিসের দিকে অগ্রসর হইয়া বেবিলনে উপনীত হয় এবং রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সমূহের মধ্যে ইহার (অর্থাৎ বেবিলনের) মার্দুক দেবতাকেও বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে যে "মার্দুক" দেবতার কথা উল্লেখিত হইয়াছে সে মার্দুক দেবতা বেবিলনেরই দেবতা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুরস্কের বোগোজুকুই-এর হিট্টি সৈন্য বাহিনী বেবিলন আক্রমণ করিয়া বেবিলনের সেই "মার্দুক" দেবতাকে লুণ্ঠন করিয়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে লইয়া যাওয়াতেই কালক্রমে "মার্দুক" ভূমধ্যসাগরীয় দেবতা হইয়া পড়ে এবং উপরিউক্ত 'দেবী পূজা' ও 'দুর্গা পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখকের ভাষায় ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমর দেবী হলেন "বাইগার্রো দুর্গা"। তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মনস্মের বিজয়ই রূপ ধারণ করলো দুর্গার সহিত 'মহিষ মর্দ্দিনী' মূর্তিতে"। উক্ত প্রবন্ধ লেখকের মতে

www.pathagar.com

ভূমধ্যসাগরীয় এই দুর্গাই বাংলাদেশে 'মা দুর্গা' রূপে পূজিত হয় বলা হইলেও বাংলাদেশের 'মা দুর্গা' আর বেবিলনের উপরে উল্লেখিত মার্দুক (Marduk) শব্দ দুইটির মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্য ও সাদৃশ্যই প্রতিপন্ন করে যে মূলতঃ আরব ভূখণ্ডে অবস্থিত বেবিলনের মার্দুক (Marduk) হইতেই কালক্রমে বাংলাদেশের 'মা দুর্গা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বেবিলনের মার্দুক ও বঙ্গদেশের 'মা দুর্গা' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্য ও সাদৃশ্য উভয় শব্দের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়া বেবিলনের মার্দুক-ই যে এতদ্দেশে 'মা দুর্গা' হইয়াছে বলিয়া যেমন প্রতিপন্ন করিয়াছে ঠিক তেমনি বেবিলনের অন্যতম প্রাচীন দেবী "ঈশ্তর" শব্দের সহিত এতদ্দেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের 'ঈশ্বর' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্যও সাদৃশ্য উভয় শব্দের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়া এতদ্দেশের উক্ত ঈশ্বর শব্দটি যে বেবিলনের ঈশ্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাও প্রতিপন্ন করে।

উপরন্তু এতদ্দেশের পৌত্তলিক হিন্দুগণ যে 'শিব পূজা' করিয়া থাকেন সেই শিব শব্দটির সহিত প্রাচীন মিসরের পার্বত্য বৃষ দেবতা "আবিশ"-এর ধ্বনিগত ও অর্থগত ঐক্য ও সাদৃশ্যই প্রতিপন্ন করে যে এতদ্দেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের উক্ত 'শিব' শব্দটি প্রাচীন মিসরের উক্ত 'আবিশ' শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আবিশ শব্দটির সহিত শিব শব্দটির ঐক্য ও সাদৃশ্য নিম্নোক্ত উদাহরণের দ্বারা সহজেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মিসরের ভাষা আরবী ইহারও প্রমাণ প্রাচীন মিসরের রাণী ক্লিয়োপেট্টাও আরবী ভাষা বলিতেন । Cleopatra an accomplished Linguist who preferred to do without interpreters, spoke-----Arabic---"- (Page-99, Periplus of the Erythraean sea, translated by Lionel Casson.)

সুতরাং মিসরের ভাষা আরবী বিধায় আরবী ভাষার রীতিতে উক্ত আবিশ শাব্দটি ডান দিক হইতে বাম দিকে লিখিলে বা পড়িলে হয়, যেমন শ+ি+ব++আ=আবিশ। আর ইহাই বাম দিক হইতে ডান দিকে (বঙ্গ ভাষার রীতিতে) লিখিলে বা পড়িলে হয়, যেমন,-শ+ি+ব+আ> শ+ি+ব+া=শিবা>শিব। আর মিসরের পার্বত্য দেবতা আবিশ যেমন বৃষ দেবতা বঙ্গদেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের দেবতা শিব ও তেমনি পার্বত্য দেবতা এবং শিবের বাহন ও বৃষ। আবিশ ও শিবের এই ঐক্য ও সাদৃশ্যই নির্দেশ করে যে বঙ্গদেশের উক্ত শিব মিসরের উক্ত আবিশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আরবের সিরিয়ার নাবিক ও বণিকদের মাধ্যমেই যে মিসরের উক্ত আবিশ এতদ্দেশে আসিয়া শিব হইয়াছে ইহার প্রমাণ মিসরীয়গণ তাহাদের সামুদ্রিক

www.pathagar.com

বাণিজ্য সিরিয়ার নাবিক ও বণিকদের সাহায্যেই পরিচালনা করিত বলিয়া ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের মধ্যে যে সর্প পূজার প্রচলন দেখা যায় তাহাও যে আরব ভূখণ্ড হইতেই বঙ্গদেশে আসিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিত জে, ফার্গুসন তাহার Tree and Serpent worship নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন, সর্প পূজা সর্বপ্রথম ভারত বর্ষের বাহিরে তুরানীয় (অর্থাৎ আরব) জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয় --- সর্প পূজার সহিত আর্যজাতির কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণ ভারভবর্ষে আসিয়া তুরানী (অর্থাৎ আরব) জাতির নিকট হইতে এই সর্প পূজার শিক্ষা লাভ করে। ....

"Fergusson----;claims that" eventually the worship of the serpent may become a valuable test of the presence of Turanian (i.e., Arab) blood in the veins of people among whom it is found to prevail." পৃষ্ঠা-২৪০-২৪১, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ডঃ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম সংস্করণ।)

ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এখনও জীবিত সর্পের পূজা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের বাহিরে কোন নর কিংবা নারীর আকৃতি পরিকল্পনা করিয়া সর্পের পূজা করিবার পরিবর্তে সাধারণতঃ জীবন্ত সর্পের উদ্দেশ্যেই পূজা করা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র ---- মেসোপটেমিয়ার (অর্থাৎ আরব ভূ-খণ্ডে অবস্থিত ইরাকের) প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে একটি সর্পদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার দুই বাহুতে তাগার মত দুইটি সর্প ও গলদেশে আর একটি সর্প হারের মত বেষ্টন করিয়া আছে। [Field Museum Natural History Vol XXI (1931), Page-62].-----ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বাস্তু সর্প বলিয়া পরিচিত এক জাতীয় গৃহবাসী সর্প গৃহস্থের নিকট পরম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। এখনও বাংলাদেশে ও অন্যত্র মৃত গোক্ষুর সর্পের ব্রাহ্মনোচিত পূর্ণ অন্তেষ্টির ব্যবস্থা করা হয়।-----

সর্প পূজা ভারতের কোন জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে কতকগুলি বিষয় এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাওতাল, ওরাও, মুণ্ডা শবর প্রভৃতি প্রোটো অষ্ট্রালয়েড বা আদি অস্ত্রাল বলিয়া পরিচিত ভারতীয় যে আদিম জাতিগুলি মধ্য পূর্বভারতে আজও বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্প ইহাদের অধিকাংশেরই ভক্ষ্য এবং সর্প সম্বন্ধে ইহাদের কোন শ্রদ্ধা বোধ নাই। (পৃষ্ঠা-২৪৪-২৪৫, ঐ)।

www.pathagar.com

উপরের উদ্ধৃত ভাষ্যে যে উল্লেখিত হইয়াছে "মেসোপটেমিয়ার (অর্থাৎ আরব ভূখণ্ডে অবস্থিত ইরাকের) প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে একটি সর্পদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার দুই বাহুতে তাগার মত দুইটি সর্প ও গলদেশে আর একটি সর্প হারের মত বেষ্টন করিয়া আছে" উহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে সর্পপূজা আরবের মেসোপটেমিয়া হইতেই সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। বাংলাদেশে সর্পদেবী মনসার যে পূজা হইয়া থাকে এই মনসা পূজাও তাই ইরাকের উক্ত সর্প দেবীর পূজা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা চলে।

এই রূপে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্ব যুগের পৌত্তলিক আরবদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত বাংলাদেশের অমুসলমান পৌত্তলিক হিন্দু অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের হুবহু ঐক্য ও সাদৃশ্যে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে উপরিউক্ত প্রাচীন পৌত্তলিক আরববাসীর ও প্রাচীন পৌত্তলিক হিন্দু বঙ্গবাসীর প্রাচীন পূর্ব পুরুষ মূলত এক ও অভিন্ন প্রাচীন পৌত্তলিক আরব জাতি সম্ভূতই দুইটি জাতি।

আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হইলে পরে উক্ত পৌত্তলিক আরববাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়া থাকিলেও নৃ-জাতি হিসাবে যেমন এক ও অভিন্ন নৃ-জাতিই রহিয়াছে ঠিক তেমনি বঙ্গদেশেও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হইলে পরে পৌত্তলিক হিন্দু বঙ্গবাসীদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইলেও নৃ-জাতি হিসাবে পূর্ব বর্ণিত এক ও অভিন্ন নৃ-জাতি রহিয়া গিয়াছে। উপরন্তু উল্লেখ্য যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম যেমন আরব হইতে আসিয়াছে, বঙ্গবাসী পৌত্তলিক হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্মও তেমনি উপরে বর্ণিত তথ্যানুসারে আরব হইতেই বঙ্গদেশে আসিয়াছে বিধায় এই দুইটি পৃথক ধর্মের অভ্যুদয়ের মূলেও আরব দেশ ও আরব জাতিই রহিয়াছে বলিতে হইবে।

হিন্দু ধর্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তর বিচরণ করিতে হয়।

সুপণ্ডিত অক্ষয় কুমার দত্তও তাই বলিয়াছেন, "হিন্দু ধর্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তর বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারত ভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না, দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।"(পৃষ্ঠা-১ উপক্রমনিকা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ+৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)।

www.pathagar.com

ধর্মীয় দিক হইতে পৌত্তলিক হিন্দু ও মুসলমান তাই দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া থাকিলেও মূলতঃ এক ও অভিন্ন আরব জাতীয় নৃ-জাতির মানুষই বলিতে হইবে। এই অতি বাস্তব সত্যের কারণেই এতদ্দেশীয় পৌত্তলিক হিন্দুগণও প্রাচীন কালে মক্কার কাবার দেব মূর্তিগুলির প্রতি তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাইতে আরবের মক্কায় গমন করিতেন বলিয়াও জানা যায়।

"ঐতিহাসিক ফিরিশতার একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ভারতের ব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে মক্কায় গমন করতো ও কাবার দেব মূর্তিগুলির প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতো।"(পৃষ্ঠা-২৪, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন।)

ভারতের শিখ ধর্মপ্রবর্তক গুরু নানক ১৫২০ খৃষ্টাব্দে যে মক্কায় গমন করিয়াছিলেন উহাতেও প্রাচীনকালে ভারতের ব্রাহ্মণেরা যে মক্কায় গমন করিতেন এই সত্যের পরিপূরক অতি বাস্তব নিদর্শন মিলে। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্য সবিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

"Mukhtiar Singh, a Sikh furniture maker in New Delhi, was invited to Baghdad in January last year (1990) by Saddam (President of Iraq) ---During their 70 minute meeting, Singh presented Saddam with a lion carved out of rose wood. Saddam wanted to know if there was anything he could do for his guest. Singh asked him if he could restore a historic gurdwara in Baghdad that commemorated Guru Nanaks stop over there on his way back from Mecca in 1520. The Iraqi strong man immediately issued an order to restore only gurdwara in any Arab country. [page-6, India notes compiled by Atul B. Vaidya, India west (a weekly magazine of Califorina, Los Angeles, U. S. A) February, 22, 1991] অতএব, মক্কা একমাত্র মুসলমানদেরই তীর্থস্থান নহে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলেরই তীর্থস্থান।

সে যাহা হউক, মানুষের ধর্ম, কর্ম ও বাসস্থান পরিবর্তিত হইলেও তৎ সঙ্গে মানুষের মূল নৃ-জাতিত্ব যে পরিবর্তিত হইতে পারে না, উপরিউক্ত আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে বিভিন্ন নৃ-জাতির মধ্যে আন্তর্বিবাহের মাধ্যমে রক্তমিশ্রনের ফলে মিশ্র নৃ-জাতির উদ্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন নৃ-জাতির এই রূপ সংমিশ্রণ ভারতেই সর্বাধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে বিধায় ভারত যে প্রকৃতপক্ষেই বহু মিশ্র জাতির দেশ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

www.pathagar.com

"Many conquests gave India a mixed population. Early India had a mixture of peoples as well as religions -----the newer people intermarried with......old people. Many mixed groups appeared, differing somewhat in their physical characteristics. Older languages sometimes survived, newer languages developed. In the end more than 150 Languages came to be spoken in India." (Page-163, The history of our world—Teachers Edition, Edited by Arthur E. R. Boak and others, Houghton Mifflin company, New York . U. S. A.) অর্থাৎ বহু বিজয় ভারতকে একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী দান করিয়াছে। প্রাচীন ভারতে মিশ্র জনগোষ্ঠী যেমন ছিল তেমনি ধর্মেরও মিশ্রণ ছিল। নূতন জনগোষ্ঠী পুরাতন জনগোষ্ঠীর সহিত আন্তর্বিবাহে আবদ্ধ হইত। তাহাদের কিছু না কিছু বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য সহ মিশ্র জনগোষ্ঠী আবির্ভূত হইয়াছিল। কোন কোন সময়ে পুরাতন ভাষা থাকিত, নূতন ভাষারও উদ্ভব হইত। শেষ পর্যন্ত ১৫০টিরও অধিক ভাষা ভারতে কথিত হইতে থাকে।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মূল অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের উপরে বর্ণিত মৌলিক আরবীয় নৃ-জাতিত্ব অবিমিশ্র অর্থাৎ নির্ভেজালই রহিয়া গিয়াছে। ভারতের মত বহিরাক্রমণ বাংলাদেশের উপরে সংঘটিত হইতে পারে নাই বলিয়াই মূল বঙ্গবাসীর মধ্যে ভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণও হইতে পারে নাই বিধায় বঙ্গবাসীর মৌলিক আরবীয় নৃজাতিত্ব অক্ষুণ্ন ও নির্ভেজালই রহিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্য সুস্পষ্ট হইবে—

"পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) যে পৌত্তলিক আরবেরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন কাব্য কাহিনী, স্বর-ভংগি, ভাষা, পূজাপদ্ধতি, এগুলোর মধ্যে। পৌত্তলিক আরবেরা যদি তলোয়ার হাতে এসে বাংলা দখল করত তবে তাদের নামেও ইতিহাস লেখা হত—প্রাচীনকালের ইতিহাস ত পদানত জাতির রক্তে লেখা। এরা এসেছিল সওদাগর হিসাবে।

প্রাচীন কালে তেজারতি ছিল নৌকার উপর নির্ভরশীল—তবু বাংলা-আসামই নয় সুদূর কাশ্মীর থেকেও মাল-পত্র বাইরে যেতো বাংলার নদীর পথে।

পৌত্তলিক আরবেরা এখানে এসে বসতি করার এই সুবিধার উপরে আরেক সুবিধা ছিল এই যে, (বহু নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের বড় বড় নদীর প্রাকৃতিক বাধা ছাড়াও) ভারত আক্রমণকারীদের বহু দূর পাল্লায় ছিল তখন

www.pathagar.com

বাংলা। ইতিহাসের অন্তরালে নির্বিবাদে এরা বসতি বিস্তার করতে থাকে।” (পূর্ব পাকিস্তানে পৌত্তলিক আরব, জাহিদুল হুসাইন, মাসিক মোহাম্মাদী আষাঢ়, ১৩৬৭, ৩১ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

সে যাহা হউক, পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী “সারা জীবন মানুষের মধ্যে শান্তির ও ঐক্যের সন্ধান করেছেন—বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তির ও ঐক্যের—তবু তিনি শান্তির প্রণালী ও ঐক্যের বিজ্ঞান আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি।------ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে---এই ঐক্য বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণার ও তার মূলীভূত উপাদান ও কার্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন অন্য সকল প্রয়োজনের চেয়ে গুরুতর।”........এ বিষয়ে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরু সদয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন “আজকাল জাতি গঠনের আহবান আমাদের দেশে সব ক্ষেত্রে এসেছে।...........জাতি গঠনের মূলীভূত—প্রণালী আপন দেশের প্রাচীন প্রথার মধ্যে যেগুলি নিদোর্ষ ও বলদায়ী, সেগুলি সযত্নে পরিপোষণ ও প্ররক্ষণ করা এবং জীবনে চালু রাখা। আর একটি মূলীভূত প্রণালী—দেশের সকল সম্প্রদায় যে প্রথাগুলিকে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করে সেগুলির প্রবর্তন করে সকলের মধ্যে ঐক্য ও অভিন্নভাব স্থাপন করা।”

দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া দেশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যের সন্ধান করিয়া দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিষ্কন্টক ও নিরাপদ করিয়া দেশের সর্বাংগীন উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে তাই ইতঃপূর্বে আলোচিত বাংলাদেশ ও আরবের প্রাচীন যোগসূত্রে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রাচীন মৌলিক আরবীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির যে ঐক্য রহিয়াছে উহা'র মাধ্যমেই এতদ্দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপন করিতে হইবে।

সুতরাং এই আলোচনার শিরোনামে “বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের চাবিকাঠি আরবী” বলিয়া যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, বহু দৃষ্টান্ত সহকারে এত সুদীর্ঘ আলোচনার পরে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও থাকিতে পারে না বিধায় তাহা কোন অতিশয়োক্তি বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। “বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের চাবিকাঠি আরবী” কথাটি তাই অতি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যেরই কথা।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩

আরবী ভাষার সামগ্রিক পরিচয়

আরবী পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত একটি ভাষা হইলেও অন্যান্য ভাষা হইতে অনেক প্রাচীন ভাষা। আরবী ভাষার এই প্রাচীনত্ব কত দিনের জানিতে হইলে প্রাচীন সামী (অর্থাৎ সেমিটিক) ভাষার প্রাচীনত্বের কথাও জানিতে হইবে। কেননা, প্রাচীন সামী (অর্থাৎ সেমিটিক) ভাষা হইতেই আরবী ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। আর সামী হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে আরবী ভাষা মূল সামী ভাষার নিকটতম ভাষাই শুধু নহে, এমনকি মূল সামী ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আরবীতেই সংরক্ষিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে (১) মূল সামী (অর্থাৎ সেমিটিক) ভাষার প্রায় সমস্ত বর্ণগুলি তুলনামূলকভাবে অন্য ভাষা অপেক্ষা আরবীতেই সংরক্ষিত রহিয়াছে। (২) ব্যাকরণগত অনেক সূক্ষ্ম নিয়ম কানুন আরবী ভাষায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায় তেমন অন্যগুলিতে পাওয়া যায় না। (৩) আরবীতে হিব্রু ও আরামীর সকল শব্দের ধাতুর সন্ধান মিলে, কিন্তু হিব্রু ও আরামীতে আরবীর সকল ধাতু পাওয়া যায় না। এমন কি হিব্রু ও আরামীতে এমন সমস্ত শব্দও আছে যেগুলির ধাতু হিব্রু ও আরামীতে স্থির করা সম্ভব হয় নাই, অথচ আরবীতে হিব্রু ও আরামীর ধাতুর সন্ধান মিলিয়াছে। (৪) কোন কোন শব্দের অংশ বিশেষ হিব্রু ও আরামীতে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সমুদয় শব্দ আরবীতে পূর্ণ অবয়বে টিকিয়া রহিয়াছে। (৫) আরবীতে প্রায় সকল ক্রিয়া ব্যাকরণ সম্মত নিয়মে গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু হিব্রু ও আরামীতে তেমন সমস্ত ক্রিয়া পদের সংখ্যাই বেশী যাহা নিয়মিত গঠিত নহে। (৬) হিব্রু ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক সিফ্‌র-ই-আয়্যুব-এ প্রচুর আরবী শব্দ রহিয়াছে। ইহাতে হিব্রু অপেক্ষা আরবীর প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয় । (৭) সামীদের (অর্থাৎ সেমিটিকদের) আদি বাসস্থান আরব দেশ। এই দেশের অধিবাসী (বিশেষ করিয়া হেজাজের ও নজদের অধিবাসী) বাহিরের সংস্রবে খুব কমই আসিয়াছে। কাজেই তাহাদের ভাষা ছিল নিষ্কলুষ এবং নিঃসন্দেহে মূল সামীর নিকটতম ভাষা।*

আর মধ্য আরবই সেমিটিকদের আদি বাসস্থান ছিল বিধায় সেই স্থান হইতেই সেমিটিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে সিরিয়া, বাবিল, উমান, য়মন ইত্যাদি স্থানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলিয়া যায় এবং তথায় বসতি স্থাপন

---

* ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,– আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, আ, ত, ম, মুছলেহ উদ্দিন।

www.pathagar.com

করিয়া তথাকার অধিবাসীতে পরিণত হয়। এই রূপে মূল সেমিটিক আরবী ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষারও উদ্ভব হয়।

আরবীকে তাই বলা হয় "উম্মুল-আলসিনা" অর্থাৎ ভাষার জননী (mother of languages)। (আর) আরবী হরফই জগতের সর্ব প্রথম হরফ (Alphabet)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই জন্যই ইহাকে 'The great mother Alphabet' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আরবী বর্ণমালাই কালে কালে নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া জগতে সহস্র সহস্র ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। ----Hoffman তাহার Beginning of writing নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিতেছেন—The semitic people comprised three principal divisions, each of which developed letters. To the phoenicians may be traced the origin of the Greek alphabet which become the parent of the various alphabets of Europe; from the high lands of Asia-minor, Aram, proceeded the Iranian group of alphabets which replaced the cuneiform writing as a script of the eastern provinces of the Persian Empire, to the south semitic type the ancient Alphabet of India with the numberless descendants, must be referred. (P. 166). অর্থাৎ ঃ- সেমিটিক জাতি তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকেই বর্ণমালার সাধনা করে ঃ (১) ফিনিসিয়ানরা গ্রীকদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দেয়, গ্রীকদের নিকট হইতে সমগ্র ইউরোপ তাহা শিক্ষা করে; (২) এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়া পারস্য সাম্রাজ্যে ইহা বিস্তার লাভ করে; (৩) দক্ষিণ ভাগ দিয়া প্রাচীন ভারতও ইহা গ্রহণ করে এবং কালে কালে এই ভারতীয় বর্ণমালা হইতে অন্যান্য অসংখ্য বর্ণমালা সৃষ্টি হয়।

বলা বাহুল্য, আরব, মিসর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, ব্যবিলন, আসিরিয়া, হিব্রু প্রভৃতি সকলেই সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচ্যবিশারদ বিখ্যাত ঐতিহাসিক Nicholson সাহেব বলিতেছেন ঃ 'The term (semitic) includes the Babylonians, the Assyrians, the Hebrwrs, the Phoenicians, the Armenians, the Abyssinias, the Sabians and the Arabs—Literary History of the Arabs."

আরব দেশের মানচিত্র দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় ঃ এই উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপ, পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্য ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ অবস্থিত। বস্তুত আরব দেশ এশিয়া, ইউরোপ ও

www.pathagar.com

আফ্রিকার সংযোগ কেন্দ্র। ইহাই মানব জাতির আদিম বাসস্থান; এই জন্যই আরবীতে ইহাকে বলা হয় 'উম্মুল কোরা' বা বাসভূমির জননী। এখান হইতেই দিকে দিকে মানব সমাজ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং নানা জাতিতে বিভক্ত হয়। কাজেই বলা যাইতে পারে, সেমিটিক জাতি ও সেমিটিক সভ্যতাই জগতের সকল জাতি এবং সকল সভ্যতার মূল। গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা বা আর্যসভ্যতা—কোনটাই সেমিটিক সভ্যতার অগ্রবর্তী নয়।--------

ঐতিহাসিকেরা বলেন, মিসর দেশেই সর্বপ্রথম হরফের আবির্ভাব হয়। সেগুলি অবশ্য প্রকৃত হরফ নয়, সেগুলি চিত্রাক্ষর (Hieroglyphics)। মিসরীয়দের নিকট হইতে এই বর্ণমালা ফিনিসিয়ানরা শিক্ষা করে এবং পরে ফিনিসিয়ানদের নিকট হইতে গ্রীকরা তাহা গ্রহণ করে।

এ কথা মানিয়া লইলেও আমাদিগকে দেখিতে হইবে মিসরবাসীরা কোথা হইতে এই বর্ণমালা পাইল। মিসর দেশের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায় অতি প্রাচীন কালে আরব দেশ হইতেই মরুচারী বেদুইন দল মিসর আক্রমণ করে এবং সেখানে তাহারা বসতি স্থাপন করে। এই ব্যাপার ইতিহাসের সীমানার বহু অতীতে সংঘটিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Breasted তাঁহার "History of Egypt" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ 'An invasion of the Nile valley by Semitic nomads of Asia stamped its essential character unmistakably upon the language of the African people there. The earliest strata of the Egyptian language accessible to us betray clearly this composite origin. While still coloured by its African antecedents, the language is in structure Semitic ---The semitic immigration from Asia, examples of which are also observeable in the historic age, occurd in an epoch that lies far below our remotest historical horizon. We shall never be able to determine when, nor with certainty through what channels, it took place, although the most probable route is that along which we may observe a similar influx from the desert of Arabia in historic times the isthmus of suez, by which the Muhamadan invasion entered the country. (Page-26) অর্থাৎ ঃ সেমিটিক বেদুইন জাতিরা নীল নদের উপত্যকাভূমি আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদের ভাষার উপর গভীর রেখাপাত করে। মিসরীয়দের ভাষার মূলে আফ্রিকার ছাপ থাকিলেও তাহার

www.pathagar.com

গঠন প্রণালী সেমিটিক। ----এই সেমিটিক আক্রমণ ইতিহাসের সীমারেখার বহুদূরে সংঘটিত হয়। কখন কেমন করিয়া কোন পথ ধরিয়া সেমিটিকরা মিসর আক্রমণ করে তাহা সঠিকভাবে আমরা বলিতে পারি না। খুব সম্ভব বর্তমান কালের ন্যায় সুয়েজ যোজক ধরিয়া তাহারা মিসরে প্রবেশ করে। ---

প্রাচীন ইতিহাস হইতে ইহাও জানা যায় যে, হিকস্‌স্‌ (Hyksos) নামক এক মরুজাতি মিসর দেশ আক্রমণ করে। ইহারা আরবের বেদুইন জাতি। ইহারা মিসর দেশ অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের একজন রাজার নাম ইয়াকুব। (Illustrated World History)

ফিনিসিয়ানদের পূর্ব-পুরুষ ও আরব-জাতি হইতেই উদ্ভূত ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

তাহা হইলে এ কথা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, মিসর বা ফিনিসিয়া যে দেশকেই হরফের আবিষ্কারক বলা যাউক না কেন, হরফের প্রকৃত আবিষ্কার হইয়াছিল আরব দেশে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আরব দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরব দেশেই সর্ব-প্রথম হরফের আবিষ্কার হয়।

আরব দেশে যে সমস্ত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মোয়াব প্রদেশের মেসাহ্ নামক এক রাজার শিলালিপিই উল্লেখযোগ্য।

"The cardinal example of the oldest epoch of semitic palaeography is the inscription of Messa king of Moab. Messa was a contemporary of Ahab and Jehoram. Ahab's reign extended over the two last decades of the 10th century B.C.-----The alphabet of the moabite stone may, therefore, be regarded as representing the semitic alphabet of the 10th century." The alphabet, by Taylor (Page 93).(অর্থাৎ মোয়াবের রাজা মেসার শিলালিপিই খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর সেমিটিক বর্ণমালার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।)। এই মোয়াবাইট বর্ণমালাই আধুনিক সমস্ত বর্ণমালার মূল।

এমন কি সেমিটিক বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালারও উৎপত্তি স্থল। Taylor বলেন ঃ 'To some very ancient but unknown period, we must also assign the origin of the primitive Arabian or Ishmaelite alphabet, which became the parent of the Ethiopic

www.pathagar.com

and Indian alphabets'. অর্থাৎ আরবী বা ইসমাইলী বর্ণমালার উৎস মূল অতি প্রাচীন। এই আরবী বর্ণমালা হইতে হাবশী এবং ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম।

সুতরাং ---আরব দেশই হরফের আদিম জন্মস্থান এবং আরবী ভাষাই সকল ভাষার "জননী" (উম্মুল আলসিনা)।

সবভাষাই আগে ডান দিক হইতে (বাম দিকে) লেখা হইত

আরবী বর্ণমালার সহিত অন্যান্য বর্ণমালার শুধু যে নামেই সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, আরবী ভাষার অনুকরণে হীব্রু, ফিনিসিও প্রভৃতি ভাষাও ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লেখা হইত। ---এমনকি প্রাচীন গ্রীক ভাষাও ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লেখা হইত ঃ 'In Thera (Greeca) the oldest inscriptions are written from right to left'. (Encyclo. Britanica).

এমন কি ভারতের প্রাচীন বর্ণমালাও (Kharoshthi and Brahmi) সেমিটিক বর্ণমালা হইতে গৃহীত; সেমিটিক ভাষার ন্যায় উহাও ডান দিক হইতে (বাম দিকে) লিখিত হইত ঃ 'The direction of Kharoshthi script was from right to left'.—Diringer. (অর্থাৎ খারোস্থি বর্ণমালা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লেখা হইত।)

এই 'খারোস্থি' এবং 'ব্রাহ্মী' হইতেই ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয় এবং যেহেতু 'খারোস্থি' এবং 'ব্রাহ্মী' আরবী বর্ণমালা হইতে ধার করা হয় সেই জন্যই উহা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লেখা হইত। ----বৈদিক যুগে কোন বর্ণমালা ছিল না। তখন 'শ্রুতি' এবং 'স্মৃতি' দ্বারাই মুখেমুখে বেদ মন্ত্র শিক্ষা হইত। তখনকার যুগে 'প্রাকৃতই' ছিল সাধারণ ভাষা। এই ভাষাও তখন ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লেখা হইত। সম্রাট অশোকের শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়, উহা প্রাকৃত ভাষায় লেখা এবং উহার গতি ছিল ডান দিক হইতে বাঁ দিকে—'Asok's inscriptions are written not in Sanskrit but in Prakrit and the direction of the script was from right to left'. (The Alphabet, by David Diringer.)

কাজেই -----আরবী বর্ণমালা হইতেছে মূল কাণ্ড, অন্যান্য বর্ণমালা সেই মূল কাণ্ডেরই শাখা-প্রশাখা। আরবী বর্ণমালা হইতে জগতের বিভিন্ন বর্ণমালা কিভাবে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়াছে তাহার মোটামুটি একটা পরিচয় পর পৃষ্ঠায় একটি ছকের মাধ্যমে দেওয়া হইল।

www.pathagar.com

মূল-সেমিটিক (Proto-Semitic)

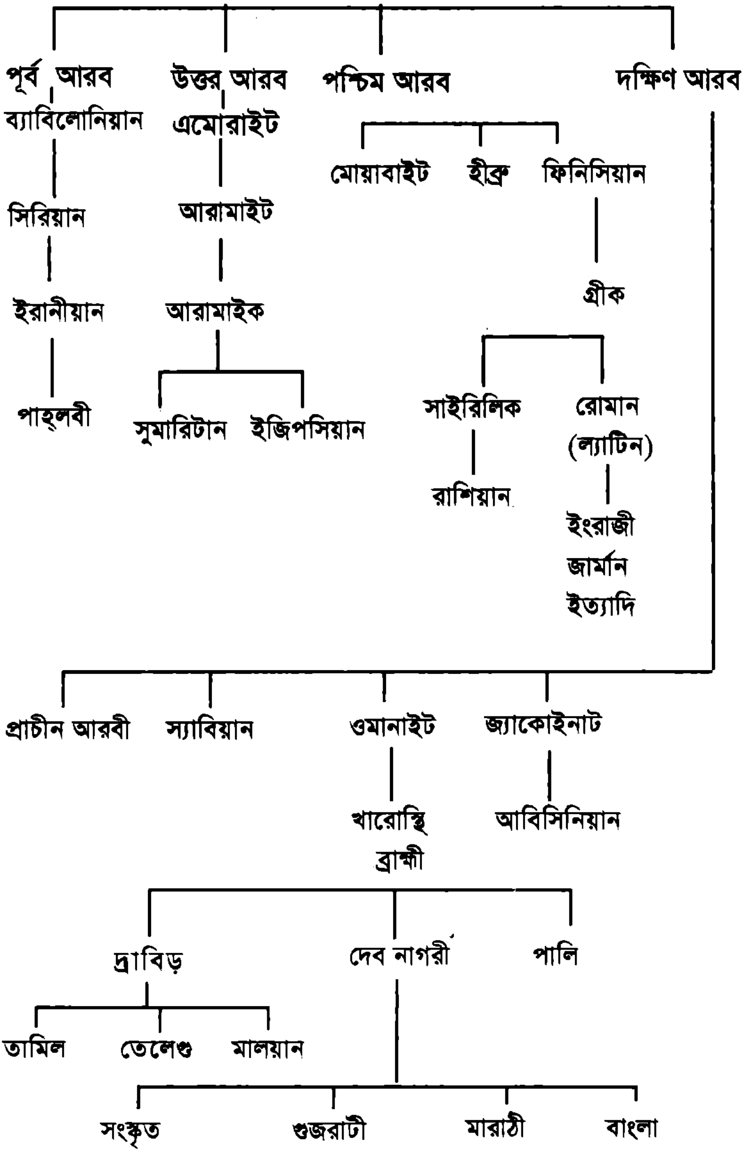

আরবী হরফের ইতিহাস, গোলাম মোস্তফা (প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০ বাং) হইতে সংকলিত।

www.pathagar.com

জগতের বিভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তারের যে (chart) ছক -এর উদ্ধৃতি এতদস্থলে দেওয়া হইয়াছে উহাতে বাংলা বর্ণমালা দেব নাগরী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু বাংলা বর্ণমালার আকৃতি প্রকৃতির গঠন প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দৃষ্টিগোচর হইবে যে বাংলা বর্ণমালা দেব নাগরী অপেক্ষা মূল প্রাচীন আরবী বর্ণমালার সহিতই অধিকতরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় বাংলা বর্ণমালা মূল প্রাচীন আরবী বর্ণমালা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। বিশ্বকোষে-এ উল্লেখিত হইয়াছে "প্রায় আড়াই হাজার বছর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গ ভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে" (পৃষ্ঠা–১৯ অষ্টাদশ ভাগ, ১৩১৪ বাংলা সন।) আড়াই হাজার বছর হইতে চলিল অর্থাৎ বর্তমানের দুই হাজার পাঁচ শত বছর পূর্বে অর্থাৎ পাঁচ শত খৃষ্টপূর্বাব্দেও বঙ্গলিপি নামে যখন একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল তখন সেই প্রাচীন বঙ্গলিপির উদ্ভব যে পাঁচ শত খৃষ্টপূর্বাব্দেরও বহু পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই সত্য হইতেই যে পাঁচ শত খৃষ্টপূর্বাব্দেরও বহু পূর্বে বঙ্গলিপির উদ্ভব না হইলে পাঁচ শত খৃষ্টাপূর্বাব্দে উহার প্রচলন থাকিতে পারিত না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায় যে বাংলা বর্ণমালা পাঁচ শত খৃষ্ট পূর্বাব্দেরও বহু পূর্বেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহা মূলতঃ প্রাচীন আরবী বর্ণমালা হইতে সোজাসুজিই উদ্ভূত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক আরবী ভাষা ও আরবী বর্ণমালা বা হরফ সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সমগ্র পৃথিবীর ভাষা সমূহের মধ্যে সেমিটিক ভাষাই যেহেতু সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভাষা আর আরবী ভাষাও যেহেতু মূল সেমিটিক ভাষার সর্বাপেক্ষা নিকটতম ধারক ও বাহক ভাষা বিধায় সেমিটিক ভাষার প্রাচীনতম প্রতিনিধিত্বকারী ভাষা তথা পৃথিবীর বর্ণমালা সমূহের মধ্যে আরবী বর্ণমালাই যেহেতু সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বর্ণমালা সেহেতু আরবী ভাষা ও আরবী বর্ণমালাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভাষা ও প্রাচীনতম বর্ণমালা। আর আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থই যে পৃথিবীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত 'বুক অব আইয়ুব'-ই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ।

"অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা মোসির পঞ্চম পুস্তক প্রভৃতি রচিত হওয়ার

www.pathagar.com

অন্ততঃ সমকালে তাহার মধ্যকার একখানা কেতাব বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পুস্তকখানার নাম Book of Iob, আরবীতে اسفر ايوب الحديق। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে পুস্তকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন (Ency. Britanica)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টি (Hitti) এই পুস্তকের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন— 'In Iob 6-19th Sheba (Ar. Saba) are associated with Tama (Tayma) Iob, the author of the Finest piece of poetry that the ancient semitic world produced, was an Arab, not a jew the form of his name Iyyob, (Ar. Ayyub) and the scene of his book north Arabia indicate.' (Page-42-43)

সুতরাং বেদকে পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়ার অনুকূলে যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই, ইহা দৃঢ়তার সাথে বলা যাইতে পারে।" (পৃষ্ঠা-১০ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস মোহাম্মাদ আকরম খাঁ।)

জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ বেন্দ-ই-দাদ হইতে "বেঁদ" নাম শব্দের উৎপত্তিও বেদ রচিত হইয়াছে বিধায় বেদকে পৃথিবীর মানব সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিবার কোনও উপায় নাই।

পারসিকদের জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ "বেন্দ-ই-দাদ" হইতেই ভারত বর্ষীয় হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ বেদ নাম শব্দের যে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বেন্দ-ই-দাদ এর 'বেন্দ' শব্দের সহিত 'বেদ' শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্যে সহজেই ধরা পড়ে। যেমন—বেন্দ-ই-দাদ>বেন্দ>বেঁদ> বেদ। তাই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম গ্রন্থ বেন্দ-ই-দাদ-এর পরেই বেন্দ-ই-দাদ এর প্রায় হুবহু অনুকরণেই বেদ রচিত হইয়াছে, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। তদুপরি বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য জেন্দ আবেস্তার ভাষাও শ্লোকের সহিত বেদের ভাষা ছান্দস-এর ও শ্লোকের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় এই সত্য অধিকতরভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য জেন্দআবেস্তা হইতেই বেদ এর উৎপত্তি হইয়াছে।

"জরথুস্ত্রীয়দের প্রাচীন শাস্ত্র আবেস্তার (বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য জেন্দআবেস্তা) ভাষার সঙ্গে বৈদিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বৈদিকের বহু শ্লোক আবেস্তার ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।" (পৃষ্ঠা-১১১, ভাষা তত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার।)

আর জেন্দ আবেস্তার 'জেন্দ' শব্দ হইতেই যে বেদ এর ভাষার নাম ছান্দস হইয়াছে তাহাও নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে সুস্পষ্ট হইবে—

www.pathagar.com

"শ্রীমান ম. মূলার (প্রফেসর ম্যাকস মূলার) সংস্কৃত ছান্দস ও আবস্তিক জেন্দ এই দুইটি শব্দ অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন।..........জেন্দ শব্দের অর্থ ভাষ্য বা অনুবাদ কিন্তু 'ছান্দস' শব্দের অর্থ মূল বেদ।" (পৃষ্ঠা-৬০, ৬১, ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ+৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।)

উপরন্তু ভারতের বেদ সংহিতায় 'জরদুষ্টি' শব্দটি যে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতেও 'বেদ' যে জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য 'জেন্দআবেস্তা' হইতে অর্থাৎ মূলে "বেন্দ-ই-দাদ" হইতেই রচিত হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

"বেদ সংহিতায় জরদুষ্টি এই শব্দটি বিদ্যমান আছে, শ্রীমান ম. হগ প্রভৃতি উহাকে অবস্তায় লিখিত জরথুস্ত্র—প্রতিপাদক বলিয়া বিবেচনা করেন।" (পৃষ্ঠা-৪৫, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত।)

পারসিক ধর্মগুরু জরথুস্ত্র ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিধায় জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ বেন্দ-ই-দাদ ও ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই রচিত হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়। আর ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বেন্দ-ই-দাদ এর পরেই যেহেতু বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য জেন্দ আবেস্তা রচিত হইয়াছিল এবং তাহারও পরে জেন্দ আবেস্তার অনুকরণে যেহেতু ছান্দস ভাষায় বেদ রচিত হইয়াছিল সেহেতু বেদ এর রচনা কাল ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগে হইতে পারে না, অর্থাৎ বেদ এর রচনা কাল ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কেননা বেন্দ-ই-দাদ হইতে জেন্দ আবেস্তা এবং পরে জেন্দ আবেস্তা হইতে বেদ রচিত হইতে কম করিয়া ধরিলেও ১০০ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

"ঋগ্বেদ ও ইরানীদের জেন্দ আবেস্তার ভাষার মধ্যে অতিঘনিষ্ট সম্বন্ধ লক্ষ্য করে তারা (অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ববিদগণ) বলেন যে, যদি আবেস্তার প্রাচীনতম অংশের রচনা কাল খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী (অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দ) হয় তবে ঋগ্বেদের সর্বপুরাতন সুক্তাবলীর রচনাও খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী (অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম, ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্থাৎ ৬০০-৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেরও পরবর্তী খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর অর্থাৎ ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের) হইবে।" (শ্রী দীনেশ চন্দ্র সরকার, সিন্ধুলিপির রহস্য পৃষ্ঠা-৫২, সাপ্তাহিক "দেশ" কলিকাতা, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮১)

এতদ্ব্যতীত, বেদ যে ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদেশী ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজের হাতে বাহির হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে তাহাতেও

www.pathagar.com

বেদ যে পরবর্তী কালে বেন্দ-ই-দাদ এর ভাষ্য জেন্দ আবেস্তার অনুকরণে ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও নয় বরং ইংরেজ শাসনামলেই রচিত হইয়া থাকিতে পারে তাহাতেও বিস্মিত হইবার যে কিছু নাই তাহা নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইতে পারিবে।

"বেদের সময় নির্ধারণে এ পর্যন্ত কেহই একমত হইতে পারেন নাই। (রমেশ চন্দ্র দত্ত) পণ্ডিত মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বেদের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর বলিতেছেন—সুতরাং বেদের কাল নির্ণয় অসম্ভব ব্যাপার। (শাস্ত্র তত্ত্ব, ২৮ খণ্ড, ঋগ্বেদ উপক্রমনিকা, ৮৯ পৃষ্ঠা) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—বেদের কাল কেহ বিদিত নয় এবং তৎপ্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং বেদকে পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়ার অনুকুলে যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। ইহা ব্যতীত বেদের সংখ্যা বিভিন্ন বেদের পারম্পর্য প্রভৃতি নিয়া আরও বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। --- ঋগ্বেদের ভাষ্যকার পণ্ডিত মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঋগ্বেদের ভাষ্য হইতে একটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—'বেদে যে সকল সত্য নিহিত আছে তাহা এতদিন জানিবার বিশেষ উপায় ছিল না। বেদের হস্তলিপি অতি দুর্লভ, যদি বিদেশীয়গণের অনুকম্পায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে বিদেশ হইতে মুদ্রিত হইয়া বেদ ভারতে দর্শন না দিতেন তবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইত।' বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই স্বীকারোক্তির পর, বেদের ঐতিহাসিক স্বরূপ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করার দরকার থাকিতেছে না। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বেদ নামের যে কয়খানা পুস্তক হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সঙ্কলিত হইয়াছিল কলি যুগের ম্লেচ্ছাবতার "পণ্ডিতাচার্য" মোক্ষমুলারের দ্বারা এবং সদাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল অর্থ সাহায্যে ও অস্বাভাবিক সহানুভূতির ফলে।" (পৃষ্ঠা-১০, ২৩, ২৭, ২৮, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আকরম খাঁ)

এমতাবস্থায় ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু যে বলিয়াছেন-"বেদগুলির প্রথমটির নাম ঋগ্বেদ, এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ সমগ্র মানব সমাজেরই প্রাচীনতম পুস্তক।"(পৃষ্ঠা-৭৯, ভারত সন্ধানে)। উপরে বর্ণিত অতি বাস্তব সম্মত সঙ্গত কারণেই পন্ডিত নেহেরুর এই মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন উপায় নেই।

এতদ্ব্যতীত, "ম্যাকসমূলার ঋক বেদের যে অনুবাদ করেন তার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন,—ঋক বেদ হচ্ছে "The most ancient books in the library of mankind." (পৃষ্ঠা-১১১, ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুনষ্যজাতির পাঠাগারে (ঋকবেদ) সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর উপরে বর্ণিত অসত্য মতের মতই উপরে বর্ণিত একই বাস্তব সম্মত সঙ্গত কারণেই ম্যাকসমূলারের উপরিউক্ত মতও সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাই বেদের ভাষা যেমন পৃথিবীর প্রাচীনতম আদি ভাষা নহে, তেমনি বেদ ও পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ নহে। পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের প্রাচীনতম আদি ভাষা যেমন আরবী ভাষা তেমনি প্রাচীনতম আদি গ্রন্থ আরবীতে রচিত বুক অব আইওব (Book of Iob), যা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আরবী ভাষা জগতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্বেকার প্রাচীনতম একটি ভাষা হইয়া থাকিলেও তথা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মের ভাষাও আরবী হইলেও আরবীকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় ভাষারূপে বিবেচনা করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও আবার একমাত্র মুসলমানদেরই ধর্মীয় ভাষা আরবী, এই কথাটাই মাত্র আমাদের জানা কথা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আরবী একটি ধর্মীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও যে মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মেরও ভাষা তাহা আমরা একটি বারও ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ পাই না। তাই আরবী যে অমুসলমানদেরও ভাষা তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না বলিয়া আমাদের অনেকেরই তাহা জানা নাই। আর আমাদের মধ্যে যাহাদের তাহা জানা আছে তাহারাও যতখানি জানা থাকিলে প্রকৃতই জানা বুঝায় ততখানি জানেন না বিধায় তাহাদের ধারণাও অত্যন্ত সীমিত ও অস্পষ্ট।

এমতাবস্থায়, এই কথাটা সুস্পষ্ট করিয়াই বলা প্রয়োজন যে মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব হইতেই আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল, যাহা ইতঃপূর্বেই বহু দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখিত হইয়াছে। আর সেই অতিপ্রাচীন কালে সেই আরবী ভাষায় যাহারা কথাবার্তা বলিতেন, লিখিতেন, পড়িতেন, সোজা কথায় সমস্ত প্রকারের কাজ কর্ম চালাইতেন, তাহারা তাই মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন অমুসলমান। নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও এই সত্য প্রতীয়মান হইবে "বস্তুত আরবী আজ বিশ্বের চতুর্থ আন্তর্জাতিক ভাষা। জনৈক গবেষকের মতে-চীনা, ইংরেজী, স্পেনিস ভাষার পর বিশ্বের প্রায় ১৫০ মিলিয়ন লোক আরবীতে কথা বলে। আর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর স্থান দ্বিতীয় যা প্রায় ৮০০ মিলিয়ন লোকের মুখের বুলি।

দ্বিতীয়তঃ আরবীয় পরিমণ্ডল বিশাল বিস্তৃত। আফ্রিকার "সাওয়াহেলী" ও 'আল হাওসা" ভাষা দু'টি শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ শব্দ আরবী থেকে গ্রহণ করতঃ নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। অনুরূপ "ওলফ" ও "ফালানী" ভাষারও

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শব্দমালা আরবী থেকে সংগৃহীত।"(পৃষ্ঠা-৬, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫শে জুন, ১৯৮৭, ১০ই আষাঢ়, ১৩৯৪, ঢাকা) বর্তমানেও আরব দেশ সমূহের খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি অমুসলমানদের দৈনন্দিন কাজের ব্যবহারিক ভাষাও আরবী। আরবী তাই শুধু মাত্র প্রাচীনতম ভাষার অন্যতম ভাষাই নহে, বর্তমানেও একটি জীবন্ত ও অত্যন্ত কার্যকর ভাষা বটে। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে আরবী ভাষাটা অমুসলমানদেরও ভাষা।

তদুপরি, এতদ্দেশেও "তখনকার দিনে আরবী পার্সী শিক্ষার প্রতি হিন্দু আর্যদের যে কত আগ্রহ ছিল এবং ঐ ভাষা দুইটি শিক্ষার জন্য তাহারা কিরূপ নিষ্ঠার সহিত উদ্যোগী হইতেন, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ঃ

'জ্যৈষ্ঠা, শ্লেষা মঘা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখা চোত্তরাষঢ়া শতর্ভে পাপ বাসরে।।
লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসীমারবীং পঠেত।।'
ইতি গণপতি মুহূর্ত চিন্তামনি।
(শব্দ কল্প দ্রুম ও বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠা, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা, উত্তরষঢ়া ও শতভিসা নক্ষত্রে শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সচন্দ্রস্থির লগ্নে আরবী ও ফার্সী অধ্যয়ন করিবে।" (পৃষ্ঠা-৫, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আকরম খাঁ।)

তবে আজ যে অমুসলমান পৌত্তলিক হিন্দুগণ তাহাদের সহিত আরবী ভাষারও যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন না, তাহারও কারণ তাহাদের সহিতও আরবী ভাষার যে এক সুগভীর রক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা প্রমাণের জন্য আজ পর্যন্তও কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। আরবী ভাষার সহিত বঙ্গভাষার তথা বঙ্গবাসীর যে কি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যেরও অভাব নাই, তাহা যদি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে আজিকার পৌত্তলিক হিন্দুগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন যে, আরবী ভাষার সহিত মুসলমান অমুসলমান সকল মানুষেরই এক অতি প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্ক অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও থাকিবে।

ইহা ছাড়া, আমাদের দেশের মুসলমানগণ একমাত্র ধর্মীয় প্রয়োজনেই আরবী পড়িতে হয় বলিয়া আরবী অক্ষর মোটামুটি পড়িতে শিখিলেও আরবী

www.pathagar.com

অক্ষর লিখিতে যেমন শিখেন না তেমনি আরবী ভাষার বাংলা অর্থ শিক্ষার প্রয়োজনীতাও বোধ করেন না, একমাত্র মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছাড়া। ধর্ম ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও আরবী ভাষা যে কাজে লাগিতে পারে তাহা তাহারা জানেন না। তাহারও কারণ, আরবী ভাষার অন্যবিধ প্রয়োজনের কথা তাহাদের জানিবার বা জানাইবার চেষ্টা এ যাবৎকাল করা হয় নাই। ফলে মুসলমান অমুসলমান সকলেই আরবী ভাষাকে একমাত্র মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছেন। আর এই ধারণা হইতেই অধিকাংশ অমুসলমান বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ তাহাদের ঘোরতর ইসলাম ধর্ম বিদ্বেষের কারণে আরবী ভাষারও বিরোধিতা করিয়া থাকেন।

আরবী একটি বিশ্ব জনীন ভাষা, মুসলমান অমুসলমান সকলেরই ভাষা আরবী—আরবী শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষাই মাত্র নহে। আরবী ভাষার সঙ্গে অমুসলমানদেরও বহু দূরাগত রক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, ধর্মের দ্বারা নহে, বরং আরবের বহু দূরাগত রক্ত ও ভাষার এক সুগভীর সম্পর্কে বর্তমানের মুসলমান ও অমুসলমানগণ একে অপরের ভাই ভাই ছাড়া অন্য কিছু নহেন।

আরবী ভাষার এই সার্বজনীন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তথা আরবী ভাষা ও আরব জাতির সহিত বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের আত্মীয়তা সূত্রে মুসলমানগণ যে আর্য হিন্দুদিগের অপেক্ষাও বাঙ্গালী হিন্দুদের অধিকতর কল্যাণকামী বন্ধু হইতে পারেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়া এতদ্দেশীয় মুসলমান অমুসলমানদের মধ্যে এক সুদৃঢ় ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া এতদ্দেশের সমূহ কল্যাণের এক নবদিগন্তের দ্বারোদঘাটন করিবার জন্যই 'বাংলার মূল আরবী' শিরোনামে এই পুস্তক রচনার ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সহিত আরব দেশ ও আরবী ভাষার অতি প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আমি বলিতে উদ্যোগী হইয়াছি এইমাত্র আশায় যে এই প্রকার জানাজানির ফলে আরব দেশ, জাতি ও আরবী ভাষা সম্পর্কে আমাদের যে প্রচলিত ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহা দূর হইবে এবং বাংলাদেশ, জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতেও আরবী ভাষার মত একটা অতি প্রয়োজনীয় ভাষাকেও আমরা জানিতে বুঝিতে সচেষ্ট হইব। ইহার অর্থ অবশ্য ইহাই নহে যে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে বর্জন করিয়া আরবীকেই আমাদের মাতৃভাষা করিব ; বরং সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাকে বর্তমানে আমরা যেমন আগ্রহ সহকারে পড়িয়া থাকি তেমনি আগ্রহ লইয়া আরবী ভাষাও পড়িব। তবুও আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিলেই আরবী

www.pathagar.com

আমাদের মাতৃভাষা হইয়া যাইবে না। কেননা, সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়নের কারণে সংস্কৃত ও ইংরেজী যেমন আমাদের মাতৃভাষার স্থান দখল করিতে পারে নাই, তেমনি আরবী অ্ধ্যয়ন করিলে আরবীও আমাদের মাতৃভাষার স্থান দখল করিতে পারিবে না। আরবী অধ্যয়ন করিলেও আমাদের মাতৃভাষা বাংলাই থাকিবে।

তবুও আরবী ভাষার নাম শুনিলেও যাহারা আতঙ্কিত হন* এবং আরবী ভাষার সমর্থনকে যাহারা গোঁড়ামি ও কুসংস্কার মনে করেন, তাহারা আরবী ভাষার সমর্থনকারীদের অপেক্ষাও অধিকতর গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এইমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণেই যে যাহারা আরবী ভাষার সপক্ষে তাহারা আরবী অধ্যয়নে উৎসাহ বোধ করিলেও সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়নে আপত্তি করেন না। অথচ পক্ষান্তরে সংস্কৃত ও ইংরেজীর ভক্তগণ আরবী অধ্যয়নে আপত্তি তো করেনই, এমনকি আরবীর সপক্ষেরও ভক্তদের বিরুদ্ধতা করিতে যাইয়া অনেক অশোভন উক্তি করিতেও দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করেন না। ইহাতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে আরবীর অনুসারী ও ভক্তদের অপেক্ষা সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার অনুসারী ও ভক্তরা অধিকতর গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধায় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে উদার হইতে পারেন নাই। প্রসঙ্গত ঃ (Louis Fischer) লুই ফিশারের নিম্ন লিখিত উক্তিটি সবিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য ঃ "The highest mark of culture is the ability to live in peace with persons who are different from ourselves, the alternatives are dullness and dictatorship." অর্থাৎ মার্জিত রুচির সর্বোচ্চ নিদর্শন হইতেছে বিরুদ্ধ মতের লোকের সহিত শান্তিতে বসবাস করিবার সক্ষমতা, ইহার বিপরীত আচরণ স্থূল বুদ্ধিতা ও স্বৈরাচার। সঙ্গতকারণেই পবিত্র কুরআনেও আদেশ করা হইয়াছে–"ধর্মের ব্যাপারে কাহারও উপরে জবরদস্তি করা নিষিদ্ধ" জানিবে। (সূরা-২, বাকারা, ১৩৯ আয়াত, আল কুরআন।)

তাইতো বাংলা ভাষার সহিত আরবী ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেও আমরা যেমন আরবী ভাষাকেই আমাদের মাতৃভাষা করিতে পারি না, তেমনি আমাদের বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী, ফার্সী বা অন্য কোন ভাষা হইতে কিছু গ্রহণ করিলেও

* প্রতি বছরই বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংযোজন করে ইংরেজীকে যখন সমৃদ্ধ করা হচ্ছে তখন আমরা গতানুতিকতার বাইরে একটু পা বাড়ালেই হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। এভাবে কোন ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে না। (বিশিষ্ট সাংবাদিক সানাউল্লাহ নুরী, পৃষ্ঠা-৫৪, সূচিত্রা, ১-১৫ই মার্চ, ১৯৮৯।)

www.pathagar.com

আমাদের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যমূলক জাত চিহ্নের অস্তিত্ব বিপন্ন করিতে পারে এমন কিছু গ্রহণ করিতেও পারি না। কেননা, একটা জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে প্রচলিত মাতৃভাষাতেই একটি জাতির বংশগতির পরিচয় নিহিত থাকে। তাই একটি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে প্রচলিত মাতৃভাষা লোপ পাইলে সেই জাতির বংশগতি অর্থাৎ আসল জাত-পরিচয়ও লোপ পায় এবং সেই জাতি তখন ভিন্ন কোনও জাতির ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া ভিন্ন কোনও জাতির দাসত্ব মানিয়া লইতেও বাধ্য না হইয়া পারে না।

বাংলাদেশে মুসলমান শাসনামলে মুসলমান সুলতানগণ উপরিউক্ত সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যখন দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে ইতরজনের ভাষা আখ্যায়িত করিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় তন্ময় থাকিতেন তখন মুসলমান সমাজে আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সুলতানগণই এতদ্দেশে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নুতন প্রাণের সঞ্চার করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত উন্নতি, অগ্রগতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির এক অভূতপূর্ব নবদিগন্তের সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরবর্তীকালে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসন ও মর্যাদা লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মুসলমান সুলতানদের উক্ত পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলমান শাসনামলের পূর্বে যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দাপটে তিলে তিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে একদিন হয়ত সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাইত। এ বিষয়ে মরহুম ডঃ এনামুল হক রচিত "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থের ভাষ্য বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য—

"গৌড়ে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৭ খৃঃ) অভ্যুত্থানে বঙ্গে তুর্কী আমলের আবসান হইল। ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাহার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগ সূচনা করিল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর পতন পর্যন্ত গৌড়িয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ু কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বাংলা সাহিত্য ও চারুকলার পরিপোষক আবওহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা

www.pathagar.com

যোগাইতে থাকে। বাস্তবিকই স্থানীয় লোকদের প্রতি মুসলমানদের ব্যবহার ও হাবভাব এতই উদার, সহনশীল ও সদাশয় ছিল যে, স্থানীয় হিন্দুদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক লোক মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে বহু স্থানীয় আচার ব্যবহার এবং কিংবদন্তী ও তাহাদের সহিত মুস্লিম সমাজে ঢুকিয়া পড়িল। (পৃষ্ঠা-৩১) ইহ-াদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ আমাদের নিকট বড় কথা নহে; ইতোমধ্যেই বাংলা ভাষা যে রাজদরবারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এই কথাই আমাদের নিকট সমধিক প্রয়োজনীয়। (পৃষ্ঠা-৩২)

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (সুলতান গিয়াসুদ্দীন) মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও মুসলিম বাংলার কবি শাহ মুহম্মদ সগীরকেও অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। নতুবা বিদ্যাপতির কাব্যে "প্রভু গ্যাস দেব সুলতান" এবং সগীরের লেখনীতে "মহা নরপতি গোছ পৃথিবীর সার" প্রভৃতি প্রশংসা কখনও স্ফুরিত হইত না। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রসিদ্ধি যতই স্বীকৃতি লাভ করুক না কেন, তাহার ফারসী মৈথিলী ও বাংলা সাহিত্যের কদরদানী তাহাকে চির অমরত্ব দান করিয়াছে। (পৃষ্ঠা-৩২-৩৩)

বাংলা রামায়ন-রচক কবি কৃত্তিবাস---গৌড়েশ্বর (জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ) তাহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া সম্মান করিলেন। শাসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১-১৪৪২ খৃঃ)-এর রাজত্ব কালে চণ্ডীদাসের ন্যায় খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে। (পৃষ্ঠা-৩৪)

১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ বৎসর ধরিয়া মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করিলেন। এবং দীর্ঘ কাব্য রচনায় মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর (শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ) তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। -----এই ইউসুফ শাহের অনুগ্রহে সিক্ত হইয়া মুসলমান কবি জৈনুদ্দীন 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

অতপর,----১৪২৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাদশাহ হই-লেন। বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃঃ)-এ...........এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

উদার দৃষ্টি ও সমুচ্চ আদর্শ-সমন্বিত যে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি তাহাতে হুসেন শাহ পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জন্মের দিক হইতে খাঁটি আরবী

www.pathagar.com

হইলেও স্থানীয় এক বাঙ্গালী পরিবারে তাহার বিবাহ হয়। ইহাতে তাহার সহিত বাংলার মূল অধিবাসীর এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহার পরিণাম বাংলার পক্ষে অতি ফলদায়ক হইয়াছিল। বরিশালের ফুলশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত...............১৪১৪ খৃষ্টাব্দে রচিত তাহার "মনসা-মঙ্গল" কাব্যের মুখবন্ধে হুসেন শাহের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

বাংলার 'ব্রজবুলি'—ভাষায় পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসেন শাহের সময়ে প্রবর্তিত হয়। (পৃষ্ঠা-৩৫–৩৬)............হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক কাহিনী "মনসা-মঙ্গল", বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান শাখা 'ব্রজবুলি' পদ, হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ "বাংলা মহাভারত" এবং বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প 'বিদ্যা সুন্দর' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইল।

এতদ্ব্যতীত, তাহার (হুসেন শাহের) রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে চৈতন্য দেবের (১৪৮৬–১৫৩৩ খৃঃ) আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক "গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের" প্রতিষ্ঠা। চৈতন্য দেব তাহার মাতৃভাষা বাংলায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত" প্রচার করায় বাংলা সাহিত্যের এক নূতন দিক খুলিয়া গেল। বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হইল। (পৃষ্ঠা-৩৭)

হুসেন শাহী বংশের আমলেই বাংলা সাহিত্যের ন্যায় বাংলা অক্ষরেরও অনুশীলনও এতই ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছিল যে, সংস্কৃত ভাষা বাংলা অক্ষরে লিখিত হইত। (পৃষ্ঠা–৩৯)

স্বাধীনতার যুগে, এমন কি তুর্কী আমলেও বাংলার মুসলমান যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন, তাহার প্রমাণ ব্যাপক। বাংলার তুর্কী আমল হইতে স্বাধীনতার শেষ যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে যত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা আগা গোড়াই আরবী। (পৃষ্ঠা-৪২–৪৩)

এই সময়ে (অর্থাৎ মুসলমান শাসনামলে) বাংলা সাহিত্য তাহাদের (অর্থাৎ মুসলমান সুলতানদের) পৃষ্টপোষকতা লাভ না করিলে বন ফুলের ন্যায় চক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত। (পৃষ্ঠা-৪৭)

শ্রী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উপরিউক্ত সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে—"রাজা ভিন্ন জাতি হইলেই পরাধীন বলা যায় না। পাঠান শাসনামলে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত, এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নতুন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি, এই সময়ে স্মার্থ তিলক রঘুনন্দন, এই সময়েই

www.pathagar.com

বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী, চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।"

তাই বলিতে হয়, অতীতে বাংলায় মুসলমান শাসন ও আরবী ভাষা বাংলা ভাষার ও বাঙ্গালীর মানসিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথে কোনও বাঁধা না হইয়া বরং বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর মানসকে অধিকতরভাবে উজ্জীবিত ও আলোকিত করিয়াছিল।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা মুসলমানদেরই উজ্জীবিত ভাষা

অতীতে এতদ্দেশে হিন্দু শাসনামল হইতে শুরু করিয়া মুসলমান শাসনামল পর্যন্ত এতদ্দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ যখন বাংলা ভাষাকে ইতরজনের ভাষা জ্ঞানে ইতর ভাষা আখ্যা দিয়া পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়া সংস্কৃত ভাষার চর্চায় তন্ময় থাকিতেন তখন একমাত্র মুসলমান সুলতানগণই সেই অবহেলিত বাংলা ভাষাকে একের পর এক সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া চিরতরে ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়া নবজীবন দান করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত উন্নতি, অগ্রগতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির এক নব দিগন্তের সূচনা করিয়াছিলেন। মুসলমান সুলতানদের এই প্রবল পৃষ্টপোষকতা সম্বন্ধে প্রয়াত সাহিত্যিক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—We are led to believe that when the powerful Moslem sovereigns of Bengal granted this recognition to the vernacular literature in the courts, Hndu Rajas naturally followed the suit.

The Brahmins could not ignore the influence of this high patronage; they were therefore, compelled to favour the language they hated much. অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস করিতেই হয় যে, বাংলার পরাক্রমশালী মোসলেম শাসকগণ যখন তাহাদের রাজ দরবারে স্বদেশীয় ভাষায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছিলেন তখন হিন্দু রাজাগণও স্বাভাবিকভাবেই তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এই বড় ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাব ব্রাহ্মণগণও অবহেলা করিতে পারেন নাই। সুতরাং যে ভাষাকে তাহারা এত ঘৃণা করিয়াছেন সেই স্বদেশীয় ভাষাকে তাহারা সমর্থন করিতে বাধ্য হন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রয়াত প্রমথ চৌধুরী তাইত কোনও দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ না রাখিয়া খোলাখুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায়ই বলিয়া দিয়াছেন —"Bengali literature was born in Mohamedan age." অর্থাৎ মুসলমান শাসনামলেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল।

সুতরাং মুসলমান শাসনামলে মুসলমান সুলতানগণ কর্তৃক বাংলাভাষার নিরবচ্ছিন্ন প্রবল পৃষ্টপোষকতার ফলে একদিকে যেমন প্রখ্যাত সাহিত্যিক

www.pathagar.com

প্রয়াত প্রমথ চৌধুরীর মতানুসারেও বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত ও বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল ; অপর দিকে ঠিক তেমনি আধুনিককালের বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আসিয়াও প্রথমে পাকিস্তান আমলে ও পরে স্বাধীন বাংলাদেশে একমাত্র মুসলমানগণই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য ১৯৪৮ হইতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম করিতে গিয়া বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া প্রাণ দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া চিরজীবি ও চিরস্থায়ী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়া বাংলা ভাষার উপরে মুসলমানদের চিরস্থায়ী দখলী স্বত্বও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মুসলমানকে বাদ দিয়া তাই বাংলা ভাষার কোনও কাজ চালাইবার অধিকার যেমন অন্য কাহারও নাই, তেমনি মুসলমান ও তার দখলীকৃত বাংলা ভাষার উপরে অন্য কোনও ভাষাকে প্রাধান্য দিয়া বাংলা ভাষার উপরে তাহার চির অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করিতে দিতে পারে না। বাংলা ভাষার সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য বিধায় বাংলা ভাষা মুসলমানদেরই উজ্জীবিত ভাষা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা অন্যায় হয় না। কেননা, মুসলমানরাই বাংলা ভাষার জন্য রক্তও দিয়াছে।

অপর দিকে,বাংলা ভাষা যেমন মুসলমানদের প্রাণের ভাষা ও মুখের ভাষা তেমনি আরবীও যেহেতু মুসলমানদের প্রাণের ধর্মীয় ভাষা সেহেতু এই দুইটি ভাষার যে কোন একটিকেও মুসলমানগণ বর্জন করিতে পারে না। আর ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থেও যেহেতু মুসলমানদিগকে বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেহেতু ইসলাম ধর্মীয় আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিলেও আরবী ভাষার বাহিরে বাংলা বা অন্য কোনও ভাষা অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান আহরণেও আরবী কোনও বাধা হইতে পারে না। "It has been recommended by the Quran that scholars should study the different languages as there are verses of God in different languages and in all colours of nations. "(Page-9, Human dignity in Islam, The Islamic Review, January, 1959. Vol. XLVII, NO.1.) কুরআনে ইহাও অনুমোদিত হইয়াছে যে মনীষীদের বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করা উচিত যেহেতু বিভিন্ন ভাষায় ও জাতি সমূহের সকল বর্ণের মধ্যে আল্লাহর আয়াত সমূহ রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ও নির্দেশ দান করিয়াছেন, "জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশেও যাও।" চীন তৎকালে সম্পূর্ণরূপেই ছিল একটি অমুসলমান দেশ; তৎসত্ত্বেও জ্ঞান অর্জনের জন্য অমুসলমান চীনদেশে যাইতে নির্দেশ দান করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জ্ঞান অর্জনকেও ধর্মেরই একটি বিশেষ অঙ্গও করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান

www.pathagar.com

শাসনামলে মুসলমান সুলতানগণ তাই ইসলাম ধর্মের উপরিউক্ত নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের ইসলাম ধর্মীয় উদারতা পরমত সহিষ্ণুতা ও সদাশয়তার কারণেই বাংলাদেশে তৎকালে আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে প্রচলিত স্বদেশীয় বাংলা ভাষায় অমুসলমান ধর্মগ্রন্থাদিও রচনা করিতে পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির এক নব দিগন্তের সূচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আরবী অধ্যয়ন করিলেও আরবী যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে কোন বাধা হইতে পারে না তাহা উপরে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং একটি (chart) ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হইয়াছে যে মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা হইতেই জগতের সকল ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই সূত্রেও বাংলা ভাষার সহিত আরবী ভাষারও যেহেতু সুগভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে সেহেতু আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাও অবশ্য কর্তব্য বুঝিতে হইবে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৪

বাংলার মূল আরবী

অর্থাৎ বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূল আরবী

বাংলা ভাষায় অনেক আরবী শব্দ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষায় অনেক আরবী শব্দের সাক্ষাৎ মিলে ইহা সকলে না জানিলেও আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আরব দেশ আরব জাতি ও আরবী ভাষার সহিত আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের এই বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষার যে কি এক সুগভীর রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা প্রদর্শনের ও প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও সত্যের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া থাকিলেও তৎসমুদয় সকলের গোচরীভূত করিবার জন্য তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এযাবৎকাল করা হয় নাই বলিয়াই বাংলার ও আরবের উক্ত রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতার কথা আমাদের কাহারও জানিবার সুযোগ হয় নাই। বাংলার ও আরবের উক্ত ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করা হইলে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতাম যে আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষা মূলত আরব দেশ, আরব জাতি ও আরবী ভাষার সহিত এক অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত রহিয়াছে। বাংলার ও আরবের এই ঘনিষ্ঠতার পরিচয়ের মাধ্যমেই মাত্র বাংলার ও বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতির সত্য পরিচয় যে কি হইতে পারে তাহা জানা যাইতে পারে, এমন সত্যের প্রতি বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটির মূলে যে আরবী শব্দ রহিয়াছে তাহাই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটি যে মূলত আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রথম সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় পানিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলির এক উল্লেখ হইতে। শ্রীপরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তাঁহার "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে পানিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি আর্যাবর্ত্তের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করিতে আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তের বাহিরে অবস্থিত যে 'কালক বন'-এর উল্লেখ করিয়াছেন সেই 'কালক বনই' বঙ্গ দেশ। এই কালক বন শব্দটির মধ্যে বন শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় ধরা পড়িলেও কালক শব্দের কোনও অর্থই বাংলা

www.pathagar.com

ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে উক্ত 'কালক' শব্দে কি বুঝিতে হইবে এবং উহার অর্থই বা কি হইতে পারে তাহার দিক নির্দেশ নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যে রহিয়াছে।

"Thousands of years ago, the inhabitands of India spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured in to various forms and gave rise to the hundreds of languages we now find in India. The founder of Arya Samaj movment.Swami Dayanand, has stated in his book, Satyarth Parkash, that Kurus and Pandwas discussed confidential matters in Arabic.The words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations, names of posts, exclamations of happiness, bedding and coverings, house, etc. are all in Arabic. The only difference are in most cases that if the words are read from right to left they sound Arabic and if they are read from left to right they sound Sanskrit."(Page-10, A. H. Vidyarthi, Arabic : The Mother of all languages; Sanskrit: Its incognito offspring,The Islamic Review, Vol XLVII No.1.January, 1959.)

অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারত বর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। আরবী ভাষাকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং উহা হইতে শত শত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, যাহা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই। আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে কুরু ও পাণ্ডবগণ তাহাদের গোপনীয় বিষয়সমূহ আরবী ভাষায় আলোচনা করিতেন। পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয় স্বজনের নাম সমূহ, পদ সমূহের নাম সমূহ, সুখের উল্লাস, বিছানা, চাদর, বাড়ী ইত্যাদি সকল কিছুই ছিল আরবী ভাষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল এই যে শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হইত তাহা হইলে আরবী ধ্বনি হইত আর তাহাই যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হইত তবে সংস্কৃত ধ্বনি হইত।

উপরে উদ্ধৃত এই ভাষ্যে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত পতঞ্জলির "কালক বন" কথাটির ধ্বনি মূল ও অর্থও তাই আরবী ভাষাতেই অনুসন্ধান যোগ্য। উক্ত 'কালক বন' কথাটির "কালক" শব্দটির সহিত আরবী "কানক" শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। আরবী কান্‌ক (কাংক) শব্দের অর্থ গঙ্গা নদী। আর বঙ্গ শব্দের মধ্যেও গঙ্গা শব্দের অস্তিত্ব রহিয়াছে

www.pathagar.com

বিধায় বঙ্গদেশ বুঝিতে গঙ্গা নদীকেও বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে বঙ্গদেশকে যে শুধুমাত্র গঙ্গা নামেও অভিহিত করা হইত তাহাও নিম্নের ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—Ganges : In these lines the author uses the name (Ganges) in three different ways for a region, for the river, and for a port on the river, (Page-235, The Periplus of the Erythraean sea—translation from original Greek language by Lionel casson, Princeton University press, New Jersey .U. S. A.)

শ্রী পরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত গ্রন্থে পতঞ্জলির উল্লেখিত 'কালক বন'কে বঙ্গদেশ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া বঙ্গদেশ যে প্রকৃতপক্ষেই গঙ্গা নদীরই দেশ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। গঙ্গাকে আরবীতে বলা হয় কাংক। কিন্তু ইংরেজীর মত আরবীতেও অনুস্বার বোধক ভিন্ন অক্ষর নাই বিধায় ইংরেজীর মত আরবীতেও "ন" অক্ষর যোগ করিয়া অনুস্বার বোধক শব্দ লিখিত হইয়া থাকে। যেমন বাংলায় লিখিলে যাহা হয় কাংক। আরবীতে লিখিলে তাহাই লিখিতে হয় কান্ক রূপে। সুতরাং পতঞ্জলির উল্লেখিত 'কালক বন' কথাটির কালক শব্দটি যে উক্ত আরবী কান্ক শব্দেরই বিকৃতি তাহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। আরবী কান্ক শব্দটির এই রূপ ব্যবহার এতদ্দেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও দৃষ্ট হয়। যেমন—আরবী, কান্ক সাত (অর্থাৎ গঙ্গার কিনারা)> কান সাত> কানসাট (রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম।) আরবী কান্ক সাত> কানকসাট> কনকসাট> কনক সার (মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরের একটি স্থানের নাম।) ইত্যাদি।

অতঃপর কালক বন কথাটির "কালক" শব্দের মূল ও অর্থ যেহেতু আরবীতেই ধরা পড়িতেছে সেহেতু 'বন' শব্দটির অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ মূল আরবী শব্দটিও অনুসন্ধানযোগ্য। অনাবাদী বন জঙ্গল ও মরুভূমির স্থানকে আরবীতে বলা হয় বাদিয়। তাই বাংলা ভাষায় যাহা বন আরবীতে তাহাই 'বাদিয়'। এতদ্দেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও এই আরবী বাদিয় শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—আরবী "বাদিয়"(অর্থাৎ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান)> বাদা; বাদিয়> বাদ্দা> বাডডা; বাদিয়> বাদিয়ার বাজার> বৈদ্যের রাজার ; বাদিয়> বাদিয়ার অঞ্চল> দিয়ার অঞ্চল (রাজশাহীতে) ইত্যাদি। সুতরাং পতঞ্জলির উল্লেখিত কালক বন শব্দটি যে মূলত আরবী "কান্ক বাদিয়" শব্দেরই বিকৃতি মাত্র তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়।

এতদ্ব্যতীত উল্লেখ্য যে আরবী ভাষা যেহেতু ডান দিক হইতে বামে পড়িতে ও লিখিতে হয় সেহেতু পতঞ্জলির উক্ত কালক বন অর্থাৎ উপরিউক্ত আরবী

www.pathagar.com

"কান্‌ক বাদিয়" কথাটিকেও আরবীর রীতিতে ডান দিক হইতে পড়িলে ও লিখিলে হয়—বাদিয় কান্‌ক (অর্থাৎ গঙ্গার অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান)।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চল ছিল এক অনাবাদী বন্ জঙ্গলময় স্থান। গঙ্গার 'অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান' কথাটির আরবী হইতেছে 'বাদিয়াতু কান্‌ক' (কাংক)।

(আরবী) বাদিয়াতু বা বাদিয় بادية = অর্থাৎ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান।
(আরবী) কান্‌ক (কাংক) كنك = অর্থাৎ গঙ্গা নদী।

উক্ত বাদিয়াতু বা বাদিয় কান্‌ক (কাংক) হইতেই হইয়াছে বান্‌ক (বাংক)। আর এই আরবী বানক (বাংক) হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বঙ্গদেশের "বঙ্গ" নাম শব্দটি। যেমন—বাদিয়াতু কান্‌ক (কাংক) বাদিয় কান্‌ক (কাংক> বান্‌ক (বাংক)> বন্‌ক (বংক)> বন্‌গ (বংগ)>বঙ্গ।

উল্লেখ্য যে "প্রাকৃত উচ্চারণ মতে দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত ক, গ, চ, ত, দ, প, য়, লোপ পায়।" (পৃষ্ঠা-৯ বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।)। সঙ্গত কারণেই বাদিয়াতু কান্‌ক (বাংক) কথাটির "বা" ও "কা" শব্দ দুইটির দুই "া" (আ) স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য়, ত, ক, বর্ণ চারটি লোপ পাইয়া উপরে উল্লেখিত বান্‌ক (বাংক) শব্দটির রূপ লাভ করিয়াছে।

এই বান্‌ক (বাংক) শব্দটির অস্তিত্ব বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া নাম শব্দেও ধরিতে পারা যায়। যেমন—বাদিয় কান্‌ক>বানক (বাংক)+উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার "উড়" বন্দরের নামানুসারে "উড়া") = বান্‌কুড়া (বাংকুড়া)> বাঁকুড়া। বাঁকুড়া লিখিতে "বাঁ" শব্দটির উপরে যে চন্দ্রবিন্দু রহিয়াছে তাহাই নির্দেশ করে যে শব্দটি মূলত বান্‌কুড়া বলিয়াই শব্দটির "ন" বর্ণ বর্জন করিয়া "বাঁ"-র উপরে "ন" প্রতিপাদক চন্দ্রবিন্দু দিয়াই বাঁকুড়া শব্দটি লিখিত হইয়া থাকে।

আর উক্ত বান্‌ক (বাংক) শব্দ যে বন্‌ক (বংক>বঁক) হইয়া> বংগ (বঙ্গ) শব্দের রূপ লাভ করিয়াছে তাহার অস্তিত্বও বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বগুড়া নাম শব্দেও ধরা পড়ে। যেমন—বাদিয় বনক> বানক (বাংক)> বনক (বংক)+উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার "উড়" বন্দরের নামানুসারে "উড়া")=বন্‌গ (বংগ)+উড়া> বনগুড়া> বঁগুড়া> বগুড়া। এতদ্ব্যতীত উক্ত বন্‌ক (বংক) শব্দের অস্তিত্ব ও বাংলাদেশের যশোহরের বক (বনক> বঁক) চর নামক একটি স্থানের নামেও ধরা পড়ে। "গাঙ্গেয় বদ্বীপের আর এক নাম

www.pathagar.com

ছিলো বক দ্বীপ। বক দ্বীপের অপভ্রংশ বকচর। মুড়লীর (অর্থাৎ যশোহরের) পাশেই আজো বকচর নাম নিয়ে টিকে আছে একটি ছোট জনপদ।"(পৃষ্ঠা-৪৬ সাপ্তাহিক 'রোববার', ১২ জুন, ১৯৮৮, ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫, ঢাকা, যশোহর নামের ইতিহাস , আমিরুল আলম খান)।

সুতরাং উপরিউক্ত আরবী বাদিয় কানক শব্দ হইতেই বান্‌ক> বন্‌ক> বন্‌গ> বংগ (বঙ্গ) নামটি যেমন উদ্ভূত হইয়াছে তেমনি ইহার মধ্যে গঙ্গা নদীর নাম ও স্থানীয় ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থাও বিবৃত হইয়াছে বিধায় বঙ্গদেশের বঙ্গ নাম শব্দটি যে মূলত আরবী ইহতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্দ্বিধায় নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায়। উক্ত বান্‌ক (বাংক) শব্দটি R.C. Mozumdar সম্পাদিত, History of Bengal, Vol. 1. এর ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত VANKA শব্দেও দৃষ্ট হয়। "The Vanga (Vanka of Mahaniddesa, 1, 54) may not refer to the famous Janapada in Bengal, but to Bangka near Sumatra."

তবে ইহাতে Vanga (Vanka) শব্দটিকে আমাদের এই বঙ্গদেশের নাম শব্দ রূপে বিবেচনা না করিয়া ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার স্থানীয় একটি ভিন্ন নাম বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সঠিক হয় নাই। কেননা, থাইল্যাণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব ৭ম শতকে অর্থাৎ ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গদেশ হইতে থাইল্যাণ্ডের আনাম-এ গমন করিয়া সেখানের রাজাকে পরাজিত করিয়া সেদেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাহার নিজের দেশ বঙ্গদেশ-এর নাম অনুসারে তাঁহার সেই রাজ্যের নামও যেমন রাখিয়াছিলেন বঙলঙ্ অর্থাৎ বঙ্গ বা বাঙ্গলা। তেমনি কোনও বঙ্গবীর বঙ্গদেশ হইতে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় গমন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেখানে একটি স্থানের নামও নিজের বঙ্গদেশ-এর নামানুসারেই রাখিয়াছিলেন Bangka (বন্‌ক>বঙ্গ), ইহা সহজেই ধারণা করা যায়। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার উক্ত Bangka (বন্‌ক> বঙ্গ) নাম শব্দটি যে প্রকৃত পক্ষেই আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ-এরই বঙ্গ নাম শব্দ তাহা নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায়। এমনকি থাইল্যাণ্ডের বর্তমান রাজধানী 'ব্যাংকক' নাম শব্দটিও বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম শব্দ বংক বা বাংক হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াও উপরে বর্ণিত সঙ্গত কারণেই ধারণা করিতে পারা যায়।

আরও উল্লেখ্য যে, Dr. J. P. Wade আসামের মূল ইতিহাসের কথায় প্রাচীনকালে আসামে প্রচলিত বাখা (Bakha) নামক যে বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই বাখা (Bakha) শব্দটির সহিত উপরে বর্ণিত বান্‌ক

www.pathagar.com

(বাংক, বংক) শব্দটির ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বিধায় আসামের উক্ত 'বাখা' (Bakha) শব্দটিও উপরিউক্ত বান্‌ক শব্দ হইত উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা যায়। যেমন—বান্‌ক> বান্‌কা> বাঁকা> বাখা (Bakha)।

"The original history of Assam exists in two distinct languages. The first is termed the "Bailoongh" or "Ahum" being the language of the race of swurgeedeo, the conquerors of Assam. The other is termed the "Bakha" being a dialect of the Bengalees. "(Page-1. An Account of Assam. Dr. J. P. Wade)

এই সত্য হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, বর্তমানে আসামে আসামী বাংলা নামে যে বাংলা ভাষার প্রচলন রহিয়াছে তাহাও মূলতঃ আমাদের পূর্ব বাংলারই ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর উপরে বর্ণিত বঙ্গ শব্দটির মত বাঙ্গালা নাম শব্দটিও যে মূলতঃ কেমন করিয়া আরবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এতদস্থলে আলোচিত হইতেছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তি স্থলের ভূমি ছিল এক জঙ্গলপূর্ণ অনাবাদী স্থান। গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তি স্থলের অনাবাদী ভূমির আরবী হইতেছে, বাদিয়াতুল কান্‌কেল্ আলিয়াহ্ (بادية كنكا العاليه) এই বাদিয়াতু কান্‌কেল আলিয়াহ হইতেই হইয়াছে বানকালিয়াহ। আবদুর রউফ (অহীদ) রচিত তাওয়ারিখে বাংগালা শিরোনামের একটি গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায়ও এই বাংকালিয়াহ (বাংকালিয়া) শব্দটির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বাদিয়া কান্‌ক আলিয়াহ্ (বাংকালিয়াহ্) হইতেই বান্‌গালা (বাঙ্গালা) নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন—

বাদিয়াতু (আরবী) (بادية)—অর্থাৎ অনাবাদী বনজঙ্গল পূর্ণ স্থান।

কানক (আরবী) (كنك)—অর্থাৎ গঙ্গানদী।

আলিয়াহ্ (আরবী) (عاليه)—অর্থাৎ নদীর উজান স্রোতের ধারা

গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তি স্থলের অনাবাদী ভূমির আরবী হইতেছে, বাদিয়াতু কানকেল্ আলিয়াহ্। ইহা হইতেই হইয়াছে, যেমন—বাদিয়াতু কানকেল্ আলিয়াহ্> বাদিয়া কানক আলিয়াহ্> (উপরে উল্লেখিত দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য়, ক লোক পাইয়া)> বান্‌ক+আলিয়াহ (উজান স্রোতধারা)> বান্‌কালিয়াহ>বান্‌কাল্যাহ্> বান্‌কালা (বাংকালা> বাঁকালা)> বান্‌গালা> বাংগালা) বাঙ্গালা> বাংলা।

www.pathagar.com

আর আলিয়াহ্‌র (অর্থাৎ উজান স্রোতধারার) বঙ্গ-ই যে বাংকালা (বাঁকালা) বাঙ্গালা> তাহা নিম্নে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গ্রাম্য গানের দৃষ্টান্ত হইতেও বোধগম্য হইবে। যথা–

পদ্মা মেঘনার ভাটির লগে
সাইগরেতে যাই,
বাঁকালা আলের বঙ্গ, (আমরা)
গুন টানি হাল বাই।
ক্ষেতের ধানে মন না টানে
বাইন্যা হইবার চাই,
সেইনা চাইয়া নাও ভাসাইয়া
উজান ও ভাইটাই।
জাহাজ বানাই ভাটিতে যাই
ক্ষেতে বান্ধি চাল
বাদ কাইটা বসত আইটা (বসত কইরা)
মারিরে গয়াল।
আরে—হাতি বান্ধে পাঅরে বান্ধে
বান্ধেরে জাঙ্গাল,
গাঙ্গের পাড়ে হাঙর মারে
বাঘাইয়া বাঙ্গাল।। (সংগ্রহ)

উক্ত গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে যে বলা হইয়াছে "বাঁকালা আলের বঙ্গ" তাহাতেই ধরা পড়ে "আলের বঙ্গ" অর্থাৎ (আরবী) আলিয়ার বঙ্গই বাকালা অর্থাৎ বাঁকালা > বানকালা> বানগালা (বাঙ্গালা)> বাংলা। (আরবী) আলিয়াহ্‌র অর্থাৎ উজান স্রোতের উৎপত্তির স্থলবর্তী নিম্নবঙ্গই বান্‌কালা (বাঁকালা)> বাঙ্গালা দেশ। সাগর সংলগ্ন বরিশালের "বাকালা" নামে একটি স্থানের নাম শব্দেও উক্ত বানকালা> বাঁকালা শব্দটির বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ মিলে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা শব্দটি যে প্রচীনকালে বান্‌কালা (বাংকালা) রূপেই ব্যবহৃত হইত নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাষ্যেও তাহার পরিপূরক প্রমাণ মিলে—

"১৮৯০ খৃষ্টাব্দের Gournal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, ঘোড়াঘাট, গৌড়, বাঙ্গালা নামগুলি লেখা হয়েছে যথাক্রমে 'কোড়াকাত', কৌড় এবং বাঙ্কালা (বান্‌কালা) রূপে।" [বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮–১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ), ২য় খণ্ড, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়,. এম. এ অধ্যাপক, বিশ্ব ভারতী, পৃষ্ঠা-৩ ।]।

www.pathagar.com

Gournal Asiatique, Febrier—Mars, 1890, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে No. 050—JOA, Series—৪, নম্বরে অনুসন্ধানযোগ্য।

উক্ত বানকালা (বাংকালা) ও বাঙ্গালা শব্দ আবার বিভিন্নকালে বিভিন্ন বিকৃত রূপও লাভ করিয়াছে। নিম্ন বর্ণিত ভূ-চিত্র (Map) সমূহেও এই বিকৃত রূপ পরিলক্ষিত হইবে।

১. Map of Gerard Mercator (1612)-Bacola (<Bancola) Bicanapur,Bicanpor,Bacala,(<Bancala)>Bacalaur>Bacanaur> Bicanapur> Bicanpur>Bikrampur.

২. Map reproduced by Bernier—original Map, Paris Edition (1670)—Bacola, Bengala, Bengola.

৩. Map of Mogulistan or Indostan by H. Moll (1709) Bengola, Bengall.

৪. Map of Bengal (1770) by Thos Kitchin, courtesy British Museum—Bacala (<Bancala), Bengulla.

মৌলিক আরবী নাম শব্দ যে কিরূপে ও কত প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে উপরের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই এবং সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়িতেছে। বিশিষ্ট ভাষা তত্ত্ববিধ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উক্ত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—"But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a sanskrit look,----- In the formation of these we find some words which are distinctively Dravadian. An investigation of place-names of Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speaker, mostly Dravadian, all over the land before the establishment of the Aryan tongue." (Origin and development of Bengali language.)

অনুরূপভাবে শ্রী ভূদেব চৌধুরীও তাহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—"ভাষা তত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, আর্যভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা----কতকটা 'দ্রাবিড় ভাষা বলিত।' (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।)। কিন্তু সে সকল আর্যেতর ভাষার উল্লেখ্য কোনো পরিচয় আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র কয়েকটি প্রাচীন স্থান ও বস্তুর নামে বাঙালীর সেই প্রাচীনতম ভাষার ঐতিহ্য অল্প বিস্তর সন্ধান পাওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা-১১, দ্বিতীয় অধ্যায়, ইতিহাসের সন্ধানে তৃতীয় সংস্করণ)।

www.pathagar.com

উপরের উদ্ধৃত ভাষ্যে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে ভাষাকে ও যাহাদিগকে দ্রাবিড় নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন সে ভাষা যে প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা ও সে দ্রাবিড় জাতি যে সেমিটিক আরব জাতিরই একটি ভিন্ন শাখা তাঁহা নিম্নে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখিত উপরিউক্ত দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড় জাতির মূল যে সেমিটিক তাহা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষা ও অক্ষরের ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায়। তামিল ভাষার এমন কি অক্ষরের মূলও যে সেমিটিক (Semitic) তাহা ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ ও The Indian History congress কর্তৃক প্রকাশিত এবং K. A. Nila Kantha Shastri কর্তৃক সম্পাদিত "Comprehensive History of India, Vol II (325 B. C.— A. D. 300) গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭১ পৃষ্ঠায় Frederick Bodomer কৃত Loan of Languages" গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিয়াও বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই উক্ত তামিল ভাষার অক্ষর সেমিটিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বাংলা ভাষার অক্ষরও সেমিটিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে

উল্লেখ্য যে নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান তাহার 'বাংলা সাহিত্যের নুতন ইতিহাস' গ্রন্থে অনেক শব্দ সম্পদের উদাহরণ দিয়া প্রদর্শন ও প্রমাণ করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার যত ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তেমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সত্য হইতে অপর একটি সত্যও প্রকারান্তরে ধরা পড়ে যে তামিল ভাষা ও অক্ষর যেহেতু মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আর বাংলা ভাষা ও অক্ষরও যেহেতু মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে সেহেতু তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার উপরিউক্ত ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারিয়াছে। ইহা হইতে তামিল ভাষা ও অক্ষরের মত বাংলা ভাষার অক্ষরও যে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই বা পূর্বেই মূল সেমিটিক আরবী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহাও ধারণা করা যায়।

আর একই মূল সেমিটিক আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও এবং তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও তামিল ভাষা ও বাংলা ভাষা যে দুইটি আলাদা ভাষা হইয়াছে, তামিলের মত একই দ্রাবিড় ভাষা হইতে পারে নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে স্পষ্ট হইবে।

www.pathagar.com

"বেদ সংহিতায় তাহারাই (অর্থাৎ বাঙ্গালীরাই) দস্যু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাদের (অর্থাৎ বাঙ্গালীদের) ও দ্রাবিড় ভাষীদের ভাষা এরূপ দূর সম্বন্ধ যে ঐ উভয় জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াও একত্র সংসৃষ্ট ছিল এমন বোধ হয় না, তবে ঐ উভয়ে আর্যবংশীয় নহে, কোন তুরানি (অর্থাৎ আরব) বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইমাত্র বলিতে পারা যায়। (পৃষ্ঠা-৪৯, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ +৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)। দ্রাবিড় বলিতে যেমন সেমিটিক জাতিকেই বুঝিতে হইবে তেমনি সেমিটিক বলিতে আরব জাতিকে ও আরবী ভাষাকেই যে বুঝিতে হইবে তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক Philip K. Hitti-র নিম্নবর্ণিত ভাষ্য হইতেও স্পষ্ট হইবে।

Arabia was the cradle land of the Semitic race. Where was the original home of this people ? Different hypothesis have been worked out by various scholars : There are those who considering the broad ethnic relationship between Semites and Hemites hold that Eastern Africa was the original home. Others influenced by Old Testament traditions, maintain that Mesopotamia provided the first abode; but arguments, in favour of the Arabian peninsula considered in their comulative effect seem most plausible." (Page-19 History of the Arabs.)

আরবের বাহরাইন, দাহরান ও কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে দিলমুন, তিলমুন, দিলমান নামে আখ্যায়িত দ্রাবিড় জাতির ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বকালের যে সমুদয় প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও দ্রাবিড় সেমিটিক জাতি যে প্রকৃতপক্ষে আরব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি আরবী ভাষী গোষ্ঠী তাহা বলাই বাহুল্য। আর আরবের উক্ত দিলমুন, তিলমুন ও দিলমান নামে আখ্যায়িত জাতিই এতদ্দেশে কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর ভাষায় দামিল, দাক্ষিণাত্যের ভাষায় তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। সুতরাং ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন, "In the formation of these (words) we find some words which are destinctively Dravadian. An investigation of place names of Bengal......... is sure to reveal the presence of Non-Aryan speaker, mostly Dravadian, all over the land ------" তাহাতে দ্রাবিড় বলিতে আরব জাতি ও আরবী ভাষার কথাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

www.pathagar.com

উপরন্তু ইতঃপূর্বে যে উল্লেখিত হইয়াছে "Thousands of years ago, the inhabitants of India spoke and understood Arabic---the words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations---etc .are all in Arabic. অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের লোকেরা আরবী ভাষা বলিত ও বুঝিত।..........পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয়দের নাম-----ইত্যাদির সকল শব্দই ছিল আরবী। এমতাবস্থায়, এতদ্দেশের বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটিও যে আরবী হইতেই মূলতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না।

সে যাহা হউক বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির উপরে উল্লেখিত ধ্বনি মূল ও অর্থ হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ে যে, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির মধ্যে গঙ্গা নদীর এই বদ্বীপ অঞ্চলের গঙ্গা নদীর "গঙ্গা" নাম শব্দটি যেমন বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি গঙ্গা নদীর বদ্বীপের একটি অংশে উচ্চ ভূমির উর্ধভাগ এবং অপর একটি অংশে নিম্নভূমির নিম্নভাগও রহিয়াছে বিধায় বঙ্গ ও বাঙ্গালা শব্দ দুইটি দ্বারা একটি দেশের দুই প্রকার স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাও বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গ শব্দ দ্বারা বঙ্গদেশের উচ্চ ভূমির ও বাঙ্গালা শব্দের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের নিম্নাঞ্চলের ভূমির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের তথা বাঙ্গালা দেশের এই দুই প্রকার স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামে একই দেশের দুইটি নাম শব্দেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাই একই দেশের দুইটি নাম শব্দ একই অর্থ প্রকাশ না করিয়া দুইটি পৃথক অর্থই প্রকাশ করিতেছে। "But Bang and Bangala are mentioned separately in several inscriptions of South India and Tariq-E-Ferojshahi of Sahams-i-Siraj Afif ---" (page-19, History of Bengal, Vol. 1, Hindu Period, R. C. Mazumdar.) অতএব বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটিকে কোন অর্থহীন নিরর্থক শব্দ বিবেচনা না করিয়া বরং বঙ্গ ও বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার পরিচয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ শব্দরূপেই গণ্য করিতে হইবে। আর ইহা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইবে যে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি প্রকৃতপক্ষেই আরবী শব্দ হইতে উদ্ভূত এতদ্দেশের অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দুইটি নাম শব্দ যাহা ইতঃপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।

বঙ্গ ও বাঙ্গালা শব্দের মত আরও অনেক বাংলা শব্দ মূলতঃ আরবী হইতে উদ্ভূত হওয়ার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি নদী

www.pathagar.com

বহুল দেশই নহে, নদীর সহিত সংযুক্ত সাগর পাড়ের দেশও বিধায় বহির্বিশ্বের সহিত বাংলাদেশের যোগাযোগের রহিয়াছে বিস্তৃত সামুদ্রিক জল পথ। আর বর্তমানের মত সুগম স্থলপথ অতীতে ছিল না বলিয়া সামুদ্রিক জল পথই ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ও যাতায়াতের একমাত্র স্বাভাবিক ও সহজ পথ। অতীতের সেই সামুদ্রিক জল পথে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত আরব শেখদের (Gulf Sheikhs) এক চুক্তির ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের অধিকার না হারাইবার পূর্বপর্যন্ত অতি প্রাচীন কাল হইতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরবদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব নাবিক ও বণিকগণ যেমন সামুদ্রিক জল-পথে পৃথিবীর সর্বত্রই গমন করিয়াছে তেমনি সুবিধাজনক স্থান সমূহে উপনিবেশ এমন কি স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়াছে। ফলে সামুদ্রিক জল পথেই আরব বণিক ও নাবিকগণ অতি প্রাচীনকালে অনাবাদী প্রাচীন বাংলাদেশে আগমন করিয়াও উপনিবেশ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়, যাহা এই পুস্তকে বিস্তারিতভাবেই বিবৃত করা হইয়াছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা সৃষ্টির মুলেও তাই উক্ত আরব বণিক ও নাবিকদের মুখে প্রচলিত আরবী ভাষাই সক্রিয় ছিল বুঝিতে পারা যায়। নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্যেও এ সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে। "Arabian language was understood and spoken in almost every sea port of any note." (Page-120, Ancient India, Robertson) অর্থাৎ প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দরেই আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলার নাম শব্দ দুইটি ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের এবং পার্শ্ববর্তী দেশ আসাম, নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত প্রভৃতির নাম শব্দও আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইতে পারিয়াছে বুঝিতে পারা যায়, যাহা নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। যেমন—

১. ঢাকা—

(ক) "-------in the 4th century B. C. when Guptas ruled this country, Dhaka was known as "DEVAKA" (Page-101, Glimpses of old Dhaka, S. M. Taifoor)

(খ) "পূর্ব বাংলাকে (মগ-ফিরিঙ্গিদের লুটপাটের) মহাবিপদ থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি (সুবাদার ইসলাম খাঁ) উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যভাগে রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করেন। তার দফতর এবং উজির আমলাদের নিয়ে রাজমহল পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলার পথে যাত্রা করলেন।---তিনি রাজধানী করার পক্ষে অনুকূল একটি স্থানের সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে চলতে শুরু করলেন। এখন যেখানে ঢাকা

www.pathagar.com

নগরী অবস্থিত তার বিপরীত দিকে এসে তিনি থেমে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন স্থানটি দেখে।---তিনি সাথে সাথেই এখানে রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।" (Romance of an Eastern Capital, F. B. Bradely Burt, বঙ্গানুবাদ প্রাচ্যের রহস্য নগরী, রহিমুদ্দিন সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা-৮০-৮১)। এখানকার ঢাকা নগরীর বিপরীত দিকে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে যে স্থানটির কথা উপরের উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে সে স্থানটি যে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে অবস্থিত বিক্রমপুরের বর্তমান বেতকা তাহা বেতকা নাম শব্দটির সহিত বর্তমানের ঢাকা নাম শব্দটির ধ্বনিগত, অর্থগত ও ঐতিহাসিক ঐক্য সূত্রেও ধরা পড়ে। যেমন মূল (আরবী) বাদিয় কান্‌ক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর অনাবাদী ভূমি)> বাদ্যার্কা> বাদকা> বেতকা (প্রকৃত উচ্চারণে) বাদাকা> দাবাকা [........."imtial guttarals of the two words being interchangeable---" (Page-276, Journal of the Asiatic society of Bengal, Part-1, Nos, III-IV, 1890]> দবাকা (DEVAKA)> দ্বাকা> দাকা> ডাকা> ঢাকা।

আদি বা মূল ঢাকা কোথায় ?

উল্লেখ্য যে ঢাকা, দবাকা, বাদাকা, বাদকা বা বেতকা নামেও ঢাকা শহরে বা ঢাকার সন্নিকটে আর কোনও স্থানের নাম যেহেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেহেতু উক্ত বেতকাই যে আদি বা মূল ঢাকা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাহার ভারত সন্ধানে নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতের দিল্লী নামটি পূর্বেকার ৭টি স্থান পরিবর্তন করিয়া বর্তমান স্থানে আসিয়াছে। একই প্রকারে মূল ঢাকার আদি স্থান বেতকার স্থান পরিবর্তন করিয়া বর্তমান স্থানে ঢাকা শহরের নুতন করিয়া পত্তন হইলেও সেই আদি বা মূল নামই বহাল রহিয়াছে। সঙ্গত কারণেই বর্তমান ঢাকায় বা ইহার সন্নিকটে বেতকা, বাদাকা, দবাকা, দ্বাকা, ডাকা বা ঢাকা নামে কোন স্থানের পরিচয় মিলে না। এই সত্য ইতঃপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।

২. সোনার গাঁ ও সোনার বাংলা—

(ক) "It may be that Sonargaon itself was regarded as a part of the Vikrampura bhaga in those days" (Page-33, The history of Bengal, Vol. 1. R. C. Mozumdar.)

(খ) Originally Sonargaon was a part of the Buddhist kingdom of Bikrampur. For about a century before muslim conquest it became an independent kingdom under another line of Buddhist kings repesented by Pals, Chandras and

www.pathagar.com

Devas dynasties ---Many iconographical articles and other finds of Bunddist times have been discovered from Sonargaon." (Page-XIV, Glimpses of Old Dhaka, S. M. Taifoor.)

সোনার বাংলা নামের কারণ

অতীতে বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বাংলার নাম হইয়াছিল বিক্রমপুর বাংলা। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত)। সেই বিক্রমপুর বাংলাই পরে সোনার বাংলা নাম পায়। কারণ উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতির ভাষ্যে বিক্রমপুরের যে সোনার গাঁ-র কথা উল্লেখিত হইয়াছে বিক্রমপুরের সেই সোনার গাঁকে কেন্দ্র করিয়াই আবার এক সময়ে বাংলার সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরের সেই সোনার গাঁ-র অবস্থান যে বিক্রমপুরের বর্তমান সোনারং গ্রামেই ছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত আলোচনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

(গ) মহারাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) বিক্রমপুরের সোনা রং গ্রামে বিক্রমশীলা মহাবৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাহার নিদর্শন আজ পর্যন্তও সেখানে অর্ধমাইল ব্যাপী ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেই বিক্রমশীলারই প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন পরবর্তী কালে জ্ঞানতাপস শ্রী জ্ঞান অতীশ দীপংকর (১০৪২খৃঃ)। উক্ত বিহারকে কেন্দ্র করিয়া আরও ৩৯টি বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম বা দেউলও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি। সেই সমস্ত কেন্দ্রে বৌদ্ধ মূর্তি সরবরাহ করিবার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণের একটি কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছিল সোনারং গ্রামের প্রধান বৌদ্ধ বিহারে। তাই সোনারং গ্রামে তো বটেই, এমন কি অতীশ দীপংকরের জন্মভূমি বজ্রযোগিনী, আউটশাহী, বালিগাঁও, আবিরপাড়া, বেজগাঁও প্রভৃতি গ্রামে খনন কার্যের দ্বারা অনুসন্ধান চালাইলে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আদি বা মূল সোনার গাঁ কোথায় ?

সুতরাং বিক্রমপুরের বর্তমানে সোনারং গ্রামই যে অতীতের আদি বা মূল সোনার গাঁ তাহাতে আর সন্দেহ কি। ইহা ছাড়া সোনার গাঁ নাম শব্দটির ধ্বনিগত বিশ্লেষণেও এই সত্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। যেমন—(আরবীতে) শাতিল কাংক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর কিনারা)>সাতুল কাংক> সালুত কাংক> সানুট কাংক (এই সানুট কাংক শব্দটিকেই ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সানকট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।)>সানুর কাংক> সানুর গান্‌গ (গাঙ্গ)> সোনার গান্‌গ (গাঙ্গ)> সোনার গাঁ (গাঁ শব্দের

www.pathagar.com

উপরের চন্দ্রবিন্দুই নির্দেশ করে যে সোনার গাঁ শব্দটির গাঁ শব্দটির পরে ন বা অনুস্বার ছিল বলিয়াই গাঁ শব্দটির উপরে (ঁ) চন্দ্রবিন্দু দিতে হইয়াছে। সুতরাং সোনার গান্গ (গাংগ) শব্দ ইহতেই যে সোনার গাঁ শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত একই সোনার গান্গ (গাংগ) শব্দটি হইতে সোনারং শব্দটিও গঠিত হইয়াছে। যেমন—সোনার গান্গ (গাংগ)> সোনার গাং> সোনা রাং (প্রাকৃত উচ্চারণে "গ" শব্দটি লোপ পাইয়া)> সোনারং। সঙ্গত কারণে নিঃসন্দেহে ও সুনিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায় বিক্রমপুরের বর্তমান সোনারং গ্রামই প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ-াসিক আদি বা মূল সোনার গাঁ। এই সোনারং গ্রামেই বিক্রমশীলা মহাবৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধদের অন্যান্য নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যাহা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব আদি বা মূল সোনার গাঁ এর পরিচয় যে একমাত্র বিক্রমপুরের সোনা রং গ্রামেই রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। পানাম ও মোগরাপাড়া গ্রামে বর্তমানে যে সোনার গাঁ রহিয়াছে উহার ধারে কাছে কোথাও সোনার গাঁ নাম শব্দের চিহ্ন মাত্রও নাই। তবে অতীতে যেখানেই রাজকর্ম পরিচালনা করা হইত উহাকেই সোনার গাঁ নামে অভিহিত করা হইত বলিয়া উক্ত পানাম ও মোগরাপাড়াও কোনও এককালে রাজধানীর কার্যস্থল বিবেচনায় সোনার গাঁ নাম পায় বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক ব্রাডলি বার্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে অতীতে সোনার গাঁ-এর পরিধি ৭০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সেই ৭০ মাইলের মধ্যে যে কোনও স্থানকেই যে সোনার গাঁ নামে অভিহিত করা যাইত তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত পানাম ও মোগরাপাড়াও এই রূপেই সোনার গাঁ নাম পায়।

৩. চিটাগাং (চট্টগ্রাম)—

(আরবী) শাতিল কাংক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর কিনারা)> সাতিল গাংগ> চাটিল গাং> চাটি গাং (চাটি গাঁ, চাট গাঁ,)> চিটাগং (ইংরেজীতে)। বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে ডঃ এম, এ, রহিম তাহার 'সোস্যাল এণ্ড কালচারাল হিষ্টরি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাই আরবের শাতিল আরবের অনুকরণে শাতিল গাংগ নামটিও আরবদেরই দেওয়া বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়।

৪. আরাকান—

(আরবী) ইরাক হইতে> (আরবী বহুবচনে) ইরাকিন (অর্থাৎ ইরাকীদের)> ইরাকান> এরাকান> আরাকান।

www.pathagar.com

"ইরাককন হইতে আরাকান নামের উৎপত্তি।" (বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-৪৩২, নব্য ভারত কার্তিক, ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা)। নিম্ন বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনায়ও এই সত্যের নিদর্শন মিলে। ৭৮৮–৮১০ খৃষ্টাব্দ কালমধ্যে আরব বণিকদের একটি জাহাজ বর্তমান রামরী দ্বীপের নিকট ডুবিয়া যায় এবং আরোহী মুসলমানগণ প্রাণে রক্ষা পাইয়া আরাকানে বসতি স্থাপন করে বলিয়া ডঃ আবদুল করিম তাহার 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুসলমানগণ হয়ত আরবের ইরা-করই অধিবাসী ছিল। অথবা ইসলাম পূর্ব কালেও ইরাকীদের বসতি আরাকানে ছিল। তাই তাহারা ইরাকের নামানুসারেই আরবী ভাষায় ইরাকিন (অর্থাৎ ইরাকীদের) নামকরণ করিয়াছিল। আর উহা হইতেই আরাকান নাম হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়।

৫. আসাম—

প্রাচীনকালে সিরিয়ার আর এক নাম ছিল 'আল সাম' [Syria-(Siam) Arabic—EL SHAM, (Page-1274, Funk and Wagnal's new International Dictionary of English language.]। এই আলসাম হইতেই হইয়াছে আসাম। যেমন—আলসাম>আসসাম (Assam)> আসাম। যেমন, আবদুল সালাম হইয়া থাকে আবদুস সালাম। অর্থাৎ আরবী ভাষার রীতিতে স-এর পূর্ববর্তী ল বর্ণ লোপ পাইয়া যেমন ল-এর পরবর্তী স-এর দ্বিত্ব হয়, ঠিক তেমনি আলসাম শব্দের ল বর্ণ লোপ পাইয়া ল এর পরবর্তী স-এর দ্বিত্ব হইয়া আলসাম শব্দটি হইয়াছে আসসাম (Assam)> আসাম। ইংরেজীতে Assam শব্দটি লিখিতে যে দুইটি ss ব্যবহৃত হয় উহাতেও এই সত্য ধরা পড়ে।

প্রাচীনকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে সিরিয়ার আরবী ভাষী বণিক ও নাবিকগণ বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর পথে আসাম ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমনাগমন করিত। তখন চীনদেশের পীত নদীর (বর্তমান হোয়াং হো নদীর) সহিত ব্রহ্মপুত্র নদীর সংযোগ ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক টয়েনবিও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সিরিয়ার উক্ত বণিক ও নাবিকগণই সিরিয়ার সেই প্রাচীন নাম আলসাম নামেই এতদ্দেশেও আলসাম> আসসাম> আসাম নামকরণ করিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

৬. নেপাল—

নেবাল نـبـل (আরবী শব্দ অর্থ টিলা)। নেবাল হইতেই হইয়াছে> নেপাল।

www.pathagar.com

৭. ভুটান—

ওয়াতান (আরবী শব্দ, অর্থাৎ স্বদেশ) হইতেই হইয়াছে ভুটান। যেমন—ওয়াতান> ওতান> বোতান> বুতান> বুটান> ভুটান।

৮. সিকিম—

সেখেম (আরবী শব্দ)> সিখিম> সিকিম। (In gaza strip—Nablus---------is the largest city on the west Bank—its ancient name of Shekhem. —Los Angeles Times, U. S. A.)

৯. তিব্বত—

(طبت) তোয়াবেত (আরবী শব্দ, অর্থাৎ উচ্চস্থান)> তাব্বেত> তেব্বত> তিব্বত।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার মূল আরবী

বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির মূল যেহেতু আরবীতেই সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িতেছে, বাস্তব ভিত্তিক অনেক তথ্যের সত্য প্রমাণের দ্বারা যাহা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু বাংলা ও বঙ্গ ভাষাটাও যে মূলতঃ আরবী ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। বিশেষতঃ আরবী ভাষার যে বিশাল ও বিস্তৃত শব্দ ভাণ্ডার রহিয়াছে তথা একটি আরবী শব্দের যে স্থলে শত সহস্র প্রতিশব্দ আরবী ভাষায়ই রহিয়াছে ; উপরন্তু যে কোনও একটি স্বরবর্ণের ক্ষীণতম পরিবর্তনও আরবীতে যে স্থলে বিভিন্ন শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন সাধিত হয় তদবস্থায় বাংলা ভাষাটাও যে প্রাচীন আরবী ভাষার নানা কালের নানা পরিবর্তনের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অনায়াসেই ধারণা করিতে পারা যায়। আরবী ভাষার স্বরবর্ণের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা ভাষায়ও রহিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামক গ্রন্থেও এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে। "স্বরবর্ণের খেয়ালের আর একটা দৃষ্টান্ত--------দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।--------সাধারণতঃ বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে।"(পৃষ্ঠা–৯২, ৯৩)

'বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। বাংলায় এ, ও, উ এই তিনটি স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানো কাজে লাগে তা নয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরী করে।' (পৃষ্ঠা-৯৯)

'কিন্তু একথাও জেনে রাখা ভাল, খাস বাংলায় এমন সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।'(পৃষ্ঠা-১০৮) 'বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা বলে চেনাই যায় না।' (পৃষ্ঠা–৯৮)

প্রসঙ্গত আসামের বাংলা ভাষার কথাও উল্লেখ্য। আসামের বাংলা ভাষা যে পূর্ববাংলারই বাংলা ভাষা তাহা Dr. J. P. Wade-এর An Account of Assam গ্রন্থের বরাত দিয়া পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে। 'কিন্তু অনতি প্রাচীন

www.pathagar.com

যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাইনে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নাই বললেই চলে।' (পৃষ্ঠা-৯.বাংলা ভাষা পরিচয়) সুতরাং বাংলাদেশের বাংলা ভাষার মত আসামের বাংলা ভাষার মূলও আরবীতেই রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাত্রীরা চলে এসেছে তারি প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গল কেশ বিপুল শক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলি ক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তীকালের গ্রন্থি কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে। কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়েনি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।" (পৃষ্ঠা–৯ ভূমিকা বাংলা ভাষা পরিচয়)। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখিত বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমি যে বহুদূর পশ্চিমের আরব দেশ ও আরবী ভাষা তাহা বলাই বাহুল্য. "হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। আরবী ভাষাকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং উহা হইতে শত শত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে যাহা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই। পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয় স্বজনের নামসমূহ, পদ সমূহের নাম সমূহ, সুখের উল্লাস, বিছানা, চাদর, বাড়ী ইত্যাদি সকল কিছুই আরবী ভাষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল এই যে শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হইত তাহা হইলে আরবী ধ্বনি হইত আর তাহাই যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হইত তবে সংস্কৃত ধ্বনি হইত।" ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত এই ভাষ্যে তাহা ধরা পড়ে।

কবি রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন—"সুনীতি কুমার বলেন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনো এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই জন্ম কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভ সীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিশ শতকের বাঙ্গালী আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।" (পৃষ্ঠা–৫৩, বাংলা ভাষা পরিচয়)।

ডঃ সুকুমার সেন তাহার বাংলা সাহিত্যের কাহিনীতে "-----বলিয়াছেন------- চর্যাগানের আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উর্দ্ধতম সীমা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া পৌছিল। ----ডঃ সেন মহাশয়ের মতে বাংলা

www.pathagar.com

ভাষা মোটামুটি হাজার বছরের প্রাচীন। সবিনয়ে বলিতে চাই, যেন মহাশয়ের এই অনুমান বিচারসহ হয় নাই। বাংলা ভাষা ইহা হইতেও বহু প্রাচীন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে।" (পৃষ্ঠা-৪১০, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, শ্রী সুধীর কুমার মিত্র, ২য় সংস্করণ।)

সঙ্গত কারণেই ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনও বলিয়াছেন—

"বৌদ্ধ দোহা ও গান কখনই বাঙ্গালা ভাষার আদি রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সহিত হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ পণ্ডিতদের এই মত, ডঃ সিলভান লেভী, ডঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রীয়ারসনের কতকটা এইমত। যদি এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে, এই সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষার দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইহা মনে করাই বেশী সঙ্গত যে, তাহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন; নতুবা তাহাদের লেখার টীকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন?" (পৃষ্ঠা-৯৬২, বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক বঙ্গবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রখ্যাত অধ্যাপক বিজয় চন্দ্র মজুমদার, স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধগান ও দোহা সম্পর্কে যে সুবিজ্ঞ ও সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠকের অবগতির সুবিধার জন্য এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হইয়াছে। যাহা পাঠে পাঠক নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবেই জানিতে পারিবেন, বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার ভাষা প্রকৃতপক্ষে বাংলা নহে বরং হিন্দী।

সে যাহা হউক "প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গ ভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই।" (পৃষ্ঠা-১৯, বিশ্বকোষ, ১৩১৪ বাংলা ; অষ্টাদশ ভাগ)। এতদসত্ত্বেও সেই প্রাচীন বাংলার যে ধারা বিভিন্ন কালের বিভিন্ন পরিবর্তনের ও পরিবর্দ্ধনের মধ্য দিয়াও আজ পর্যন্ত আমাদের লোক ভাষা ও সাহিত্যে যে রূপে ধরা দিতেছে তাহা উইলিয়াম কেরীর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকা

www.pathagar.com

হইতেও জানিতে পারা যায়। "Multitudes of words originally Persian and Arabic are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered enriching rather than corrupting the Bengali language." অর্থাৎ সাধারণ আলাপ আলোচনায় মূলগতভাবে বহু সংখ্যক পার্সী ও আরবী শব্দ অপরিবর্তনীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যাহা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করা অপেক্ষা বরং সমৃদ্ধ করে বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

আর হাল্‌হেড্‌ বলেন, "At present those persons (the Bengalees) are thought to speak the compound idiom with the most elegence who mix with the pure Indian verbs, the greatest number of persian and Arabic nouns" অর্থাৎ বর্তমানে ঐ লোকেরা (বাঙ্গালীরা) অত্যন্ত মার্জিত রূপে খাঁটি ভারতীয় ক্রিয়ার সহিত বহু সংখ্যক পার্সী এবং আরবী মিশ্রিত বাগধারা উচ্চারণ করে বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, হালহেড যে শব্দগুলিকে খাঁটি ভারতীয় ক্রিয়াবাচক শব্দ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ঐ সকল শব্দ যে ভারতীয় ক্রিয়াবাচক শব্দ নহে বরং প্রকৃতপক্ষেই আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দ তাহা "আল মুনজেদ" ও "আল কামুস" শিরোনামের দুইটি আরবী অভিধান হইতেও প্রমাণ করা চলে। যেমন–

	আরবী	ক্রিয়া	অর্থ	বাংলা
১.	ذهب (যাহাবা)	,,	(যাওয়া)	যাওয়া
২.	عاش (আশ-এ)	,,	(কাছে থাকা বা আসা)	আসা
৩.	بش (বশা)	,,	(উপর হইতে নীচে পড়া)	বসা
৪.	جلا (জালা)	,,	(গতি, চলা)	চলা
৫.	سمع (সুমা)	,,	(কানে শুনা)	শুনা
৬.	سواء (সোওয়া)	,,	(সটান লম্বা বা বরাবর হওয়া, কাজের শেষ)	শোয়া
৭.	غمن (গুমান)	,,	(আবৃত করা, গোপন করা, দৃষ্টি বন্ধ করা)	ঘুমানো
৮.	اتا (উতা)	,,	(উচ্চ হওয়া, ফল প্রকাশ হওয়া)	উঠা
৯.	دور (দওর)	,,	(পুনঃপুনঃ জোরে ঘুরা)	দৌড়
১০.	غسل (গুছাল)		[গোসল গো সান (স্নান অর্থে]	স্নান

www.pathagar.com

আরবী	(বিশেষ্য)	অর্থ	বাংলা
১. باط (বাত)	„	(কোন বস্তুর দিকে ঝুকিয়া পড়া)	ভাত (ভাতের দিকে ঝোঁক থাকায়— ভেতো বাঙালী)
২. بانى (বানি)	„	(জীবন সঞ্জীবনী)	পানি (পানির অপর নাম জীবন)
৩ قلم (কলাম)	„	(লেখার কলম)	কলম
৪. نوك (নবাকা)	„	(নৌকা)	নৌকা
৫. مستول (মাস্তুল)	„	(মাস্তুল)	মাস্তুল
৬ حائل (হাইল)	„	(হাইল)	হাইল
৭. واطى (ওয়াতী, বাতি)	„	(ভাটি, নদী প্রবাহের অনুকূল)	ভাটি
৮. أجن (উজান)	„	(উজান, পানির গতি পরিবর্তন)	উজান
৯. بادية (বাদিয়)	„	(অনাবাদী মরুভূমি বা বন)	বাদা, বাদ্দা
১০. عالية (আলিয়াহ)	„	(উজান স্রোতের ধারা)	আল-এর বঙ্গ (অর্থাৎ আলিয়ার বঙ্গ)
১১. كنك (কান্‌ক)	„	(গঙ্গা নদী)	গঙ্গা
১২. توك ان (তুকান)	„	(দোকান)	দোকান
১৩. شاط (শাত)	„	(নদীর কিনারা)	শাত (শাতিল কান্‌ক, চাটি গাঁ)

উল্লেখ্য যে, "আরবী ভাষার সুবিশাল ও ব্যাপক শব্দ ভাণ্ডার রহিয়াছে। ইহার শব্দ সম্পদের সহিত কোন ভাষারই তুলনা হইতে পারে না। ভাষা সমূহের সুবৃহৎ স্তুপের মধ্যে আরবী ভাষাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত।--------আরবী ভাষায় এক গ্রন্থে সিংহের ৫০০ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় অপরটিতে সর্পের ২০০ নাম। মধুর জন্য ------৮০০ শব্দ---------তরবারির জন্য আরবী ভাষায় কম পক্ষেও ১০০০ শব্দ রহিয়াছে।" (The Islamic Review Vol. XII, No. 1 January, 1959, Page-10, দ্রষ্টব্য।)। আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন উপরের উল্লেখিত বাংলা ক্রিয়া ও বিশেষ্য বাচক শব্দগুলির মত বাংলা ভাষার

www.pathagar.com

অন্যান্য শব্দ ও আরবী ভাষার উপরিউক্ত সুবিশাল ও ব্যাপক শব্দ ভাণ্ডারের কোন না কোন শব্দ হইতে মূলতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ (অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ) নেই বললেই চলে। এমন কি কোন নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনই সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক পড়ি আর এক। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায় আর সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলায়। (পৃষ্ঠা-৯৬, বাংলা ভাষা পরিচয়) এমতাবস্থায় হালহেড-এর উপরে উল্লেখিত Indian verbs অর্থাৎ সংস্কৃত (verb) ক্রিয়া যে সংস্কৃত ক্রিয়া নহে, আরবী ক্রিয়া তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বাংলার উপরিউক্ত মৌলিক সেমিটিক আরবীয় রূপকে বর্তমানে খুঁজিয়া বাহির করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে একটি মাত্র প্রধান কারণেই। এই দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হইবার অল্প কাল পরেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ দ্বারা আর্যায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া বাংলা ভাষার সত্য পরিচয় ঢাকিয়া দিয়া প্রকারান্তরে বাঙ্গালীর সত্য পরিচয় বিনষ্ট করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সুদীর্ঘকালের পূর্ববর্তী সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইয়া রাজ্যহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া হিন্দুদের বিশেষ করিয়া বর্ণ হিন্দুদের সহযোগিতায় এতদ্দেশে সর্বপ্রথম রাজনীতির সহিত ধর্মকেও যুক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করিয়া Divide and rule নীতির দ্বারা এতদ্দেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করণ সোজা কথায় সেই প্রধান কারণটি হইতেছে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর কন্যার মুখোশ ও পোষাক পরাইয়া বাংলা ভাষার আর্যায়ন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সজনী কান্ত দাসের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে—

"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি গিট্‌স্ ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদনযজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই

www.pathagar.com

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মও এই বৎসর। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক, আরবী পরসীকে অশুদ্ধপদ ধরিয়া শুদ্ধপদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা-২১২, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, শ্রী সজনী কান্ত দাস।)

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন-"We have elaborate grammars of Sanskrit masquerading as Bengali grammar in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgar (ashadhu) beside the so called polite (sadhu) forms borrowed from Sanskrit."(Page-XV, 0-D-B.L)

বাংলা ভাষার শত্রু ও মিত্র

আরবী ভাষা যে বাংলা ভাষার মিত্র তাহা উইলিয়াম কেরীর ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ইংরেজী ভাষ্যের "Multitudes of words originally ---Arabic are ------enriching-----the Bengali language" অর্থাৎ বহু সংখ্যক শব্দ মূলত আরবী ---বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছে ইত্যাদি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এমতাবস্থায় আরবীকে বিতারণ করিয়া বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার রূপ দেওয়া যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে শত্রুতাই করা, তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে। "পার্সি আরবী কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। "বিদায়" কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবী ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোষাক পরে বসেছে। "হয়রান করে দিয়েছে" বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে "দরদ" লাগে না বললে ঠিক কথাটা বলা হয়, ও ছাড়া আর কোন কথাই নেই। গুরু চণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে সংবেদনা শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলিন্য নিয়ে খুঁত খুঁত করেন এমন গোড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুই মুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এ রকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে

www.pathagar.com

আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্য কর্ম নয়।" (পৃষ্ঠা-৫২-৫৩, বাংলা ভাষা পরিচয়)

বরীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন—"বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে, কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপ কথায় বলে এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী—সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপের আছে দুই রাণী, একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আট পৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে—কবি বলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপ কথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়াল ঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে গোয়ালের ধারে,—গোবর নিকোনো আঙ্গিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যে বেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায়, আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসেনি—কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরণী নেবেন বিদায়, আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। আমাদের দিন রাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।" (পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭, ঐ)

রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতির প্রারম্ভেই বলিয়াছেন "বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে, কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা দুইই আমাদের জানা চাই।" তাই বাংলা ভাষাকে চিনিবার কথা বলিতে লোক মুখের চলতি বাংলা ভাষা যে বাংলা ভাষার শক্তি এবং সংস্কৃত প্রধান সাধু ভাষা যে বাংলা ভাষার দুর্বলতা তাহাও রবীন্দ্রনাথ অব্যক্ত রাখেন নাই। লোক মুখের চলতি বাংলা ভাষার শক্তির কথায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সহিত তুলনা মূলক ভাবে আরবী পার্সি শব্দের শক্তি বেশী যেমন বলিয়াছেন, তেমনি

www.pathagar.com

উইলিয়াম কেরীও তাহার ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত ভাষ্যে আরবী শব্দ যে বাংলা ভাষাকে বিকৃত না করিয়া সমৃদ্ধ করে তাহা বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় লোক মুখের বাংলা চলতি ভাষাকে চিনিতে হইলে বাংলা চলতি ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট আরবী ভাষাকেও চিনিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, মানুষের মুখের চলতি ভাষাকে বর্জন করিয়া অপর কোনও ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া আমেরিকার চিন্তাবিদ এমার্সন ও ইংলণ্ডের বিশিষ্ট লেখক সমারসেট মমও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহারও কারণ স্যার স্যামুয়েল জনসনের কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট, "Dialeets are the pedigree of nations" অর্থাৎ মুখের চলতি ভাষাই জাতির নৃ-তাত্ত্বিক বংশ পরিচয়। তাইত মুখের চলতি ভাষার বিলুপ্তিতে জাতির আসল পরিচয়ও বিলুপ্ত হয় বলিয়া জাতিকে যে দাসত্বও বরণ করিতে হয় তাহা বিখ্যাত দার্শনিক প্ল্যাটোর 'He who can not speak his thought is a slave'. অর্থাৎ যে নিজের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না সে একজন দাস, উক্তিতেও সুস্পষ্ট। কোনও দাস যেহেতু নিজের ভাব-ভাষায় কথা বলিতে পারে না সেহেতু তাহার স্বাধীনতা বলিতেও কিছু থাকিতে পারে না বিধায় ফ্রান্সের প্রখ্যাত মনীষী ভিক্টর হিউগো মনুষ্য জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নিজের মুখের চলতি ভাষাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্তক থাকিতে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন; "An invasion by armies can be resisted but an invasion of ideas can not be resisted." অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীর আগ্রাসন ঠেকাইতে পারা যায় কিন্তু ভাব-ভাষার আগ্রাসন ঠেকাইতে পারা যায় না। বাংলাদেশেও তাইত ১৯৪৮ হইতে ১৯৫২-র বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনের দ্বারা ১৯৭১-এর রক্তাক্ত মুক্তি যুদ্ধের ফলে দেশ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হইলেও এবং আজ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও ভাষাগত ভাবে দেশ যে এখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই বাংলা ভাষার উপরে সংস্কৃত ভাষার আগ্রাসন যে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে তাহাতেই মনীষী ভিক্টর হিউগোর উপরিউক্ত সতর্কবাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাংলা ভাষার উপরে সংস্কৃত ভাষার আগ্রাসন নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে—

আধুনিক বাংলা ভাষার স্বরূপ

"হিসাব করে দেখা গেছে, যে ভাষা আমাদের নামজাদা সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় ব্যবহার করছেন, তার শতকরা দুইটি অনার্য, পঁচিশটি সংস্কৃত, পাঁচটি আধা সংস্কৃত, ষাটটি সংস্কৃত থেকে ভেঙে সোজা করে নেওয়া আর আটটি হচ্ছে বিদেশী অর্থাৎ কিনা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী

www.pathagar.com

প্রভৃতি।" (ডক্টর এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন, মাসিক "মাহে নও" সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৬৩।)

অর্থাৎ	১. অনার্য (দেশী) শব্দ	২
	২. সংস্কৃত শব্দ	২৫
	৩. আধা সংস্কৃত শব্দ	৫
	৪. সংস্কৃত থেকে ভেঙে সোজা করে নেওয়া	৬০
	৫. বিদেশী শব্দ (আরবী, পার্সী, ইংরেজী, পর্তুগীজ)	৮
	সর্বমোট শব্দ-	১০০

উপরে বর্ণিত এই সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও স্পষ্ট—"বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভাল জানি না। আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। ----এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি ধরিতে পারি নাই।---সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরেজী ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।" (পৃষ্ঠা-১৮০, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, ১ম খণ্ড, শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।)

এতদ্ব্যতীত প্রখ্যাত ভাষা তত্ত্ববিদ ডক্টর গ্রীয়ারসন (Dr. G. A. Grierson (তো খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন "Calcutta Pandits--ruined the language" অর্থাৎ কলিকাতার পণ্ডিত সমাজ ভাষাটাকে ধ্বংস করিয়াছেন—

The very same incapacities of the vocal organs exists with the Bengalees now, that existed with their predecessors eight hundred years ago. A Bengali can not pronounce 'Kshm' any more than they could. He can not pronounce a clear 's' but make it 'sh'. The compound letter 'hy' beats him, and instead he has to say 'jjh'----Nevertheless a Bengali when he borrows his Sanskrit words, writes them in Sanskrit fashion which say, at least two thousand years out of date and then reads them as if they were Magadhi words. He writes 'Lakshmi' and says 'Lakki.' He writes sagar and says 'Shayar'----in other words he writes Sanskrit and talks other language.

www.pathagar.com

Liberary Bengali as now known is the product of the present century. Its direct cultivators were Calcutta Pandits who, however, well meaning has ruined the language by their learning." (The Lnguistic survey of India, Journal of the Asiatic Society, Part I & II, Dr. G. A. Grierson.

সঙ্গত কারণেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষার খাঁটি রূপকে চিনাইবার দাবীও বর্তমানে উঠিতেছে—"বানানের পাশাপাশি বাংলা ব্যাকরণকেও সংস্কৃতের জটাজাল মুক্ত করা উচিত। ডঃ সুকুমার সেন যাদবপুরে হালহেড সেমিনারে বলেছিলেন, বাংলা ব্যাকরণ ২৭/২৮ পৃষ্ঠার বেশী হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা পরিচয়ের আদলেও যদি বাংলা ব্যাকরণ লেখা হত, তাহলে ছাত্র ছাত্রীরা নিজের ভাষাকে চিনতে পারত। সংস্কৃত অনুসারী বাংলা ব্যাকরণ যেমন বিপুলায়তন তেমনি তা বাংলা ভাষার সজীবতার প্রাণ স্পন্দন সঞ্চারে ব্যর্থ।"(পৃষ্ঠা-৩, সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮১, ব্যাকরণের জটাজালে বাংলা বানান, আশীষ কুমার দে)।

এই সত্যের পরিপূরক সত্য নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—"বাংলা ভাষার সংস্কৃতের আনুগত্য তিনি (প্রমথ চৌধুরী) পূর্বে ভালবাসিতেন না, এখনও না।---- প্রমথ চৌধুরী লিখিলেন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গালার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন, বাঙ্গালার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না। -----আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত-ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দু'য়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায় শুধু মুখের ভাষাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই সে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।" (পৃষ্ঠা-১০৩, বাংলার শক্তি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, বাংলা ভাষায় ছোট গল্প, শ্রী নরেন্দ্র চক্রবর্তী।)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য নামে সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ দ্বারা গঠিত যে বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সাহিত্যের সহিত দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের হৃদয়ের সংযোগ সাধিত হইতে পারিতেছে না বিধায় প্রমথ চৌধুরী আরও বলিয়াছেন—"ভাষা মানুষের মুখ হইতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে কালিই লাগে।" কিন্তু মুখে কালি লাগাইয়া সং সাজিতে সাজিতে বহুদিনের নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আত্মসম্বিত হারাইয়া বর্তমানে আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না যে আমাদের মুখে আজ যে কালির

www.pathagar.com

কালো রং দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহা আমাদের মুখ মণ্ডলের স্বাভাবিক ও প্রকৃত রং নহে। তাহা না হইলে, আমরা আমাদের মুখ মণ্ডলের স্বাভাবিক, সুন্দর, প্রকৃত ও খাঁটি রংটি আয়নায় দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত, আনন্দিত ও উল্লসিত হইতে পরিতাম তথা আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইয়া জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথও খুঁজিয়া পাইতাম।

তাইত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহাই আলোচনার দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে হইবে। তাহার পরে অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাংলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, এখন যাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাংলা ব্যাকরণ নহে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ নহে।" (পৃষ্ঠা-১৬, ভাষা তত্ত্ব, রফিকুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫ হইতে সংগৃহীত।)

অনুরূপভাবে "১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসের অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতায় এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যাহারা গড়িতে যাইবেন তাহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে তাহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ, প্রকৃতি, গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।"(পৃষ্ঠা–৮৯, সাহিত্য সম্ভার, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ।) কারণ "পরের ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি কখনো হয় না।" (আমেরিকার চিন্তানায়ক এমার্সন ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক সমারসেট মম।)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে জনাব শাহাদাত হোসেন খান 'পাঠ্যসূচীতে বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু' শিরোনামে যে একটি মূল্যবান ও উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও প্রকৃতপক্ষেই বিশেষ ভাবে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে বিধায় প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইলেও পাঠকের অবগতির জন্য প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপেই এতদস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বা মোটেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে কোন উপকার দর্শাবে কি-না তা ভেবে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

ব্যাকরণ এমন কোন বিধিমালা নয়, যা ভাষা বা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাকরণ ভাষার অতীতকে বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পথকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা নতুন পথ সৃষ্টি করতে পারে না। এই যেন উড়ো জাহাজ থেকে তোলা প্রবহমান কোন নদীর ছবি বর্ণনার ন্যায়। এ বর্ণনা নদী বা নদী বিধৌত এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, পারে শুধু রূপ বর্ণনা করতে। তেমনি সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা কালে ব্যাকরণ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না অথবা ব্যাকরণ তাকে সাহায্যও করতে আসে না। তাহলে ব্যাকরণের ব্যবহারিক উপকারিতা কোথায় ? বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লিখেন মনো এল দ্য আসুমপসাও। তিনি এটি লিখেন ১৭৪৪ খৃঃ এবং এটি ছিল রোমান অক্ষরে, যা ১৭৪৪ খৃঃ মাদ্রিদ থেকে ছাপা হয়ে আসে। এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। তবে বাংলা অক্ষরে প্রথম ব্যাকরণ লিখেন নাথানি এল ব্রাস হালহেড ১৭৭৮ খৃঃ। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেন রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃঃ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ)। এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কেরী (১৮০১), কীথ (১৮২০), বীমস (১৮৭২) এবং হর্নলে (১৮৮০)। এগুলো সবই খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। এরপর থেকে বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত সন্ধি সমাসাদি প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণ হতে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষার কোন ব্যাকরণই ছিল না। তবে কি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি ? হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (ক) প্রাচীন যুগ (৯৫০খৃঃ-১২০০খৃঃ) (খ) মধ্য যুগ (১২০০খৃঃ-১৮০০খৃ.)—এ সময় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ন, মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ), শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ ইত্যাদি রচিত হয়। এ ছাড়া পদাবলী, বিভিন্ন মহাকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন কাহিনী এই সময়ের সৃষ্টি। (গ) আধুনিক যুগ (১৮০০খৃঃ বর্তমান কাল) এই সময়ে সাহিত্য কীর্তির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাকরণের অস্তিত্ব সাহিত্য কর্মে বা সৃষ্টিতে বাঁধার সৃষ্টি করে না। । অতএব ব্যাকরণ বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে নিষ্প্রয়োজন।

ভাষার লিখিত রূপই সাহিত্য। এই সাহিত্য অবরোহণ পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে আরোহন পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথম বর্ণ, শব্দ এবং তারপর বাক্য। শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতি থেকেই এ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়। (ক) শিশু ভুমিষ্ঠ হলে প্রথম উচ্চারণ করে কতক গুলো স্বরধ্বনি, যেমন-উঃ অ

www.pathagar.com

ইত্যাদি। (খ) তারপর স্বরতন্ত্র কিছুটা মজবুত হলে তার মুখ থেকে বের হয় স্বরমিশ্রিত ব্যঞ্জন ধ্বনি, যেমন—বা, মা, কা ইত্যাদি (গ) আরো কিছুদিন পরে স্বরে মিশ্রিত দ্বৈত ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করে, যেমন—বাবা, মামা, কাকা ইত্যাদি। (ঘ) বাকযন্ত্র আরো মজবুত হলে শব্দের মধ্যে স্বরহীন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করে, যেমন—বক, টক, ফল ইত্যাদি। (ঙ) তারপর ক্রমে ক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে বাক্য গঠন করতে শিখে অর্থাৎ আর দশজনের মত বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে। উপরোক্ত পাঁচটি স্তরে শিশু যা যা উচ্চারণ করেছে সেগুলো প্রতি স্তরেই শিশুর জন্য ভাষা। কেননা এর প্রতিটিই স্তর বিশেষে শিশুর মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব প্রকাশ করেছে। স্বরবর্ণ থেকে ভাষা তথা সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তারপর ব্যঞ্জন বর্ণ, অবশেষে শব্দ ও বাক্যের আগমন। এটিকে আরোহণ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। মুখ গহবরের ভিতর এক একটি জায়গা থেকে বায়ু চাপ প্রয়োগে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তারই এক একটি রেখাচিত্রের নাম এক একটি বর্ণ বা অক্ষর। প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি ও রেখাচিত্র (বর্ণ) এই তিনটিই হচ্ছে আমাদের মানদণ্ড।

এই মানদণ্ড যাতে ঠিক থাকে সেদিক আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। তা না হলে ভাষার পরিবর্তন হতে হতে মূল ভাষাই একদিন হারিয়ে যাবে।

ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও বিধেয় (সাবজেক্ট ও প্রেডিকেট) এসেছে ইংরেজী থেকে। সন্ধি, সমাস, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি এসেছে সংস্কৃত থেকে। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের প্রায় পুরাটাই আমদানী করা। খাঁটি বাংলা সন্ধি হয় না। কারণ বাংলা বিশ্লেষত্বক ভাষা, একাধিক শিকলে এক সংগে মিলিয়ে উচ্চারণ করার চাইতে আলাদা করে উচ্চারণ করার ঝোঁক বেশী। গোল+আলু= গোলআলু এমন ব্যবহার নেই। বাংলা সন্ধি এসেছে সংস্কৃত থেকে তৎসম শব্দের মাধ্যমে। বাংলায় তৎসম শব্দের হার ৪৪% তদ্ভব ও দেশী ৫১.৪৫% এবং বিদেশী ৪.৫৫% (শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর হিসাব মতো)।

ব্যাকরণের কারক ও বিভক্তি সন্ধি-সমাসের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন এবং শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয় বরং শিক্ষার্থীর মনে তা জটিলতা সৃষ্টি করে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, সংস্কৃত থেকে ধার করা কারকত্ব সংস্কৃতের অনুগামী নয়। সংস্কৃতে প্রত্যেক কারকেরই একটি নির্দিষ্ট বিভক্তি আছে। বাংলায় তা নেই। বাংলায় একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কর্ম ও সম্প্রদান কারকে 'কে বিভক্তিকে একবার, দ্বিতীয় এবং কয়েকবার চতুর্থ বিভক্তি বলার কোন মানে নেই। করণ কারকের দ্বারা ওদিয়ে এবং অপাদানের

www.pathagar.com

হতে বা চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বিভক্তি নয়, স্বতন্ত্র অব্যয়। ছেলেটির দ্বারা, ছেলেটিকে দিয়ে, বালকের চেয়ে, কে, কেমন, করে বিভক্তি বলা যায় ? বস্তুতঃ করণ ও অপাদানের অর্থ বিভিন্ন পদান্বয়ী অব্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়। করণ কারকে এ বিভক্তি নেই। সুতরাং সম্প্রদান ও অপাদানকে করণ না বললেও চলে। রাজা রাম মোহন রায় তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে শব্দ রূপে করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারক বিভক্তি দেননি। রাজা রাম সম্প্রদান কারক-কে স্বীকারই করতেন না। সুতরাং এই জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ কারক তত্ত্ব পড়ে লাভ কি ?

উপসংহারে বলতে চাই, আমাদের কেবলমাত্র ধ্বনি তত্ত্ব ও বর্ণ তত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের মানদন্ড ঠিক রাখার জন্য। এ ছাড়া বাকী সবই পরিত্যাগ করা চলে। ধ্বনি তত্ত্ব ও বর্ণ তত্ত্ব রচনা বইতে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাকরণের বাকী সব বোঝা শিক্ষার্থীদের মাথা থেকে নামিয়ে দিলে তারা মস্তিষ্কের অপচয় থেকে ক্ষমা পাবে। এ বিষয়ে ভাষাবিদগণ একটু ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।"(পৃষ্ঠা–৬, বির্তক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৪ শ্রাবণ ১৪০১ সন ; ১৯শে জুলাই, ১৯৯৪।)

এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উপরে বর্ণিত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি---। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই--- যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালী সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপনীত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞান শূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।-----বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। ---ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও তাহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছে।" মানসী, বৈশাখ, ১৩২১; পৃষ্ঠা–৩৫৬, (ডঃ রফিকুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ 'ভাষা তত্ত্ব' হইতে সংগৃহীত।)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৫

বাংলাদেশের বাংলা ভাষার সমস্যা ও সমাধান বাংলাদেশী জাতীয়তার দিক নির্দেশ

১৯৪৮ হইতে শুরু করিয়া ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনই যে আমাদিগকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের স্বর্ণ তোরণ দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বাংলাদেশের বাংলা ভাষা যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাইত বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ভাষাকে এতদ্দেশের সর্বস্তরের মানুষের সব কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্য স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বাংলা ব্যতীত ভিন্ন ভাষার বই পুস্তকের বাংলা অনুবাদ এবং অফিস কাছারীতে ব্যবহারের জন্য বাংলা পরিভাষা রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এখানেই নুতন করিয়া সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য। উপরিউক্ত বাংলা অনুবাদ ও বাংলা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রাধান্য যে আশংকাজনকরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে; উপরন্তু ইহাতে সহজ সরল বাংলা ভাষা যে দিনে দিনে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দুর্বোধ্যও হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বাংলা ভাষা রীতির স্বাধীন ব্যবহারও যে ক্ষুণ্ন হইতেছে এমন কথাও এখন উঠিতেছে। দুই একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। যেমন—ইংরেজী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বি-এ, এম-এ, ইঞ্জিনিয়ার, ভাইস চ্যান্সেলর ইত্যাদি শব্দের বাংলা পরিভাষা করা হইয়াছে যথাক্রমে—বিদ্যালয়, বিদ্যাপীঠ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, প্রকৌশলী, উপাচার্য। আর আরবী ফার্সীর বহুল প্রচারিত ও সহজবোধ্য অনেক শব্দেরও এমনি সংস্কৃতানুগ অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন—ময়দান হইয়াছে উদ্যান, আদালত হইয়াছে বিচারালয় বা ন্যায়পীঠ, হুকুম হইয়াছে আদেশ, জারি হইয়াছে প্রচার, কবর হইয়াছে সমাধি, খবর হইয়াছে সংবাদ বা বার্তা, দোকান হইয়াছে বিপনী, দোয়াত হইয়াছে মস্যাধার, কলম হইয়াছে লেখনী ইত্যাদি। এই রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

www.pathagar.com

এইরূপে বহুল প্রচারিত ও সর্বজন বোধ্য বাংলায় ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলিকে যে সংস্কৃত ভাষা রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করা হইতেছে তাহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে শব্দগুলি বিদেশী শব্দ। কিন্তু সংস্কৃত শব্দও কি বিদেশী শব্দ নহে ? উর্দ্দু ভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ভাষা হইয়া থাকিলেও উহা বাঙ্গালীর কাছে যেমন ছিল বিদেশী ভাষা, তেমনি সংস্কৃত ভাষাও এই উপমহাদেশের অপর একটি ভাষা হইলেও উহাও বাঙ্গালীদের কাছে একটি বিদেশী ভাষা। সংস্কৃত ভাষা যে বাংলাদেশের স্বদেশী ভাষা নহে, বরং ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষার মতই সংস্কৃত ভাষাও যে একটি বিদেশী ভাষা, তাহাও আবার অন্যান্য ভাষার মত জীবিত ভাষাও নহে, সম্পূর্ণ রূপেই একটি মৃত ভাষা, তাহা একটু চিন্তা-ভাবনা করিলে সকলেই বুঝিবেন।

তবুও সংস্কৃত ভাষার প্রতি বাংলাদেশের পণ্ডিত সমাজের অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবার কারণ কি ? এই কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা হইতেছে, 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালা' শব্দ দুইটির ধ্বনিমূল ও অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা এযাবৎকাল অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত রহিয়াছে বিধায় আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আধিপত্যবাদী ইংরেজ আর্য ও এতদ্দেশীয় আর্য নামধারী ব্রাহ্মণ সমাজ ঘোষণা করিয়া দিল যে সংস্কৃত ভাষা হইতেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এইমাত্র স্বার্থে যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষার দ্বারা হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়া.হ, বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিলে সংস্কৃতের দ্বারা বাংলায়ও আর্য ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বা আধিপত্য তেমনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এমনি করিয়াই সংস্কৃত বাংলা ভাষার কল্পিত জননী হইয়া বাংলার স্বর্ণ সিংহাসন লাভ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে শাসন করিবার অধিকার পাইল।

এইজন্য উক্ত ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত সমাজকে আজ পর্যন্ত কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতে হয় নাই বলিয়া তাহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ছলে বলে কৌশলে নানা প্রকারে সংস্কৃতানুসারী করিতে করিতে বর্তমানে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিরোধ ব্যতীত ক্ষীণতম মিলও যে কোথাও নাই এমন কথা শুনিলেও আমাদের বিস্ময় জাগে। তাইত অতীতে বিদেশী ভাষা বলিয়া উর্দ্দুর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম মুখর ও সোচ্চার হইয়া থাকিলেও বিদেশী সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও আমাদের মুখে উচ্চারিত হয় না। তাই ইহাও বিস্ময়কর বটে। এমনি করিয়া বাংলার উপরে সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য বিনা

www.pathagar.com

প্রতিবাদে মানিয়া লইয়া প্রকারান্তরে অনার্য অর্থাৎ প্রাগার্য বাঙ্গালীর উপরে আর্য আধিপত্যবাদকেই লালন করিয়া আমাদের চরম অজ্ঞতার, নির্বুদ্ধিতার ও হীনমন্যতার যে লজ্জাকর পরিচয় আমরা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় ভাষাবিদগণ সংস্কৃত ভাষার সহিত পারসিক ও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের কতকগুলো শব্দের মধ্যে ধাতুগত ঐক্য আবিষ্কার করিয়া ঐসকল ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে জাতিগত (racial) ঐক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে কল্পিত জাতির নাম দেওয়া হয় আর্য বা Aryan । ইংরেজ জার্মান রুশ ভারতীয় এমনকি বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষা বলে ; অতএব সকলেই আর্য মহাজাতির শাখা। এই তত্ত্বকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিবার উপাদান তখন ইউরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামতকে আমরা স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর কল্পনার রঙে রাঙাইয়া গ্রহণ করিলাম এবং আমরা যে 'আর্য' এইমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম—ইহাকেই বলে 'আর্যামি'। এই 'আর্যামি'কে লক্ষ্য করিয়া কবি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) পরে লিখেছিলেন—

"মোক্ষ মূলার বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

(পৃষ্ঠা-২১৩–২১৪, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।)

সে যাহা হউক, বাঙ্গালী অনার্য অর্থাৎ প্রাগার্য একটি সুসভ্য জাতি, এই পরিচয় জানা সত্ত্বেও আর্যদের অধীনস্থ আর্যেতর একটি জাতি হিসাবে বাঙ্গালী যে পরিচিত হইতে দ্বিধাবোধ করিল না, তাহারও কারণ একদিকে যেমন বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি ও অজ্ঞতা অপর দিকে তেমনি তাহার আত্মমর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টা। কেননা, তথাকথিত ইংরেজ আর্য ও ব্রাহ্মণ সমাজ বাংলাদেশে তাহাদের আধিপত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতানুসারী করিবার চেষ্টার সংগে সংগে এমন অসত্যও তলে তলে প্রচার করিয়া দিল যে, বাঙ্গালীরা অনার্য জাতি সম্ভূত একটি জাতিই মাত্র নহে, চণ্ডাল অর্থাৎ চাঁড়াল বা ডোম চামার জাতির মত অতি নিকৃষ্ট জাতি হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে বিধায় সংস্কৃত প্রধান বাংলা ভাষার চর্চা করিয়া আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত একটি আর্যেতর জাতিরূপেও নিজেদের পরিচিত করিয়া তাহাদের চাঁড়াল বা চামার

www.pathagar.com

জাতীয় নীচ পরিচয় লোপ করিয়া আর্যজাতির মর্যাদা ও গৌরবের ভাগী ও অধিকারী হইতে পারে। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে।

"ওরা বলত ঃ আমরা চাঁড়াল থেকে মুসলমান হয়েছি।" (আতাউর রহমান খান, প্রাক্তন মন্ত্রী, পৃষ্ঠা-৩, ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৭৭।)। সঙ্গত কারণেই বাঙ্গালীরা তাহাদের অনার্য তথা চাঁড়াল ও চামার জাতীয় নীচ পরিচয় ঘুচাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া আর্য বনিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, যাহার জের আজ পর্যন্তও চলিতেছে। বাঙ্গালীরা অনার্য জাতীয় লোক হইয়া থাকিলেও চাঁড়াল বা চামার জাতির সহিত বাঙ্গালীর যে কোনও সম্পর্ক নাই, বরং আর্য জাতিই যে চাঁড়াল ও চামার জাতির সহিত সম্পর্কিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে।

"The Chamars, for instance, one of the largest and most interesting castes in Chhattisgar are looked down by the Hindus, in their faith they are rather aggreively anti-Hindu, the word Hindu being used in popular sense. Yet physically the Chamars resemble their Aryan more than their non-Aryan neighbours---"(Page-273, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part 1, 1890, Chhattisgar, P .N. Bose, B. sc. (London).

এতদসত্ত্বেও অনার্য বাঙ্গালীদিগকে কল্পিত চাঁড়াল বা চামার জাতীয় নীচ পরিচয়ের লজ্জা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার উপায় হিসাবে আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আর্যজাতির গৌরবের ভাগী হইবার জন্য আর্যগণ যে বাঙ্গালীদিগকে আহবান জানাইয়াছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল অনার্য বাঙ্গালীর উপরে আর্যদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করা। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্য প্রতিপন্ন হইবে।

"Why do the racists insist on their false views ? the answer is a simple one. The theory of 'higher 'or 'lower' races of the right of on race to dominate over another, justifies war between nations—it is the ideological mask concealing imperial politics-----the theory of an Indo-European or Aryan 'first language' and 'Common ancestor' with all the features of the Aryan race is refuted and at the same time it is obvious that no race has the right to call itself

www.pathagar.com

'Aryan'—noble born." (Professor M. Nasturkh, The races of mankind, translated from Russian by George Hanna, 2nd Ed.Page-98, 100.)

সুতরাং সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষাকে বর্জন করিয়া বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের লোক ভাষা ও লোক সাহিত্যের পথ ধরিয়া খাঁটি বাংলা ভাষাকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী জাতির ভবিষ্যত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সজনী কান্ত দাসও তাই বলিয়াছেন—

"বাংলাদেশে ইংরেজ সমাগমের পূর্বে অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংঘাতের পূর্বে (হিন্দু মুসলমানের) দুই ভাবধারা সমানে প্রবাহিত হচ্ছিল----সাহিত্যের রস তখন---কবি ও পাঁচালি গানের আকারে বাঙ্গালীকে সঞ্জীবিত করত---নানা বিকার সত্ত্বেও একটা সহজ রসবোধের ধারা অব্যাহত ছিল।-------ওদিকে গোড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে (অর্থাৎ লোক মুখের বাংলা ভাষাকে) ইতর প্রাকৃত জনের উপজীব্য জ্ঞানে কাব্য, ব্যাকরণ নব্য ন্যায়ের সংস্কৃত মহিমায় থাকতেন বিভোর।---হঠাৎ ইংরেজী শিক্ষার ধাক্কায় রসের ক্ষেত্রে আমাদের রুচি বিপর্যয় ঘটল, আমাদের সংস্কৃতি ও প্রাত্যহিক জীবন ধারায় ছেদ ঘটল। জীবন যোগ বিচ্ছিন্ন এক নতুন কালচারের সর্বগ্রাসী মোহে গড়ে উঠল শিক্ষিত সম্প্রদায়; দেশের পনেরো আনা মানুষের সংগে এই এক আনার সর্বনাশা বিচ্ছেদ ঘটল। যা ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক হিন্দু কলেজের শিক্ষা তাকেই করল কঠিন এবং ব্যয় সাধ্য। ইংলণ্ডীয় সাহিত্য ও সভ্যতার বিরাট এবং মনোহর আদর্শ সম্মুখে থাকাতে বাংলাদেশের এই শিক্ষিত এক আনী সম্প্রদায় রাতারাতি বিজাতীয় হবার স্বপ্ন দেখলেন, যা কিছু আপন, যা কিছু স্বদেশীয়, তারই উপর জাগল ঘৃণা, স্বদেশের আবহাওয়াকেও তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছায় সহ্য করতে লাগলেন। আমি ঠিক অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস দশ লাইনে দেবার চেষ্টা করলাম। ---আমি দীর্ঘ - ------বৎসর এই দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে সাহিত্যের সাধনা করছি, আজ দেশের অবস্থা দেখে আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যে বানান অথবা সাম্প্রদায়িকতা, গদ্য কবিতা অথবা যৌন প্রবণতা এ সবের কোনটাই আমাদের জাতির সমস্যা নয় ; আমাদের সমস্যা এর চাইতে অনেক বড় ; আমাদের জীবনের সকল বিভাগে মননশীলতার অভাবই আমাদের পরাজয়ের কারণ।-----সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি হলে জাতির ব্যবহারিক জীবনে তা প্রতিফলিত হবেই ; পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসই এই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাংলাদেশে একজন মধুসূদন, একজন বঙ্কিম চন্দ্র ও

www.pathagar.com

একজন রবীন্দ্রনাথের জন্ম সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতি যে এখনও কলঙ্কমুক্ত হতে পারল না, এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের সাহিত্য সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ হয়নি। কোথায় যেন ফাঁকি আছে। সেই ফাঁকিটুকু আপনাদের ধরতে হবে; আমরা পূর্ব যুগের (অর্থাৎ ইংরেজ আমলের) শিক্ষাতেই মানুষ বলে হয়ত সঠিক ব্যাধিটা ধরতে পারছি না,------এই ব্যাধির মূল অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু সে জন্য প্রেম চাই, শ্রদ্ধা চাই।-----পুরাতনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সেই বুনিয়াদের উপর নুতন সৌধ নির্মাণই সত্যিকারের সংস্কারকের কাজ। দেশের প্রাণ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে মনগড়া অথবা পরদেশী সংস্কৃতি বা সাহিত্যের প্রবর্তনে পৃথিবীর কোনও জাতির কখনই মঙ্গল হয়নি, মূল বৃক্ষের মত সংস্কারকেও একেবারে মাটির অন্ধকার ফুঁড়ে উঠতে হবে। (শ্রী সজনী কান্ত দাস, দীপালি উৎসব, পৃষ্ঠা-১৩৪–১৩৭, ১৩৯; বাংলার শক্তি, মাঘ, ১৩৪৭, কলিকাতা।)

শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত অপর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকও বলেন—"উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজ এসেছে ; তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা রীতি তাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে, আজও তা সমান্তরাল রেখার মতই চলেছে। আজ যখন বাঙ্গালী লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ উঠে, তখন সে অভিযোগের পেছনে নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়, দেড়শ বছর আগে বাংলা ভাষার নব-বিধানও যে তার জন্য কতকটা দায়ী, সে কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে।"

সঙ্গত কারণেই তাই উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস ও ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁহার "আমাদের সমস্যা" শিরোনামের ৭৩ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন তাহা এতদস্থলে সবিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

"যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে অভিজাত তন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষা ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাত তন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল

www.pathagar.com

অভিজাত তন্ত্রের ভাষা। লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন, "লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য না ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ।" ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ------ঋষিগণের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত তন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তী কালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা বলিলেন "ন ম্লেচ্ছ ভাষাং শিক্ষেথ"—ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না। তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত তন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠি প্রভৃতি দেশীয় ভাষা সমূহের মূল।

তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধুভাষা করিয়া লইলেন। বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পন্ডিতের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পন্ডিত তাঁহার অন্ধ সংস্কৃত-ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয় একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে (অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ভাষাকে) যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিল্টন, জনসন প্রভৃতির লাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, তখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে।-----একদল অন্ধসংস্কৃত-ভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাহারা বাংলাদেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র জামিত্রি, ----প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইকবাল, ইন্দুবার, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? এই সকল আরবী পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে

www.pathagar.com

তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন-আদালতে প্রচলিত সর্ব সাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নুতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। -----

যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। ------দীনেশ বাবুর "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের" ন্যায় কে আমাদের এই পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে ?

সে যাহা হউক আমাদের বাংলাদেশের বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী জাতীয়তার গঠনেও যে আমাদের আরবী ফার্সী মিশ্রিত মাতৃভাষা অর্থাৎ মুখের লোক ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষায় যে প্রকৃত জাতি গঠনের কাজ চলিতে পারে না তাহা ইংলণ্ডের লোকনৃত্য ও লোকগীতির প্ররক্ষণ প্রচেষ্টার প্রখ্যাত প্রবর্তক (Cecilsharp) সেসিল শার্পের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও বোধগম্য হইবে।

"বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী অতি মাত্রায় সার্বভৌমিক হয়ে পড়েছে। এই শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বমানব গড়ে তোলা, ইংরেজ মানুষ গড়ে তোলা নয়। কিন্তু আমরা চাই ইংলিশ ম্যান, ইংরেজ, ইংলণ্ডের প্রেমপূর্ণ পৌরজন। শিক্ষা প্রণালীর এই যে দোষ, এটা কি করে নিরাকরণ করা যায় ? এটা নিরাকরণ করবার উপায় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক বালক প্রত্যেক বালিকাকে তার জীবনের অতি প্রাথমিক কাল থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে তার স্বজাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে। স্বজাতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান হচ্ছে স্বজাতীয় ভাষা মাতৃভাষা। স্বজাতীয় ভাষার অথবা মাতৃভাষার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি ব্যাকরণ গঠিত বাক্য বিন্যাস, প্রত্যেকটি অনুপ্রয়োগের (Idiom) মধ্যে নিহিত আছে, যে জাতি সেগুলিকে গঠন করে তুলেছে এবং যে জাতির চিন্তা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ। একটি ইংরেজের সঙ্গে ও একটি ফরাসী বা জার্মেন মানুষের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ফরাসী বা জার্মেন ভাষার ঠিক সেই পার্থক্য রয়েছে। আয়ারলণ্ডের স্বজাতির প্রেমিকগণ এটা বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা যে আইরিশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন তা সম্পূর্ণ সমীচীন।

ভাষা ছাড়া আছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী, যেগুলি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি—এবং তারপর হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় খেলাধূলা

www.pathagar.com

এবং জাতীয় নৃত্য। -------সর্বশেষ আছে, আমাদের জাতির নিজস্ব লোক-সঙ্গীত—যে সহজ সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে আমাদের জাতির মানুষের প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে এবং যার ভিতরে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের জাতির চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরেজ শিশু এইসব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায় তবে সে এখানকার চেয়ে আরো বেশী করে স্বজাতির মানুষদের চিনতে ও বুঝতে পারবে ; এবং সেই চেনবার ও বুঝবার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর সংযোগ তা উপলব্ধি করে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে আদর্শ পৌরজন ও স্বদেশ প্রেমিক হয়ে উঠবে।

সুতরাং ইংরেজী লোকসঙ্গীতের (তথা লোক ভাষা ও সাহিত্যের) পুনঃ প্রচলনের ফলে যারা স্বদেশ প্রেমিক ও যারা শিক্ষানেতা তাদের হাতে একটি মহামূল্যবান শক্তি এসে পড়েছে। জাতির বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে স্বাজাতীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেবল যে দেশের সঙ্গীত ধারার প্রকর্ষ সাধন করবে তা নয়, তাতে করে স্বভূমির প্রতি এমন একটি গৌরব বোধের সৃষ্টি হবে যার অভাবে আমরা আজকাল বিশেষ করে আক্ষেপ করি।" (বঙ্গানুবাদ—শ্রী গুরু সদয় দত্ত, বাংলার শক্তি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

ইংলণ্ডের প্রখ্যাত লোক বিজ্ঞানী (Cecilsharp) সেসিল শার্পের উপরে বর্ণিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে বাংলাদেশের বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বাংলাদেশের লোক-সঙ্গীত তথা লোক ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণকেও পুনর্গঠিত করিয়া বাংলাদেশের বিদ্যালয় সমূহের বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও গণমুখী করিতে হইবে। আর ইহা করিতে হইলে বাংলা ভাষার মূলে যে আরবী ভাষা রহিয়াছে এবং যাহার ফলে এতদ্দেশের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে একটা নিজস্ব আকৃতি-প্রকৃতিরও উদ্ভব হইয়াছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করিতে হইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াই যে ইহা করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কবি রবীন্দ্রনাথও তাই খাঁটি বাংলা ধ্বনি ভিত্তিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিবার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

www.pathagar.com

"বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই। শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণ ভীরু, কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভান্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি ; ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটা স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে এবং সেই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সকল সার্থক হইবে।" (সাহিত্যের সম্ভার)

অনুরূপভাবে অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র ঘোষও বলিয়াছেন—"এটা ঠিক যে বাংলা ভাষার একটা স্বতন্ত্র আত্মা বা প্রতিভা আছে। এর গতি ভঙ্গী সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি নিষেধ মানে না।" (পৃষ্ঠা-১৩৬, বাঙ্গালী, ২য় সংস্করণ)

তাইত প্রকৃত বাংলা ভাষার যে একটি স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে এবং সেই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" রচনার যে অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ও কর্তব্যের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছেন, আজিকার স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কারণেও সেই প্রয়োজনীয়তা ও কর্তব্যের গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

উল্লেখ্য যে "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইচ, জি, ওয়েলস-এর এক সাক্ষাৎকারে-----ওয়েলস বলেছিলেন, মুশকিল বাঁধিয়েছে হাজার রকমের ধর্মে। একটা সর্বজন বোধ্য ভাষা এবং সর্বজন গ্রাহ্য ধর্মমতের যদি প্রবর্তন করা যেত তবেই সকল মানুষ এক করা সম্ভব হত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তা কেন হবে, তাহলে আর আমরা সভ্য হলাম কোথায় ? নানান ভাষা, নানান ধর্ম, নানান রীতি প্রথা থাকলে তবে তো মানব সমাজ 'কালারফুল' হবে। আর এসব বিভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে যদি বিরোধ না ঘটে তা হলেই প্রমাণিত হবে যে, আমরা সুসভ্য হয়েছি। এইখানেই সভ্যতার অগ্নি পরীক্ষা। মনে রাখতে হবে যে দোষ ভাষারও নয় ধর্মেরও নয়, দোষ মানুষের মনের। মনের বিকার সব জিনিসকেই বিকৃত

www.pathagar.com

করে দেখে।" (হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, রাজনীতি, পৃষ্ঠা-১৮, সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮১।)

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—" বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরেরও ভাগ ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙ্গালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।" (পৃষ্ঠা—৪১-৪২, বাংলা ভাষা পরিচয়।)

তথাপি এই ভাষার ঐক্যই যে আমাদের ঐক্যের শেষ কথা নহে এবং এই ঐক্যের মধ্যেও যে অনৈক্যের অর্থাৎ বিভিন্নতার কথা আছে—আর ইহার গুরুত্বও যে এই ঐক্যের অপেক্ষা কোন অংশেই বেশী ছাড়া কম নহে তাহাও রবীন্দ্রনাথ অব্যক্ত রাখেন নাই।

"এই প্রসঙ্গে ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে, সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধশালী ইউরোপীয় চিত্তজয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগের ইউরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেল সেই দিন ইউরোপের বড় দিন। আমাদের দেশেও সেই বড় দিনের অপেক্ষা করব—সবভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"(পৃষ্ঠা-৪৫, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

অনুরূপভাবে বাঙ্গালীত্বের এক বাংলা ভাষার ঐক্যের বেড়া ভেদ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষার রীতি হইতে ভিন্নতর পরিবেশের পরিণতিরও বৈশিষ্টের অধিকারী বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষারীতির মাধ্যমে আপন শক্তি লইয়া প্রকাশ পাইতে পারিলে আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশেরও বড়দিন হইবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের উক্ত বড়দিন বা অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই এক বাংলা ভাষী বাঙ্গালী হইয়া থাকিলেও সেই এক বাংলা ভাষার ঐক্যের বেড়া ভেদ করিয়া আমাদের বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতির আপন বৈশিষ্ট্যও শক্তিতে আমাদিগকেও বাংলাদেশী হইতে হইবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অপরিসীম গুরুত্ব

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ বাবু অন্নদা শঙ্কর রায় বলিয়াছেন—'আমরা শুধু বাঙ্গালী নই, ভারতীয়।'(মোদের গরব মোদের আশা, পৃষ্ঠা-১২৭৭, সাপ্তাহিক 'দেশ' কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭২।)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে আমাদিগকে তাই মানিতে হইবে ও বলিতে হইবে যে, 'আমরা শুধু বাঙ্গালী নই, বাংলাদেশী।' আমাদের এই বাংলাদেশী জাতীয়বাদের অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই আমাদের বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষা রীতির ধ্বনি ভিত্তিক আমাদের নিজস্ব খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা যে এক অপরিহার্য কর্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা করিতে হইলে আধুনিক বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ বলিয়া যে সংস্কৃত প্রধান বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ আমাদের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ও অফিস কাছারিতে চলিতেছে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করিতে হইবে। তা না হইলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কথার কথাই হইয়া থাকিবে। ফলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

সরিষাতে ভূত !

কথায়ও বলে, সরিষাতে যদি ভূত থাকে তবে সে সরিষার দ্বারা ভূত তাড়ান যায় না। আমাদের লেখা পড়ায় আজ পর্যন্ত যে পশ্চিম বঙ্গীয়, সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষা চালু রহিয়াছে তাহাতে আমাদের বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষা ইতর ভাষা বলিয়া বর্জিত হইয়া থাকে, আর ভারতের অতীব সংখ্যা লঘিষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গের ও তস্য অতীব সংখ্যা লঘিষ্ঠ কলিকাতার ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদী পণ্ডিত সমাজের কল্পনার সৃষ্টি সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষা ভদ্রলোকেরও শিক্ষার ভাষা বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে। তাই এই সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষা দ্বারাও যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, স্বাধীন বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের উপরে এই ভাবেই ভিন্ন রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যা লঘিষ্ঠ মানুষের ও তস্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদী পণ্ডিত সমাজের আধিপত্যই বজায় থাকিয়া প্রকারান্তরে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আজ পর্যন্তও যে অবজ্ঞা, উপহাস ও অপমান করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিতেছে তাহা আর কে না বুঝিবে।

সঙ্গত কারণেই প্রচলিত সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণকে বাতিল করিয়া তদস্থলে বাংলাদেশের অতি বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গীয় ধ্বনি ভিত্তিক বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চালু করিতে হইবে। কিন্তু এই সত্যকে কার্যে পরিণত করিবে কে ? Who will bell the cat, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে ? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদী কলংকে কলংকিত সংস্কৃত ভাষারূপী কালো বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে ? সে লোক কই ? এই প্রশ্নের উত্তরে, কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ; কেন আমাদের ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগ ও বাংলা একাডেমী তো রহিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমাদের ইউনিভার্সিটি ও বাংলা একাডেমীর সকল কর্তৃপক্ষই এতদ্বিষয়ে এ যাবৎকাল আমাদের নিরাশই শুধু করেন নাই, এমন কি এই সত্যের অনুসন্ধান করাও কর্তব্য জ্ঞান করেন নাই। অধ্যাপক রবার্ট হাচিনস-এর নিম্নে বর্ণিত মন্তব্য ইউনিভার্সিটির কর্তব্য যে কি তাহা নির্দেশ করিতেছে—"Freedom of enquiry, freedom of discussion, freedom of teaching—without these a university can not exist. The university exists only to find and to communicate the truth. If it can not do that, it is no longer a university."

এতদসত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি ও বাংলা একাডেমী আজ পর্যন্ত সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষাকে লালন করিয়া প্রকারান্তরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের যে সমূহ ক্ষতিই সাধন করিতেছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"যেরূপ জ্ঞান উপার্জন করিলে, বুদ্ধি মার্জিত হয়, ভ্রম ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং জগতের প্রকৃত প্রণালী অবগত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ পূর্বক নিজের ও জনসমাজের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায় সেই রূপ জ্ঞান শিক্ষাই কর্তব্য। ভ্রম, কল্পনা ও কুসংস্কার সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্বস্থানে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী, ফরাসী অথবা জার্মেন ভাষায় সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞান লাভ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষণীয় অল্পই বিষয় আছে।------- জ্ঞান রত্নের আকর স্বরূপ পূর্বোক্ত তিনটি ভাষার একটি শিক্ষা করিবার উপায় থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ উদ্দেশ্যে অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ ও আয়ু-ক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" (পৃষ্ঠা-৩২-৩৩, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ১৮০৪ শকাব্দ।)

"এ দেশের সংস্কৃত শিক্ষার ধারায় যে নিষ্প্রাণ তার্কিকতা ও হৃদয়হীন আচারান্ধতা দৃঢ়মূল হয়েছিল তার প্রতিবিধানের জন্য গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষণ বিষয়ক মনোভাবের আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক পত্রে এ অপরিহার্যতার স্বরূপ উদঘাটিত

www.pathagar.com

হইয়াছিল। রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন-"If it had been intended to keep the British Nation in ignorance of real kuowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of schoolmen which was best calculated to perpetuate ignorance.In the same manner, the Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature." (পৃষ্ঠা-৭২, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী ভূদেব চৌধুরী, ২য় পর্যায়, ২য় সংস্করণ।)। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ সরকার রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা বর্জনের সুপারিশের প্রতি গুরুত্ব না দিয়া ইংরেজের রাজনৈতিক স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ধারাকেও প্রবর্তন করিয়া এ দেশবাসীকে চির অন্ধকারেই নিক্ষেপ করিল। যাহার বিষময় ফল আজ পর্যন্তও আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে।

পক্ষান্তরে রামমোহন রায়, এতদ্দেশে সংস্কৃত শিক্ষা বর্জন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য সুপারিশ করিতে যাইয়া যে মনীষী বেকনের দর্শনের দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে মনীষী বেকনের গুণগান করিয়াছেন বলিতে হইবে, সেই মনীষী বেকন কিন্তু ইংরেজী অপেক্ষাও আরবী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করাকেই অধিকতর শ্রেয় ; বিবেচনা করিয়াছেন দৃষ্ট হয়—"Roger Bacon was great admirer of Arabic science. He advised his students to abandon the scholars of Europe for those of the Arabic Spain." ইহা হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় আরবী ভাষা যে অপর যে কোন ভাষা অপেক্ষা অধিকতর কার্যোপযোগী তাহা বুঝিতে আর বেগ পাইতে হয় না। সঙ্গত কারণেই ইতঃপূর্বে বর্ণিত আরবী মূলীয় খাঁটি বাংলা শব্দও যে আরবীর মতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সার্থক ভাবেই কার্যকর হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিবেন। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে প্রচলিত ভাষায় অনেক আরবী শব্দ রহিয়াছে। তাই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষায় যে সহজেই এবং সার্থকভাবেই বিজ্ঞান চর্চা চলিতে পারে তাহা যেমন সহজেই ধারণা করা যায় তেমনি ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতেও তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

"বাহাসা ইন্দোনেশিয়া চলতি মৌখিক ভাষার শব্দ সম্ভার অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করে ফেলেছে।"(সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা-৭, সাপ্তাহিক 'দেশ', কলিকাতা, ২৬শে মে, ১৯৭৯)

www.pathagar.com

সঙ্গত কারণেই আমরা কি প্রকারে যে বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের ও সার্থকতার সহিত আমাদের বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষাকে আমাদের সর্বপ্রকার কাজে লাগাইতে পারি তাহার উপায়ও এই উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস ও ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাহার জীবিত কালেই নির্দেশ করিয়া দিয়া আমাদের সমগ্র বাংলাদেশবাসীকে এক অপরিসীম ও অপরিশোধ্য চির ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ইউনিভার্সিটি ও বাংলা একাডেমী সে উপায় অবলম্বন করিলে যথা শীঘ্র সম্ভব আমাদের জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আর কোন অসুবিধাই হইবে না। উপরন্তু দেশের নিরক্ষরতা অতি সত্ত্বর দূরীভূত হইয়া এদেশবাসীও অতি সত্ত্বর বাংলাদেশের জ্ঞানবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নির্দেশিত উপায়

"আমরা সংস্কৃতের অন্ধ অনুসরণে বাংলা বানানে বিষম বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছি। বাংলা অক্ষরের সংস্কার দ্বারা বানানের সংস্কার অনেকটা হইবে ; হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের এবং নত্ব ষত্বের বাঁধা কাটিয়া যাইবে। ----পালি ও প্রাকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হয়। ----বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করে। এই যুক্তাক্ষরের জন্যই টাইপ রাইটার লিনোটাইপ ও ছাপার কাজে বড় বিঘ্ন হয়।---যুক্তাক্ষরগুলি শিক্ষার্থীদের রীতিমতো গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করে।---যুক্তাক্ষরের পরিবর্তে হসন্ত এবং ধ্বনি সম্মত বানান ব্যবহার করিলে লেখা-পড়া ছাপার কাজ Roman Script অপেক্ষা সহজ হইবে।

এখন ভাষার কথা। সকলেই জানেন ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য ভাব গোপন করিবার জন্য নয়। অভিধান হইতে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না। প্রয়োজনীয় শব্দ সমাজের যে কোন স্তর হইতে সংগ্রহ করা চলিবে। পূর্ববঙ্গের সুপ্রচলিত কোনও শব্দকে বাদ দেওয়া হইবে না। যেখানে উপযুক্ত ভাব প্রকাশের জন্য শব্দের অভাব হইবে, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী বা ইংরেজী হইতে শব্দ চয়ন করা চলিবে, যদি সেগুলি সহজ বোধ্য হয়। প্রতি শব্দ গদ্য রচনায় বর্জন করিতে হইবে। ইংরেজীতে hand, foot, water, fire প্রভৃতি শব্দের প্রতি শব্দ না থাকিলেও ভাব প্রকাশের অসুবিধা হয় না, বাংলাতেও হইবে না।------এইরূপ বাংলা অক্ষর বানান ও ভাষার সংস্কার করিয়া আমরা সহজ বাংলার প্রচলন করিতে চাই। ইহার ফল হইবে এই যে, যেখানে কেবল বর্ণ (অর্থাৎ অক্ষর) পরিচয়েই দুই মাস লাগে সেখানে দুইমাসে নির্ভুলভাবে বাংলা লিখিতে পড়িতে পারা যাইবে; ফলে অল্প আয়াসে

www.pathagar.com

ও অল্প সময়ে বাংলাদেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিয়া প্রত্যেক বাংলা ভাষীকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জ্ঞানবান নাগরিক রূপে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে।

আমরা নীচে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার প্রথম গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া সহজ বাংলায় তাহার রূপ দেখাইব।

সাধু বাংলা

একদা এক শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফল সকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত শৃগালের লোভ জন্মিল। কিন্তু ফল সকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল, সুতরাং ঐ ফল পাওয়া শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে ফল প্রাপ্তির বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

সহজ বাংলা

অ্যাক শময় অ্যাক শীয়াল আঙুর‍্যর খ্যাত্য ঢুকীয়া ছীলী । আঙুর ফল খুব মীঠা। পাকা পাকা ফল দ্যখীয়া ওই ফল খাইবার জন্ন শীয়াল্যর লৗভ হইল। কীনতু ফল সকল খুব উচুত্য ঝুলীত্য ছীলী । কাজ্যই ওই ফল পাওয়া শীয়াল্যর পক্খ্য শহজ নয়। লৗভ্যর বশ্য ফল পাড়ীবার জন্ন শীয়াল অন্যক চ্যশটা করীলী ; কীনতু কৗনও রকম কাজ হাশীল করীত্য পারীলী না। শ্যশ কাল্য ফল পাওআ শম্বন্ধ্য নীতান্ত নীরাশ হইয়া এই বলীত্য বলীত্য চলীয়া গ্যাল আঙুর ফল বড়ৗ বীরশ আর ব্যজায় টক।

আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার সিলহেটি নাগরীর সহিত আশ্চর্যজনক রূপে মিলে। বলা বাহুল্য সিলহেটি নাগরী ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব হইতেই সিলহেটে সাধারণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। সিলহেটি নাগরীতে স্বরবর্ণ—আ, ই, উ, এ, ঐ, ও, আকার ইকার প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের পরে হয়। ইকার দীর্ঘ ঈকারের মত লেখা হয়। ব্যঞ্জন বর্ণে ঙ, ঞ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ঢ়, স, ষ, ঃ নাই। (পৃষ্ঠা-৪৬–৪৮, আমাদের ভাষার রূপ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কামরুল আহসান এণ্ড ব্রাদার্স, ৩১/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।)

সে যাহা হউক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বৃহত্তম জনসমাজের বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনেই উপরে উল্লেখিত সহজ বাংলার প্রচলন করিতে হইবে এবং আইনের সাহায্যে সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়াই তাহা করিতে হইবে। স্মরণীয় যে "১৭৭৮

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী ও পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতী করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী পারসী নিষুদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে (সংস্কৃত প্রধান) বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। (পৃষ্ঠা-১২২, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী সজনী কান্ত দাস, ১ম খণ্ড।)

সঙ্গত কারণেই আইনের সাহায্যে সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়াই যে বর্তমানে সহজ বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে, তাহা সকলেই বুঝিবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার, সার্বভৌমত্বের, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের, গণতন্ত্রের ও জনগণের প্রতি আমাদের যদি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সরকারী আইনের সাহায্যে অভিজাততন্ত্রের সংস্কৃত প্রধান আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়া তদস্থলে উপরে বর্ণিত গণতন্ত্রের সহজ বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন করিতে আমাদের কোন বাঁধা বা দ্বিধা দ্বন্দ্বই থাকিতে পারে না। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত উক্তিটিও সবিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য—

"ঢাকাই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত, তবে একদিন নিশ্চয়ই ঢাকার লোক ভাষার ওপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনি সিধা হইয়া যাইত। মান ভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।"

আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে যে ঢাকা বর্তমানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী হইয়া রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মতানুসারেও আমাদের যথা কর্তব্যের তথা বাংলাদেশী জাতীয়তার পথ ও দিক নির্দেশ করিতেছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৬

দ্রাবিড় জাতির রহস্য

ঐতিহাসিকগণ এতদ্দেশের প্রচীন অধিবাসীদের কথা বলিতে প্রায়শই দ্রাবিড় জাতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্রাবিড় বলিতে কি বা কাহাদিগকে বুঝিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন আলোকপাত করেন না বিধায় দ্রাবিড় জাতি এ যাবৎকাল একটি রহস্য হইয়াই রহিয়াছে। এই রহস্য উন্মোচন করিয়া দ্রাবিড় জাতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা দিবার জন্য এতদস্থলে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হইতেছে।

"ডক্টর আব্বস ফারুকীর "The Bahrain Islands" পুস্তকে দেখা যায় আরব ইতিহাস অনুসারে দিলমুনরা খামুদ গোত্রের মানুষ। বাবিলনীয় উৎকীর্ণ লিপিতে তাহাদের তিলমুন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিলমুনদের সুমেরীয় নাম 'নিতুক-কি' তবে নিতুক-কির সহিত সুমেরীয়ায় বাহরাইনের অধিবাসীরা দিলমুন নামেও অভিহিত হইত। তখনকার দিনে বাহরাইনের রাজধানী ছিল তিলমুন।" (পৃষ্ঠা—২৩, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মুহাম্মদ সুফিয়ান।)

আরবের উক্ত দিলমুন তিলমুন নামে অভিহিত জাতিই যথাক্রমে এতদ্দেশে কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় দামিল, দাক্ষিণাত্যের তামিলদের ভাষায় তামিল এবং সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, দিলমুন, তিলমুন, দামিল, তামিল ও দ্রাবিড় শব্দগুলির ঐক্য ও সাদৃশ্য হইতে। ইহা হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে দ্রাবিড় জাতি আদৌ আরব ভূখণ্ডেরই অধিবাসী ছিল এবং আরবী ভাষীও ছিল। দাক্ষিণাত্যের তামিলদের ভাষার এমন কি অক্ষরেরও মূল যে সেমিটিক (Semitic) তাহা The Indian History Congress ও ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং K. A. Nila Kantha Shastri সম্পাদিত "Comprehensive History of India" Vol. II (325 B.C-A.D 300) গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭৯ পৃষ্ঠায় Frederick Bodomer-এর Loan of Language গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া যে বলা হইয়াছে তাহাতেও দ্রাবিড় জাতি যে আদৌ আরব ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং সেমিটিক আরবী ভাষীও ছিল তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এই পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায়ও ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে "Arabia was the cradle land of the Samitic race. etc." (History of the Arabs, Page-19) তবে উপরের উদ্ধৃতিতে দিলমুন অর্থাৎ দ্রাবিড়দিগকে যে খামুদ

www.pathagar.com

গোত্রের মানুষ বলা হইয়াছে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে দ্রাবিড় জাতি মূলত আরবের অধিবাসী ও আরবী ভাষী হইলেও প্রকৃত আরব অধিবাসীদের হইতে তাহাদের গোত্র আলাদা ছিল। সেই জন্যই মিসর ও মেসোপটেমিয়ার আরব্য সভ্যতা হইতে তাহাদের দ্রাবিড় সভ্যতা ও ভিন্ন সভ্যতা ছিল। আরবের দাহরান, বাহরাইন ও কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে যে রহস্যময় আলাদা দিলমুন অর্থাৎ দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও উপরিউক্ত সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে।

"দাহরান (সৌদি আরব) ২১শে এপ্রিল, ১৯৮৭ (রয়টার)—একদল প্রত্ন তত্ত্ববিদ সৌদি আরবের পূর্ব উপসাগরীয় বন্দর দাহরানের দক্ষিণে ৫ হাজার বৎসরের অর্থাৎ ৩ হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দের প্রাচীন শিল্প কর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসব শিল্প কর্ম আবিষ্কারের ফলে আরব অববাহিকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে নূতন আলোকপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

- প্রত্ন তত্ত্ববিদ দলের প্রধান আল মুঘান্নাম রয়টারকে জানান, খৃষ্ট পূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বেকার কবরস্থানে এই সকল শিল্প কর্ম পাওয়া যায়। একই সময়ে নিকটবর্তী বাহরাইনের দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক দিলমান (অর্থাৎ দিলমুন) জনগোষ্ঠী বাস করিত। বর্তমান আবিষ্কার মধ্যপ্রাচ্য ও উপমহাদেশের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে আরব অববাহিকার কি সম্পর্ক ছিল তাহা নির্দ্ধারণে সহায়ক হইতে পারে। বাহরাইনে আবিষ্কৃত তথ্যে দিলমানকে (অর্থাৎ দিলমুনকে) ৫ হাজার বৎসর পূর্বের ব্যবসায়ী বলিয়া চিহ্নিত করা হইলেও তাহাদের সঠিক পরিচিতি এখনও সুস্পষ্ট নয়।" (পৃষ্ঠা-৩, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৬; ৯ই বৈশাখ, ১৩৯৩, ঢাকা।)

সে যাহা হউক পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে আরবের দিলমুন ও তিলমুনরা এবং দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তামিলরা মূলতঃ একই সেমিটিক গোত্রের লোক। তাই দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তামিলরা যে আরবের দিলমুন ও তিলমুনদেরই অধস্তন বংশধর তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়। আর দাক্ষিণাত্যের দামিল বা তামিলদের নাসিকার প্রশস্ত অগ্রভাগ দৃষ্টে ধারণা হয় যে তাহাদের মূল পূর্ব পুরুষ বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনদের নাসিকার অগ্রভাগও প্রশস্ত ছিল। ইহাতে আরও ধারণা হয় যে বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনরা হয়ত আদিতে আরব ও আফ্রিকার একটি সংমিশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নিদর্শন প্রণিধানযোগ্য।

"Who, then, are the Dravadians ? What racial offinity have they with the populations out side India ? How did they came ? After much controversy, it is now, I believe generally

www.pathagar.com

agreed that the main racial element in the Dravadian population is a branch of the Mediterranian race---the Mediterranian races probably came from East Africa whence some of them wandered via Arabia and South Persia to India." (The Dravadian Element in Indian Culture, H. J. Fleure.)

অথচ এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বাংলাদেশবাসী ও বাঙ্গালীদিগকে দ্রাবিড় জাতি সম্ভুত একটি জাতি বলিয়া এ যাবৎকাল যে সাব্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন ইহা যে সম্পূর্ণরূপে ভুল তাহা নিম্নবর্তী আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

অধ্যাপক বিজয় চন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন—"আর্য সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব সময় হইতে বঙ্গ নামে দ্রাবিড় জাতির একটি রাজ্য ছিল এবং সে দেশ হেয় বা হীন বীর্য ছিল না। ইহারা এখন বিদ্যা বুদ্ধিতে এবং চরিত্র গৌরবে কাহারো অপক্ষো হীন নহেন। সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আর্য দ্রাবিড় মিশ্রিত। কাজেই একমাত্র আর্যের কথায় ভারত ইতিহাস আরব্ধ বা শেষ হইতে পারে না। দ্রাবিড় কাহিনী ভারত ইতিহাসের মুখ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"(পৃষ্ঠা-৪৩৩, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, মাসিক 'নব্য ভারত,' কার্তিক, ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা।)

এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে অধ্যাপক বিজয় চন্দ্র মজুমদার বঙ্গ নামে দ্রাবিড় জাতির একটি রাজ্য ছিল বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্রাবিড় জাতির না হইয়া আরব জাতির একটি রাজ্য যে ছিল তাহা হিন্দু সম্প্রদায়ের 'দশ কুমার চরিত' গ্রন্থে উল্লেখিত বিবরণ হইতেও প্রতিপন্ন হয়। তবে উল্লেখ্য যে বঙ্গদেশে কিছু দ্রাবিড় থাকিলেও তাহারা যে সংখ্যা গরিষ্ঠ আরবদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—

"পুরাতন তামিল গ্রন্থে নাগপূজক চের জাতির কথা আছে। নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে----তামিলকম দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের, পাঙ্গালা থিরইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উত্তর পশ্চিম পাঙ্গালা হইতে দক্ষিণ ভারতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে। পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। চীন দূত মাহুয়ান তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে কুড়িটি রাজ্যের বিবরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালারও একটি বিবরণ দিয়াছেন। বাঙ্গালাকে তিনি "পাঙ্কোলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুপ্রাচীন তামিলদের 'পাঙ্কালা' ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের 'পাঙ্কোলা' অভিন্ন।"

www.pathagar.com

(বাঙ্গালীর ইতিহাস, শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৮, ৫ম সংখ্যা, ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড।) উক্ত প্রবন্ধে আরও উল্লেখিত হইয়াছে, "তখন তাহারা (অর্থাৎ আরবরা) এত বেশী ছিলেন যে, তাহারা----দ্রাবিড় অধিবাসীদের তাড়াইয়া দেন।"

"দশ কুমার চরিত" গ্রন্থে এতদ্দেশে আরব জাতির বসতির প্রমাণ

এতদ্দেশীয় হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের "দশ কুমার চরিত" গ্রন্থে উল্লেখিত বিবরণে এতদ্দেশে অবস্থিত যবন দ্বীপ, যবন জাতি এবং যবন পোতের যে উল্লেখ রহিয়াছে, ঐ সমুদয় যে জগতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব কালের প্রাচীন আরব জাতি গোষ্ঠীর নাম যথাক্রমে আরব দ্বীপ, আরব জাতি ও আরব পোতের প্রতিই সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাহা নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যে উল্লেখিত বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী এইচ, এইচ, উইলসনের বিবেচনা হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

"দশ কুমার চরিতের প্রথম ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কাল যবন-দ্বীপ এবং ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে যবন ও যবন পোতের প্রসঙ্গ আছে। হ. হ. উইলসন ঐ যবন-জাতি, যবন-পোতকে আরব জাতি ও আরব পোত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। H.H.Wilson's Introduction to the Das Kumar Charita reprinted in his essays, Vol. 1, 1864, P. 321." (পৃষ্ঠা-১১৫, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ।)

দ্বিতীয়তঃ উক্ত যবন শব্দটি লিখিতে বর্গীয় "জ" দিয়া না লিখিত হইয়া, অন্তস্থ "য" দিয়া যে যবন শব্দটি লিখিত হয় তাহাতে শব্দটির মধ্যে আরব জাতির নামের অস্তিত্ব যে প্রকৃতপক্ষেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়। যেমন—যবন>য়বন> য়মন>য়্যামন> ইয়ামন> ইয়েমেন (আরব জাতি অধিবাসিত একটি আরব রাজ্য।) আর উক্ত যবন শব্দটির 'য' অক্ষরটি সংস্কৃত ভাষায় 'য়' রূপেই যে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"সংস্কৃতে 'য' কারের উচ্চারণ প্রায় 'ইয়' অর্থাৎ ইংরেজী young শব্দের 'y' বর্ণের অনুরূপ।" (পৃষ্ঠা-১৭, ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত)

অতএব উক্ত 'দশ কুমার চরিত' যেহেতু সংস্কৃত গ্রন্থও বটে সেহেতু উহাতে উল্লেখিত যবন শব্দের 'য' কারের উচ্চারণ যে সংস্কৃত ভাষার

www.pathagar.com

রীতি অনুসারেও ইংরেজী young -এর 'y' বর্গের অনুরূপ 'ইয়' রূপেই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই থাকিতে পারে না।

ইহা ছাড়া যবন শব্দের মধ্যস্থিত ব এবং (ইয়েমেন) ইয়ামন> য়্যামন> য়মন> য়মন শব্দের মধ্যস্থিত ম যেহেতু একই প বর্গের অন্তর্ভুক্ত শব্দ, সেহেতু য়মন শব্দের ম ধ্বনির স্থলে 'ব' ধ্বনি ও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাই যবন শব্দটি যে আরব রাজ্য ইয়েমেন> ইয়ামন> য়্যামন> য়মন নাম শব্দেরই বিকৃত রূপ তাহা অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত 'দশ কুমার চরিত' গ্রন্থে প্রাচীন কালে এতদ্দেশে কাল যবন দ্বীপ, যবন জাতি এবং যবন-পোতের অবস্থিতির তথা অস্তিত্বের যে কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাহাতে এতদ্দেশে যথাক্রমে আরব জাতির অধিবাসিত দ্বীপ, আরব জাতির মানুষ এবং আরব বণিক ও নাবিকদের আরব সামুদ্রিক পোতের অবস্থিতির ও অস্তিত্বেরই অকাট্য প্রমাণ মিলে।

তথাপি আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক শ্রেণীর লোক তাহাদের চরম অজ্ঞতা এবং তদুপরি তাহাদের ঘোরতর ইসলাম ধর্ম বিদ্বেষের কারণে ঘোরতর আরব জাতি বিদ্বেষ বশতঃ উপরিউক্ত 'যবন' বলিতে আরবের ইয়েমেন তথা অন্যান্য আরব রাজ্যের আরব জাতিকে না বুঝিয়া শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের গ্রীক ও রোমক জাতিকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন। কিন্তু গ্রীক ও রোমকগণ সামুদ্রিক বাণিজ্য কিছুকাল যা একটু করিয়াছিল তাহাও করিয়াছিল প্রাচীন কালের আরব বণিক ও নাবিকদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে; নিজেরা সোজাসুজি কখনও কোন প্রকারেই তাহা করে নাই। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে এই সত্য দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

"Although the term Javanas mean westerners in general, in this context (in a Tamil poetry)—westerners who sail in with gold and leave with pepper—it can only refer to merchants from Roman Egypt---(date from the second to third century AD)----

A small excavation carried out at kodungalur (cragnamore) uncovered Chinese and Arab wares but no Roman.' (Page-296, The Periplus of the Erythraean sea, Lionel Casson).

অর্থাৎ যবন শব্দটি যদিও সাধারণতঃ পাশ্চত্য জগদ্বাসী বুঝায়, এই প্রসঙ্গে একটি তামিল কবিতায় উল্লেখিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর সময় কালে পাশ্চাত্য জগদ্বাসী যাহারা সোনা লইয়া আগমন করিত এবং গোল মরিচ লইয়া চলিয়া যাইত, ইহা কেবল মাত্র রোম শাসিত

www.pathagar.com

মিসরের বণিকদিগকেই নির্দিষ্ট করে।..........কোদাঙ্গালো-র (ক্রাগনামোর) এ একটি ক্ষুদ্র খনন কার্য পরিচালনার ফলে চীনা এবং আরব পণ্যদ্রব্যসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু কোন রোমক পণ্যদ্রব্য নহে।

উপরের উদ্ধৃতিতে রোম শাসিত মিসরের বণিক বলিয়া যাহাদের নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে মিসরেরই অধিবাসী আরবী ভাষা ভাষী বণিক সম্প্রদায় তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া, আরবের ইয়েমেন ও সাবা রাজ্যের আরবী ভাষা ভাষী বণিক সম্প্রদায় যে বাংলা পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনা করিত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

"Yemen of Arabia was a great centre of trade from 1000 B.C. At first the sabians were the leaders and immensely rich. Trade of Yemen with Egypt was in full swing till 2500 B. C. and with India till 1000 B. C.

Even under the Ptolemies the Egyptians never traded with India direct. The large Sabian ships would visit the Red aea, Persian gulf, the African coast and the north of Indus. The Periplus states Aden was the centre of trade." (Dr. Taylor)

অর্থাৎ ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব কাল হইতে আরবের ইয়েমেন ছিল এক বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রথমে সাবা রাজ্যের অধিবাসীরাই নেতা ছিল এবং অত্যন্ত ধনী ছিল। ২৫০০ খৃষ্টপূর্বকাল পর্যন্ত মিসরের সহিত এবং ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব কাল পর্যন্ত ভারতের (অর্থাৎ বাংলা পাক-ভারতের) সহিত ইয়েমেনের বাণিজ্য সম্পর্ক পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

এমন কি গ্রীক টলেমিদের শাসনাধীনেও মিসর ভারতের (অর্থাৎ বাংলা পাক-ভারতের) সহিত কখনও সোজাসুজি বাণিজ্য করে নাই। আরবের সাবা রাজ্যের বৃহৎ জাহাজের বহর লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, আফ্রিকার

---

1. Sabian—one of an ancient people of the kingdom of Saba in South west of Arabia in the first millenium B.C. noted for their commerce and their wealth.

* Saba—The old testament name Sheba for a region of the South west Arabian peninsula, corresponding to Modern Yemen. (Page-1157, New International Dictionary, Funk & Wagnalls.)

* Ptolemies—Dynastic name of 14 Greek Kings of Egypt.

* Ptolemy 1,........King 323-285 B.C; a general of Alexander the great, founded the dynasty called " Soter" (Page-1019, Ibid.)

www.pathagar.com

উপকূল এবং সিন্ধুর উত্তরে (বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে) যাতায়াত করিত। পেরিপ্লাস বিবৃত করে যে আরবের এডেনই ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র। আরবের সাবা রাজ্যের সাবা জাতির বৃহৎ জাহাজের বহর যে বাংলাদেশেও আগমন করিত উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে উক্ত সাবা জাতির নামানুসারে বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে অবস্থিত সাভার নামক স্থানের সাভার নাম শব্দটিতে। যেমন—সাবা (জাতি)+ উর (মেসোপটেমিয়ার নদী-বন্দর "উর" নাম হইতে বন্দর বুঝাইতে ব্যবহৃত)> সাবাউর> সাবাআর> সাবার> সাভার (বর্তমান নাম)।

জেমস টেইলারও উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে আরবদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে আগমনের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের স্থানীয় নাম শব্দের মধ্যে উহার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে দক্ষিণ আরবের সাবা জাতির বাণিজ্যে লিপ্ত লোকেরা তৎকালে সমুদ্র যখন আরও নিকটবর্তী ছিল তখন সাবা জাতির নামানুসারে বাংলাদেশে সাবাউর নামে যে সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরের পত্তন করে উহাই বর্তমানে সাভার নামে পরিচিত। (James Taylor : Remarks on the sequel to Periplus of the Erythraean Sea, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 16, 1847, Page-76.)

বাংলাদেশী বাঙ্গালী ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের চেহারার পার্থক্য

উল্লেখ্য যে আরবদের বাসস্থান যেমন আরব দেশ, তেমনি দ্রাবিড়দের অধিষ্ঠান ভূমিও আরবের বাহরাইন ও দাহরানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই আরব ও দ্রাবিড় জাতি একই আরব দেশের অধিবাসী এবং জাতিগতভাবেও উভয়েই একই সেমিটিক জাতীয় লোকও বটে। এতদসত্ত্বেও উভয়ে এক নহে। কেননা, নির্ভেজাল খাঁটি আরবরাই আরব জাতীয় লোক। আর আরব ও আফ্রিকার সংমিশ্রিত জাতীয় লোকেরাই দ্রাবিড়। উভয়ের চেহারাতেও এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বাংলাদেশী বাঙ্গালী ও দাক্ষিণাত্যের খাঁটি দ্রাবিড় তামিল দামিল (কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখিত) জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মুখের চেহারার গঠনে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে সহজেই ধরিতে পারা যায় যে, উক্ত বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় জাতি সম্পূর্ণ রূপেই দুইটি ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোক। বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় তাই একই নৃ-জাতি নহে। দ্রাবিড় বলিয়া চিহ্নিত ও আখ্যায়িত উক্ত তামিল দামিলদের মত চেপ্টা, প্রশস্ত ও উপরের দিকে বসা নাক বাংলাদেশবাসী

www.pathagar.com

সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙ্গালীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না বিধায় বাংলাদেশী সংখ্যা গরিষ্ঠ মূল জনগোষ্ঠীকে কোন প্রকারেই দ্রাবিড় বলিয়া গণ্য করা যায় না। এতদ্ব্যতীত, দ্রাবিড়দের তামিল ভাষার সহিত উক্ত বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষার কিছুটা ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও তামিল ভাষা ও বাংলা ভাষা উভয়েই যার যার স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের কারণেই যে একই ভাষা না হইয়া দুইটি পৃথক ভাষা হইয়া রহিয়াছে তাহাতেও দ্রাবিড় ও বাঙ্গালী যে এক ও অভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোক নহে তাহা অধিকতর ভাবেই প্রতিপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত উল্লেখ্য যে মূলত আরব সেমিটিক হইলেও আরবদের মধ্যেও যে বিভিন্নতা রহিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও স্পষ্ট হইবে—"Unlike any other people, Arabs share a heritage that is part nomadic, part peasant, part European and part oriental. There is a bewildering range of sub cultures sheltered within the Arab world." (Page-16, The Arabs, People and Power, Editor, Frank Gibney.) সঙ্গত কারণেই মূলতঃ সেমিটিক হইলেও দ্রাবিড় ও বাঙ্গালী এক জাতি হইতে পারে নাই এবং পারেও না।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৭

বেঙ্গলী ডিভিশন—বাঙ্গালী জাতি

(একটি স্বতন্ত্র নৃ-জাতি)

দ্রাবিড় ও বাঙ্গালীর মধ্যে উপরে বর্ণিত ঐরূপ শারীরিক ও ভাষাগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই নৃ-তত্ত্ববিদ (H. H. Risley) রিজলী বাংলাদেশের বাঙ্গালীদিগকে (Bengali Division) বেঙ্গলী ডিভিশন বলিয়া দ্রাবিড়দের হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। "বিহারের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গা ও ইহার শাখা নদীর ব-দ্বীপে যে সমস্ত জাতি বাস করে রিজলী সাহেব তাহাদিগকে-----Bengali Divison এই পৃথক আখ্যা দিয়াছেন।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৮, ৫ম সংখ্যা, ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড।)

নৃ-তত্ত্ববিদ (H. H. Risley) সাহেব বাংলাদেশবাসী বাঙ্গালীদিগকে প্রকৃত দ্রাবিড় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে ব্যর্থ হইয়াই যে দ্রাবিড় জাতি হইতে সম্পূর্ণ রূপেই পৃথক (Bengali Divisian) বেঙ্গলী ডিভিশন বলিয়া উক্ত বাঙ্গালীদের পৃথক নৃ-জাতিত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের বাঙ্গালীদিগকে বেঙ্গলী ডিভিশন আখ্যা দিয়া বাঙ্গালীদিগকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করিবারও কারণ, বাঙ্গালীদের শারীরিক গঠনেরও চেহারার তো বটেই, এমন কি ভাষারও স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের এই স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ঐক্য ও সাদৃশ্যের সন্ধান মিলে আরবদেশের আরব জাতির মধ্যে। আরবের অধিবাসী আরব জাতির মত শারীরিক গঠন, অনেকটা পানের আকৃতির মুখের গঠন তথা চেহারায় খাড়া বা কিছু কম বেশী খাড়া ও টিকলো বা ঈগলাকৃতির সরু নাসিকাগ্রভাগ বাংলাদেশবাসী বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে সর্বত্র ও সর্বদাই দৃষ্ট হয়। ইহাতে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান যে মূলতঃ এক ও অভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক তাহা যেমন সহজেই ধরা পড়ে ; তেমনি মূলতঃ পূর্ব বর্ণিত প্রাচীন সেমিটিক আরব জাতি সম্ভূতই একটি স্বতন্ত্র নৃ-জাতি তথা সেমিটিক দ্রাবিড় জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপেই যে পৃথক একটি জাতি তাহা নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে—'মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হইতে নৃ-তত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি-----আর্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত যুক্তি যুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। (পৃষ্ঠা-১৩-১৪, বাঙ্গালার ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ৫ম সংস্করণ।)

সে যাহা হউক ভাষাগত পার্থক্যের কারণেও বাঙ্গালী ও দ্রাবিড় দুইটি পৃথক জাতি বলিয়া যে কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ্য যে ভাষা বিশ্লেষণের দ্বারাও যে জনতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে তাহা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের ভাষ্যেও স্পষ্ট—"বাঙ্গালীর জনতত্ত্ব নিরূপনের কিছুটা সহায়ক উপায় বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ। ----কোনও জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি লেখা যায় সেই ভাষার জীবন চর্চার মূল শব্দগুলি কিংবা পদ রচনা রীতি কিংবা পদ ভংগি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্য কোনও জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত তখন স্বভাবতই এ অনুমান করা চলে যে, সেই পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে---- মেলামেশা ঘটিয়েছে। ----যাহাই হউক, ভাষা বিশ্লেষণের ঈঙ্গিত নর-গোষ্ঠীর------নিরূপনে অনেক খানি সাহায্য করিতে পারে। আর সেই ঈঙ্গিতের মধ্যে যদি নরতত্ত্ব বিশ্লেষণ লব্ধ ঈঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূরক সাহায্য হিসাবে জন তত্ত্ব নির্ণয়ের কাজেও লাগিতে পারে।"(পৃষ্ঠা-৩১, বাঙ্গালীর ইতিহাস।)

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বাংলা ভাষার কথায় বলিতে হয় যে বাংলা ভাষায় অনেক আরবী শব্দ রহিয়াছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে এতদ্দেশে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মুসলমান শাসনের ফলেই বাংলা ভাষায় এত সমস্ত আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ঠিক নহে। এতদ্দেশে মুসলমান শাসনের, এমন কি জগতে মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব হইতেই এতদ্দেশে আরবী শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বকালে প্রাচীন আরব বণিক ও নাবিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্য উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমনের তথা এতদ্দেশে উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়া বসবাসের ফলে। এই অতি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যের কারণেই এই দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়াছিল যেমন আরব বণিক ও নাবিকরাই, তেমনি এই দেশের প্রাচীনতম ভাষাও ছিল আরবী, যাহা হইতে কালক্রমে ক্রমবিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষারও উদ্ভব হয় বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে—"Thousands of years ago, the inhabitants of India spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured in to various forms and gave rise to the hundreds of lauguages we now find in India. The founder of Arya Samaj movement Swami Dayanand, has stated in his book, Satyarth Parkash,

www.pathagar.com

that kurus and pandwas discussed confidential matters in Arabic.The words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations, names of posts, cxclamation of happiness, bedding and coverings, house, etc, are all in Arabic. The only difference in most cases is that if the words are read from right to left they sound Arabic and if they are read from left to right they sound Sanskirt." (page-10, The Islamic Review, Vol, XLVII, No.1, January, 1959, Arabic: The mother of all languages, Abdul Haque vidyarthi.)

অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। আরবীকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে আমরা যে শত শত ভাষা দেখিতে পাই, আরবী ভাষা হইতেই তৎসমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে। আর্যসমাজ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তাহার সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে কুরু ও পান্ডবগণ গোপনীয় বিষয় সমূহ আরবীতে আলোচনা করিতেন। পর্বত সমূহ, নদী সমূহ, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয়দের নাম সমূহ ,পদ সমূহের নাম সমূহ, সুখের উচ্ছাস, বিছানা, চাদর সমূহ বাড়ী ইত্যাদি শব্দ সমূহ সমস্তই ছিল আরবীতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল যে শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হয় তাহা হইলে আরবী ধ্বনিত হয়, আর শব্দগুলি যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হয় তাহা হইলে সংস্কৃত ধ্বনিত হয়।

সুতরাং বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মূলতঃ পূর্ব বর্ণিত আরব জাতি সম্ভূত প্রাগার্য একটি জাতি হওয়াতেই তাহাদের মুখে প্রচলিত ভাষাও যে মূলত প্রকৃতপক্ষে আরবী ছিল এবং সেই মূল আরবী ভাষা হইতেই যে কালক্রমে ক্রমবিবর্তনের ফলে মূলতঃ বাংলা ভাষাও যে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে তাহাতে বিস্মিত হইবার যে কিছুই থাকিতে পারে না তাহা কবি রবীন্দ্র নাথের নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও বোধগম্য হইবে—

"বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা বলে চেনাই যায় না।" (পৃষ্ঠা-৯৮, বাংলা ভাষা পরিচয়।)

"এ কথাও জেনে রাখা ভাল খাস বাংলা এমন সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।"(পৃষ্ঠা-১০৮, ঐ)

এতদ্ব্যতীত মনীষী (Sylvian Levy) সিলভা লেভীর মন্তব্যেও যে উক্ত সত্য অধিকতর ভাবে প্রতিপন্ন হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও

www.pathagar.com

প্রণিধানযোগ্য—"Sylvian Levy draws the conclusion that the primitive peoples of Bengal----spoke a language that was neither Aryan nor Dravadian, but belonged to seperate family of speech.-------------It is, however, interesting to note that a Bengal tribe and a royal family in in historic ages were considered to have an oceanic connection-----The Sabha Parvan (32-17) of the Mahabharat---refers to the Bangas and Pundras as well born Kshatriyas."(Page-36, 37, History Bengal, Vol. 1.Hindu Period, R.C. Mazumdar, 2nd Edition, 1963.)

এই ইংরেজী উদ্ধৃতির ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে, "Mahabharat----- refers to the Bangas and Pundras as well born Kshatriyas" অর্থাৎ মহাভারত বঙ্গবাসী ও পুণ্ড্রবাসীদিগকে সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এমতাবস্থায়, উল্লেখ্য যে সংস্কৃত ভাষায় যাহা ক্ষত্রিয় বাংলা ভাষায় তাহাই কায়েত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কায়েত একটি আরবী শব্দ, অর্থ—নেতা, ইহা পূর্বেও উল্লেখিত হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতের মতে বঙ্গবাসী ও পুণ্ড্রবাসীগণ যদি সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বঙ্গবাসী ও পুণ্ড্রবাসীগণ যে মূলতঃ আরবের কায়েত (অর্থাৎ নেতা) জাতীয় লোকদেরই অধস্তন বংশধর তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও থাকিতে পারে না।

উপরন্তু বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামে আমাদের দেশের যে দুইটি নাম শব্দ রহিয়াছে উহাদের মূলে যে আরবী শব্দ রহিয়াছে তাহাতেও বঙ্গবাসীগণ যে প্রকৃতপক্ষেই মূলতঃ প্রাচীন আরব জাতির অধস্তন বংশধর তাহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সুপণ্ডিত অক্ষয় কুমার দত্তের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—"এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কতকগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এককালে উহারা সকলেই একভাষী ও এক জাতি নিবিষ্টি না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না।" (পৃষ্ঠা-১, উপক্রমনিকা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ+৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৮

বাঙ্গালীর হিন্দু নামের ভ্রান্তি

"তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, রমেশ চন্দ্র মজুমদার।)

"ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব, ১ম অধ্যায়, ২য় পৃষ্ঠা।)

উপরের এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই স্পষ্ট যে বাঙ্গালী পূর্বে কখনও হিন্দু ছিল না। আর হিন্দু হইবেই বা কেমন করিয়া। কারণ, "পূর্বে হিন্দু এই সাধারণ জাতীয় নামই ছিল না। ---হিন্দু জাতি যেমন ছিল না, হিন্দু ধর্মও ছিল না।" (পৃষ্ঠা-১৯, বাংলা সাহিত্যের কথা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১ম খণ্ড।)

"কোন একটি বিশেষ ধর্মের আখ্যায় হিন্দু শব্দের ব্যবহার অনেক পরে ঘটেছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে হিন্দু শব্দ একেবারেই পাওয়া যায় না।" (পৃষ্ঠা-৭৩, ভারত সন্ধানে জওহর লাল নেহেরু।)

ইহারও কারণ, "হিন্দুরা ভারত ভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।" (পৃষ্ঠা-১, ভারতবর্ষ উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ+৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।)

"হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই। -----কবিত্বরূপ সুরম্য-গগন মণ্ডলে যতই উড্ডীয়মান হও না কেন, তত্ত্বপথ বিস্মৃত হইও না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আয়ু শেষ করা কি গ্রন্থকারের কার্য?" (পৃষ্ঠা-১২৪, ১২৫, ঐ)

উপরের উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে "হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই।" হিন্দু জাতির প্রকৃত ইতিহাসই যেহেতু নাই সেহেতু বাঙ্গালীকে হিন্দুও বলার উপায় নাই। তাই বাঙ্গালী প্রকৃতপক্ষেই হিন্দু হইতে পারে না। তাইত "শাস্ত্র পন্থী ভারত বাঙ্গালী হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু বলে মানতে অস্বীকার করে।" (পৃষ্ঠা-১৩৩, বাঙ্গালী, প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।)

"বাঙ্গালী হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু বলে মানতে অস্বীকার" করিবার কারণও জনৈক ইউরোপীয় লেখকের কথায় সুস্পষ্ট—"No where in India

www.pathagar.com

Hinduism was so debased and so corrupt as in Bengal. No where have the masses been treated with greater contumely and inhumanity as in Bengal. "অর্থাৎ বাংলার মত ভারতের কোথাও হিন্দুত্ব অত হীনমূল্য ও বিকৃত ছিল না। বাংলার মত কোথাও জন সাধারণ অধিকতর ঔদ্ধেত্যের এবং অমানবিকতার দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। অর্থাৎ হেয় প্রতিপন্ন হয় নাই। এই সত্যেরও পরিপূরক নিদর্শন নিম্ন বর্ণিত ঘটনায় প্রণিধান যোগ্য—

"আজ মীনাক্ষী দেবী আর সুন্দরেশ্বর শিবের 'ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি' দিবস।---হাজার হাজার দর্শনার্থী লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। স্পেশাল টিকিটে আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট লাইনে পূজার ডালি হাতে দাঁড়ালাম। এক পাণ্ডা আমাদের ব্যবস্থা করবেন। এখানকার পাণ্ডা পুরোহিতেরা আমাদের (বঙ্গ) দেশের ব্রাহ্মণদের থেকে যেন অনেক উন্নাসিক। তাদের শুচিতা তথা শুচিবাই খুব বেশী। বাঙ্গালীদের প্রতি শ্রদ্ধা এদের খুবই কম। বিগ্রহ বা মন্দির সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেও এঁরা খ্যাক করে উঠেন—কেউবা মুখ ফিরিয়ে রাখেন অবজ্ঞায়।-----যা হোক অনেকক্ষণ পরে লাইন শেষ হোলো।----আমাদের পূজার ডালি হাতে নিয়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেন, "গোত্রম" ? গোত্র বলি। সঙ্গে সঙ্গে নারকেলটা ভেঙে অর্ধেকটা ছুড়ে দেন ভোগ মণ্ডপের মধ্যে ! এক আধটা কলাও। বাকী অর্ধেক নারকেল আর কলা ফিরিয়ে দেন ডালায়—এক মিনিটে পূজা শেষ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয় বাইরে।" (সুধা সেন, দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমা পৃষ্ঠা-১২, ভারত বিচিত্রা, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা।)

সে যাহা হউক বাঙ্গালী হিন্দুগণ হিন্দু নাম ধারণ করিলেও ভারতীয় আর্য হিন্দুগণ কোন কালেই বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে মর্যাদার আসন দিতে পারে নাই। কারণ বাঙ্গালী আর্য নহে বরং দ্রাবিড় নামে আখ্যায়িত অনার্য অর্থাৎ প্রাগার্য আরব। তবে এ সত্যটা আর্য হিন্দুগণ অন্তরে গোপন রাখিয়া বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে ইহা বুঝিতেও দেয় নাই। কেননা, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুগণ আত্ম স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলিয়া আর্য প্রভুত্বের সমাধি রচনা করিতে তথা হিন্দু নামের ভাঁওতা দিয়া মুসলমান ব্যতীত বাংলা-পাক-ভারতের বিভিন্ন ধর্ম গোত্র ও জাতির লোকদিগকে একটি মাত্র হিন্দু নাম ভুক্ত করিয়া আর্য হিন্দুগণ ইংরেজের সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলা-পাক-ভারতের মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা বাংলা পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ ভূমিখন্ডের অধিকারী হইয়া শেষ পর্যন্ত যে আর্য হিন্দুর প্রভুত্ব কায়েমের ব্যবস্থা করিয়াছে অনার্য অর্থাৎ প্রাগার্য বাঙ্গালীগণ ও

www.pathagar.com

অন্যান্য ধর্ম, গোত্র ও জাতির লোকগণ আত্ম স্বাতন্ত্রের দাবি তুলিয়া পৃথক হইয়া গেলে তাহারও অবসান হইবে। এ সম্পর্কে Discovery of Pakistan by A. Aziz, দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত একজন অতি উচ্চস্তরের মনীষী হিন্দু রচিত ইংরেজী গ্রন্থ "Pakistan or Partition of India" পাঠ করিলেও জানিতে পারা যাইবে যে ইংরেজের আধিপত্যবাদী কূটনৈতিক বুদ্ধিতে সাড়া দিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আর্যহিন্দুর করায়ত্ব হিন্দু মহাসভার সভাপতি ভি. ডি. সাভারকর কেমন করিয়া মুসলমান ব্যতীত বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও জাতির লোকদিগকে একমাত্র হিন্দু নাম ভুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আর্যহিন্দুদিগের দলভুক্ত করিয়া আর্যহিন্দুদিগকে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়া বাংলা-পাক–ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ ভূমি খণ্ডের অধিকার আর্য হিন্দুদের হাতে তুলিয়া দিয়া এতদ্দেশের বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও জাতির লোকদিগকে চির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়া ইংরেজের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই উপমহাদেশে আর্য হিন্দুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও শাসন চালাইবার একচ্ছত্র অধিকার পাইয়াছিল।

"Who regards and owns this Bharat Bhumi this land from the Indus to the seas, as his fatherland as well as his holy land; i.e, the land of the orign of his religion, the craddle of his faith----The followers therefore of Vaidicism, the Sanatanism, the Brahmo Samaj, the Deva Samaj, the Prarthana Samaj and such other religion of Indian origin are Hindu and constitute Hinduism, i.e. Hindu people as a whole ------consequeently the so called aboriginals or hill tribes also are Hindus, because India is their Father Land, whatever form of religion or worship they follow----This definition, therefore should be recognised by the (British) government and made the test of "Hindutva" in enumerating the population of Hindvs in government census to come." (Page-30, Pakistan or partition of India, Dr. B. R. Ambedkar.)

ব্রাহ্মণ আর্য হিন্দুগণ যে এই প্রকার ধোঁকা দিয়া মানুষকে বোকা বানাইয়া মজা লুটিতে অত্যন্ত পটু তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ পিল্লাইর (Mr. V.C. Pillai) নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—"The Aryan comes

www.pathagar.com

out of a race that is the adept in the art of befooling mankind and leading them to erroneous ways. And in this kind of work the Aryan is a past master.

সুতরাং হিন্দু নাম ধারণ করিলেও বাঙ্গালী হিন্দুগণ যেহেতু আর্যজাতিভুক্ত নহেন বরং ভিন্ন অনার্য অর্থাৎ প্রাগার্য জাতিভুক্ত মানুষ সেহেতু আর্য হিন্দুগণ বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে সুনজরে দেখিতে পারে না। এই মৌলিক সত্যটা বাঙ্গালী হিন্দুগণ যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করিবেন ততই মঙ্গল। অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর জান মাল ও ইজ্জৎ ততই নিরাপদ হইবে এবং বাঙ্গালী হিন্দুগণ ততই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। আর্য ও অনার্য এই দুইটি শব্দের ও অর্থের মধ্যে যে প্রভেদ বা পার্থক্য, আর্য হিন্দু ও অনার্য হিন্দুর মধ্যেও যে সেই মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্যান্বিত হইবার কি থাকিতে পারে। তাই সহজেই অনুমেয় যে আর্য হিন্দু ও অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যেও সেই পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই আর্য হিন্দুগণ অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে আজ পর্যন্তও অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকে।

উপরন্তু হিন্দু নাম দেখিয়াই বা শুনিয়াই অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুগণ যে নিজেদিগকে আর্য হিন্দুদের একই স্বজাতীয় বিবেচনা করেন তাহাতে তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারিয়া নিজেদের বিপদ ও ধ্বংস ডাকিয়া আনেন, কেননা, আর্য হিন্দুগণ অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে আর্যদের নীচের তলায় স্থান দিয়া অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগের উপরের তলায় বসিয়া দিব্যি মজা লুটিলেও সে মজার সরিষা পরিমাণ ক্ষুদ্রতম ভাগ বা অংশও যাহাতে নীচের তলায় পড়িয়া অনার্য বাঙ্গালীদের কোন সুখ সুবিধার কারণ না হইতে পারে সেদিকেও সর্বদাই সজাগ ও সর্তক দৃষ্টি রাখেন। তাইত আর্য হিন্দুদের কোনও বিষয়ে সুখ সুবিধার সুযোগ উপস্থিত হইলেও অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুগণ তাহা হইতে সর্বদাই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এমনি করিয়া অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুগণ আজ পর্যন্তও আর্য হিন্দুগণ কর্তৃক বারে বারে ও পদে পদে প্রতারিত হইয়াও আর্যহিন্দুদিগকেই যে আপন জন মনে করিতেছেন, ইহা তাহাদের ভাগ্যেরই এক নির্মম ও মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে। আজিকার হিন্দু প্রধান ভারত রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ অনার্য নীচ জাতীয় হিন্দুগণ তথাকার আর্য হিন্দুগণ কর্তৃক যে ভাবে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হইতেছেন তাহা নিম্নে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত হইতেও হৃদয়ঙ্গম হইবে ঃ "১৯৭৩ সনের ১৭ই জুনের কলিকাতার দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকার "কথা প্রসঙ্গ" কলামে "পৈতে" শীর্ষক একটি চিঠিতে শ্রী সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "আজ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত প্রধান মন্ত্রীই উচ্চ বর্ণ হইতে আসিয়াছেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাচার্যই উচ্চ বর্ণের। সুতরাং অধিক বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালী জীবনে সর্বক্ষেত্রেই ইহা দৃষ্ট হয়।"

এতদ্ব্যতীত ভারতের দিকে তাকাইলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটি মাত্র হিন্দু পরিচয়ে যাহারা ভারত বিভাগ কালে আর্য হিন্দদিগকে সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ করিয়া দিয়া বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম অংশ লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল আজ তাহাদের বৃহত্তর জন-গোষ্ঠীই সংখ্যা লঘিষ্ট আর্যদের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য আর্যশাসন মুক্ত স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবি তুলিয়া হায় হায় করিতেছে। শিখদের শিখস্থান, তামিল ভাষাভাষীদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি, নাগাদের স্বাধীন নাগাভূমি ইত্যাদির দাবি ও সংগ্রামে এই সত্য আর চাপা থাকিতেছে না। তাহারা এখন ঠেকিয়া বুঝিতেছে যে, হিন্দু নামের একটি মাত্র সাধারণ পরিচয়ের সূত্রে আর্য হিন্দুগণ কেমন করিয়া তাহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

এই হিন্দু নামের আর্য ফাঁদে পা দিয়া কত অনার্য হিন্দু যে কত প্রকারে ঠকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (Blossoms on the Dust by Kusum Nayar দ্রষ্টব্য) এমন কি ডঃ বি. আর. আমবেদকরের মত একজন সুবিখ্যাত অনার্য হিন্দু মনীষী ব্যক্তি পর্যন্ত কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া অন্তরের জ্বালা নিবাইয়াছেন। এমন দৃষ্টান্ত অনেক রহিয়াছে। মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধীর আজীবন চেষ্টায়ও হিন্দু সমাজে হরিজনেরা মনুষ্য মর্যাদা পায় নাই।

রাজকোট, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ (ইউ এন আই)—

জনৈক হরিজন বালক মন্দিরে ঢোকার দুসাহস দেখাইলে মন্দির পুরোহিতের হাতে তাহাকে প্রাণ দিতে হয়।

"পুলিশ সূত্রে প্রকাশ গত বুধবার ধূলকেফ গ্রামে মন্দিরের নিকট তিনটি সম বয়সী হরিজন বালক খেলা করিতেছিল। তিনজনের একজন, যাহার বয়স ১১ বৎসর মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলে পুরোহিত মহাশয় মহা খাপ্পা হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। রাগে অগ্নিশর্মা পুরোহিত মন্দির অপবিত্র করার জন্য হরিজন বালককে পিটাইতে পিটাইতে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। হাসপাতালে বালকটি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।"(দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫: ১৯শে মাঘ, ১৩৮১)।

সে যাহা হউক হিন্দু হইলেও আর্য হিন্দুগণ অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে আর্যদের সমকক্ষ মর্যাদা কোন দিনই দিতে পারে নাই। আজও দেয় না।

www.pathagar.com

বাঙ্গালী হিন্দুগণ হিন্দু হইলেও আর্য যে নয় বরং অনার্য, এই কারণেই যে আর্য হিন্দুগণ অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে আর্যদের সমান কুলীন বিবেচনা করিতে পারে না তাহা বিক্রমপুরের গোড়া হিন্দু রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক হিন্দুর কৌলিন্য প্রবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও ধারণা করা যায়। রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশে একজনও কুলীন অর্থাৎ আর্য হিন্দু খুঁজিয়া না পাইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষ পর্যন্ত কনৌজ হইতে কুলীন অর্থাৎ আর্য জাতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আমদানী করিয়া অনার্য বাঙ্গালী নারীর গর্ভে কুলীন অর্থাৎ আর্য হিন্দু পয়দা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশে আর্যদের এক মিশ্র শঙ্কর জাতি সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহাতে হয়ত অল্প কিছু অনার্য বাঙ্গালী ও আর্য মিশ্রিত শঙ্কর মানুষ সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও সে তো হইবে কেবল সাগরে শিশির বিন্দুতুল্য। বাদবাকী সমগ্র বাঙ্গালী জনসাধারণ যে রহিল তাহাদের পরিচয় কি হইবে? তখনও তো বাংলাদেশে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই। তবে বাঙ্গালীর পরিচয় দিতে হইলে সকলেই এক বাক্যে বলিবেন সন্দেহ নাই, তাহারা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা হিন্দু। কিন্তু হিন্দুত্বে তো বাঙ্গালীর বা কাহারো সঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না। কেননা, হিন্দু বলিয়া কোনও দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম নাই। তবে বাঙ্গালীর এই হিন্দু নাম কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালীরা মুসলমান, খৃস্টান, বৌদ্ধ ভিন্ন সকলেই যে হিন্দু নামে একটা সাধারণ পরিচয় দিয়া থাকে তাহারা সে হিন্দু নাম কোথায় পাইল? এই হিন্দু নামের ব্যবহার এদেশে মুসলমান শাসন আমলের পূর্বে দেখা যায় নাই। এই নাম মুসলমানদের দেওয়া। আরব, তুর্কী, আফগানী, ইরানী ও মোগল জাতীয় মুসলমান যাহারা ভারত উপমহাদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন গৌর বর্ণ আর ভারতে তৎকালে যাহারা বাস করিত তাহারা ছিল কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ। তাই ঐ সব মুসলমানেরা ভারত উপমহাদেশের কৃষ্ণবর্ণের লোকদিগকে নাম দিয়াছিলেন হিন্দু। সেই হইতেই ভারত উপমহাদেশের লোকেরা তথা বাঙ্গালীরাও হিন্দু নামে পরিচয় পাইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারত উপমহাদেশের হিন্দুদের হিন্দু নামটাও মুসলমানদের দান হইতেই যে হিন্দুরা পাইয়াছে তাহা শ্রী নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত রচিত 'হিন্দু' শীর্ষক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্তারিত ভাবে জানিবার সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিই এতদস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"হিন্দু"

"ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম প্রায় ধর্ম প্রবর্তক হইতে হয়। বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম, যীশু খৃষ্ট হইতে খৃষ্টান ধর্ম, মহম্মদ হইতে মুসলমান ধর্ম। হিন্দু ধর্ম—এই নাম কোথা হইতে আসিল?

www.pathagar.com

হিন্দু শব্দ বেদে নাই, পুরাণে নাই, উপ-পুরাণে নাই, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে, নাটকে, কোষে, অভিধানে নাই অথচ হিন্দু বলিতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল ধর্মই বুঝায়। এই নামকরণ কেমন করিয়া হইল ?

জগতের অপর প্রধান ধর্মসমূহে ও হিন্দু ধর্মে মৌলিক প্রভেদ এই যে, অপর ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই। কোন বিশেষ অবতার বা কোন বিশেষ ঋষি এই ধর্ম প্রচলন করেন নাই। বেদে দেবতা অনেক, ঋষিও বহু সংখ্যক। নানা মুনির নানা মত—পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয়ে এই হিন্দু ধর্ম। পিতামহ বৈদান্ত মতে অদ্বৈত বাদী, তাহার পুত্র যাজ্ঞিক বৈদিক, পৌত্র পৌরাণিক, অথচ তিন পুরুষ একান্নে একগৃহে বাস করে, কোনরূপ বিরোধ বা মনোমালিন্য নাই। বৃহস্পতির ন্যায় ঋষি বেদ রচয়িতাদিগকে গালি দিতেন। গৌতম বলিতেন, ঈশ্বর আছেন তাহার প্রমাণ নাই। চার্ব্বাক ঘোর নাস্তিক, কিন্তু ইহাদের কাহাকেও কোন ধর্ম সম্প্রদায় হইতে বাহির করা হয় নাই। ধর্মায়োজনের স্থানে গমন করিবারও কোন নিষেধ ছিল না। এক ঘরে করা আধুনিক প্রথা এবং উহা সমাজের শাসন। অতি প্রাচীন কালে আর্যদিগের ধর্ম সম্প্রদায়ের যে কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল এরূপ বিবেচনা হয় না। আর্য ধর্ম সনাতন ধর্ম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম।

হিন্দু শব্দ আদৌ সংস্কৃত নয়। কোন সংস্কৃত ধাতু হইতে এই শব্দ উৎপন্ন হয় নাই।--- জেন্দ ভাষায় হিন্দব। গ্রীক ভাষায় হন্দকোশ, ইন্দিকোশ (Indikos) ও ইণ্ডিওস (Indios) । পার্সীদিগের ধর্মগ্রন্থ বেণ্ডিডাডে (Vendidad) হাপ্ত হিন্দুর (সপ্ত নদীর) উল্লেখ আছে। এই প্রদেশ পাঞ্জাব। এই প্রদেশ এককালে ইরানের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পারস্য ভাষাতেও হিন্দব শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্সী (ফারসী) ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ। মিসরের দক্ষিণে ইতিওপিয়া (Ethiopia) সে দেশের অধিবাসীরা কাফ্রী। হিন্দু বলিতে এককালে তাহাদেরও বুঝাইত।.....................

হিন্দুকোশ পর্বত ফারসী ভাষায় হিন্দ্‌কোহ্, হিন্দ অর্থে কালো, কোহ্ অর্থে পর্বত, অর্থাৎ কৃষ্ণ পর্বত। হিন্দোস্তান, হিন্দুস্তান, যে দেশে হিন্দু নামক কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে। এইরূপ গুলীস্তান, ফুলের দেশ, তুর্কীস্তান, যেদেশে তুর্কীরা বাস করে, আরবীস্তান, যে দেশে আরব্য জাতি বাস করে ; কুর্দ্দীস্তান, যে দেশে কুর্দ্দগণ বাস করে।

www.pathagar.com

হিন্দু শব্দ ঘৃণাব্যঞ্জক। ইরানী ও মোগলেরা গৌরবর্ণ, ভারতবাসী কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। ইংরেজীতে নিগর (Nigger) শব্দের যে অর্থ পারসীতে হিন্দু শব্দেরও প্রায় সেই অর্থ। কেহ আমাদের 'নিগর' বলিলে আমরা রাগ করি। কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আমরা গৌরব অনুভব করি। হিন্দু শব্দে যে শ্লেষ, কালে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যেকালে আর্য জাতি ভারতে আগমন করেন সেকালে হিন্দু নামে কোন জাতি ছিল না। হিন্দু ধর্ম নামে কোন ধর্ম ছিল না হিন্দু শব্দ কেহ জানিত না। পূর্বেই বলিয়াছি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য, অনার্য, শক, কোলা, ভিল্ল, অনেক জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু হিন্দু শব্দ কোথাও নাই, থাকিবার কথাও নয়। কেননা, সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দ নাই।"(পৃষ্ঠা-৫৯৯-৬০০, বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩৩, প্রথমার্ধ, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কলিকাতা।)

উপরে উদ্ধৃত এই প্রবন্ধটি হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই জানা যাইতেছে যে 'হিন্দু' পরিচয়ের দ্বারা কোন জাতি ধর্ম বা দেশের পরিচয়ই জানিবার উপায় নাই। বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের লোকদের তথা এতদ্দেশীয় হিন্দু বাঙ্গালীদের জাতি, ধর্ম বা দেশের কোনও পরিচয়ও তাই হিন্দুনামের দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং হিন্দু শব্দ যে একটি ভ্রান্তিমূলক শব্দ তাহা বলাই বাহুল্য।

এতদসত্ত্বেও হিন্দুর যে জাত্যাভিমান রহিয়াছে তদ্বিষয়ে শ্রী কালিদাস রায়ের নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য সবিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য—"জাত্যাভিমান-- কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদই হিন্দু ধর্মের প্রাণ—জাতিভেদ না থাকিলে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না। ---জাতি ভেদ আছে বলিয়া এ জাতি আজও টিকিয়া আছে।.................

যে জাতি গৌরবে আমরা স্ফীতবক্ষা তাহা ঐতিহাসিক জাতি নহে—ইহা পৌরাণিক কবি কল্পনা-প্রসূত। কারণ ব্রাহ্মণরা গর্ব করিয়া থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছেন—আর শূদ্ররা পা হইতে। কিন্তু হিন্দু ছাড়া অন্য কোটি কোটি লোক ব্রহ্মার কোথা হইতে নির্গত হইয়াছে। তাহা তাহারা বলেন না। বোধ হয় জগতের অন্যান্য জাতি ব্রহ্মার সৃষ্টিই নয়——------

পাঠান যুগের স্মার্ত্ত শার্দুল রঘুনন্দন বিধান দিয়া গিয়াছেন—যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র—আর অন্য বর্ণ নাই।...................

রঘুনন্দনের পাঁতিতে আর যাই থাক একটা বড় সত্যের ইঙ্গিত ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব জাতিই যখন শূদ্র তখন তাহারা একসঙ্গে মিলিবার যোগ্য। রঘুনন্দনের সে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণেতর জাতি এক হইয়া

www.pathagar.com

যাইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বলিবার কিছু ছিল না।—এবং তাহা হইলে দেশের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি রঘুনন্দনকে মানিয়া লয় নাই—সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র মনে করে নাই—অনেক ব্রাহ্মণ অবশ্য সেই হইতে সকল জাতিকেই শূদ্র মনে করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি আপনাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া একত্রে মিলা দূরে থাকুক—নূতন উপজাতি সৃষ্টি করিয়াছে।" (পৃষ্ঠা-৪৮৯, জাত্যাভিমান, শ্রী কালিদাস রায়, বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২-৩৩, প্রথমার্ধ, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা কলিকাতা।)

কিন্তু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শূদ্রের গৌরব যে কোন প্রকারেই বেশী ছাড়া কম নহে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"৬ই বৈশাখের (১৩৬৬) "আত্মশক্তি" তে শ্রীমান শিবরাম চক্রবর্তী "ব্রাহ্মণ নয়—শূদ্র" নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।..........

ব্রাহ্মণ সভ্যতাই যদি ভারতীয় সভ্যতার শেষ কথা হোতো তা হলে তেমন দুর্দ্দিন পৃথিবীর আর কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য এড়িয়ে উঠতে না পারলেও তার সভ্যতাকে পেরিয়ে যা উঠেছিল তাই হচ্ছে হিন্দু সভ্যতা—এই সভ্যতারই দিগন্ত ব্যাপ্ত কিরণের মধ্যে ব্রাহ্মণের কলঙ্কও অনেকটা শোভার মতই দেখাচ্ছে। এই সভ্যতা হচ্ছে ব্রাহ্মণেতর জাতির সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ সভ্যতার দু'টি মাত্র পুঁজি মনুসংহিতা ও পরশু রামের পরশু। পেনাল কোড আর রেগুলেশন লাঠি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার মধ্যেই আমরা পাই ভারতের দর্শন, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর ঐশ্বর্য্যের সহস্রমুখী পরিচয়। তার মধ্যেই আমরা পাই দস্যু বাল্মীকির রামায়ন, জেলেনীর ছেলে বেদব্যাসের মহাভারত। যে উপনিষদের গর্বে আমরা মশগুল তার ও বেশীর ভাগ ক্ষত্রিয়ের রচনা। আয়ুর্বেদ, রসায়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও অব্রাহ্মণেরই প্রতিভা।

এই হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই। বলতে গেলে দেশ ব্রাহ্মণের থেকে নিয়েচে—বর্ণ বিচার, স্পর্শ দোষ আর 'ন স্ত্রী 'স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—সেটুকুই এর কলঙ্ক। ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হলে এ সভ্যতা আরো মহৎ আরো প্রাণবান আরো শক্তিশালী হতে পারত—এ সভ্যতা দিগ্বিজয় করিত। এই সভ্যতায় অনার্যের দান আছে, বৌদ্ধের দান আছে, মুসলমানের দান আছে। এর স্রষ্টাদের মধ্যে এককালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়ত ছিলেন, কিন্তু আজ তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিপুল শূদ্র শক্তি তাদের

www.pathagar.com

আত্মসাৎ করেছে। শূদ্রের দ্বারাই এ সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি—এজন্য আমি একে বলব 'শূদ্র সভ্যতা।' এবং এই জন্যই এ বিরাট ; তাইত এর মাহাত্ম—ব্রাহ্মণ সভ্যতার চেয়ে ঢের বড়ো এই হিন্দু সভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হোতো এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও এ থাকবে। বরং বামুনের প্রাধান্য লোপ পেলে এই সভ্যতার প্রাণ শক্তি পূর্ণ মুক্তি পাবে এবং বৌদ্ধ যুগে যেমন হয়েছিল তেমনি ভারতের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য আবার সহস্রদলে আত্মপ্রকাশ করবে। এই কথাটাই আজ স্পষ্ট হওয়া চাই।" (পৃষ্ঠা-৫৮৭, 'বসুধারা', আষাঢ়, ১৩৬৬, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা।)

"ইংরেজ রাজত্বের শান্তির ক্রোড়ে বসিয়া নিরুদ্বেগে জাতি গোত্র বর্ণ কুলের অহঙ্কার করা খুব সোজা। আজিকে প্রত্যেক জাতির সীমান্তে সীমান্তে সর্তক প্রহরী রাখিয়া মিলনের নব নব বাধা সৃষ্টি করা ও ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া রাখা এতটুকুও কঠিন না। ইতিহাস যখন নাই, তখন প্রত্যেক জাতির ধমনীতে বৈদিক যুগ হইতে অবিমিশ্র অনন্য সংসৃষ্ট রক্তধারাই প্রবাহিত হইতেছে মনে করায় কোন বাধা নাই।"(পৃষ্ঠা-২৩০-২৩১, জাতি রহস্য—অনুশীলনী ও সমালোচনা, শ্রী সারস্বত শর্মা, বসুধারা, পৌষ, ১৩৩৫, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৯

আর্য নামের ভাঁওতা

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে আর্যদের কিছুই পাওয়া যায় নাই

ভারতে বসবাসের জন্য তথাকথিত আর্যদের বাহির হইতে ভারতে আগমনের কোন প্রমাণ যে মিলে নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ ভাষ্য হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

"New Delhi, Nov. 11 (1974)—There is no conclusive evidence of Aryan immigration in to India from outside, according to Indian historians, linguists and archaeologist, reports Samachar.

The Indian scholars told recently held international seminar, organised by UNESCO at Dushambe, the capital of the Soviet Republic of Tajikistan that their conclusion was based on the study of Archaeological materials associated with Aryans in different regions and periods in India.

These materials do not show any clear link with the archaeological survivals of the Aryans in Afganistan, Iran and central Asia, delegates from Soviet Union, west Germany, Iran and Pakistan were told.

Dr. N. R. Banerjee, Director of the National Museum of India, exploded another myth that the Aryans can not be imagined without iron. He showed that even Indian and Pakistani archaeological cultures of different grey wares associted with Aryans were for a long time in the copper bronze age.

It was felt that tracing the route of the movement of the Aryans from central Asia or Iran to other places, more planned research and archaeological excavations should be undertaken in these areas.

www.pathagar.com

Prof. Gopal of Baneres Hindu University suggested a study of the problem in terms of ethno-linguistic groups with their characteristic cultural traits.

Dr. S. S. Misra also from the same University discussed the problem of contacts among different Aryan groups with linguistic study of Indo-Aryan languages.

Dr. Nasim Bhati of the Indian council of Historical Research analysed the socio-economic life as reflected in an ancient epic of Iran." (The Bangladesh Observer, Dacca, November, 12, 1977).

বঙ্গানুবাদ ঃ নিউ দিল্লী, নভেম্বর ১১ (১৯৭৪)—সমাচার সংবাদ দিয়াছে যে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের, ভাষাতত্ত্ববিদগণের ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতানুসারে, বসবাসের জন্য বাহির হইতে আর্যদের ভারতে আগমনের কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নাই।

সুভিয়েট প্রজাতন্ত্রের তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশাম্বেতে সম্প্রতি ইউনেসকো (UNESCO) দ্বারা সংগঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে তাহাদের সিদ্ধান্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আর্যদের সহিত যুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের ভিত্তিতে গবেষণার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী, ইরান এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদিগকে বলা হয় যে, এই উপকরণ সমূহ আফগানিস্তান, ইরান এবং মধ্য এশিয়ার আর্যদের প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে বাঁচিয়া থাকার সহিত কোন পরিষ্কার যোগসূত্র প্রদর্শন করে না।

ভারতের জাতীয় যাদু ঘরের ডাইরেক্টর ডঃ এন, আর. ব্যানার্জী আর একটি মিথ্যা খণ্ডন করিয়াছেন যে লৌহ ছাড়া আর্যদিগকে চিন্তা করা যায় না। তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে এমন কি আর্যদের সহিত যুক্ত ভারতীয় ও পাকিস্তানী ধূসর বর্ণের মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রের প্রত্নতাত্ত্বিক সভ্যতা বহু পূর্বেকার তাম্র ব্রঞ্জের যুগেও বিদ্যমান ছিল।

ইহা অনুভূত হইয়াছে যে মধ্য এশিয়া বা ইরান হইতে অন্য স্থানে আর্যদের চলাচলের রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আরও পরিকল্পিত গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালান উচিত। বেনারস হিন্দু ইউনভার্সিটির অধ্যাপক গোপাল সমস্যাটি তাহাদের (অর্থাৎ আর্যদের) নৃ-তাত্ত্বিক ভাষা গোত্রের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণসহ গবেষণার পরামর্শ দিয়াছেন।

www.pathagar.com

একই ইউনিভার্সিটির ডঃ এস. এস. মিশ্র বিভিন্ন আর্য গোত্রের সংযোগের সমস্যাটি ইন্দো-এরিয়ান ভাষা সমূহের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত সংবাদ ভাষ্যে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গোপাল এবং ডঃ এস. এস. মিশ্র ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা আর্যদের সমস্যা সমাধানের যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাও যে ফলপ্রসূ হয় নাই অর্থাৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"So reviewing the whole work done by the philological school, we state that their labours have ended in failure. And failure is not their only demerit. They by their bad study have prevented the world from getting at a true knowledge of the Indo-European phenomenon.

The Indo-European races are represented to be a pious flock of highly peace-loving type. This is not only false but perverted statement of facts-----

The Aryans comes out of a race that is the adept in the art of befooling mankind and leading them to erroneous ways. And in this kind of work the Aryan is a past master. (V. C. Pillai)

বঙ্গানুবাদ ঃ সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানীদের কৃত সমস্ত কার্য পর্যালোচনা করিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে বলি যে তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং ব্যর্থতাই তাঁহাদের একমাত্র ত্রুটি নহে। তাঁহারা তাঁহাদের ত্রুটিপূর্ণ গবেষণার দ্বারা জগৎকে ইন্দো ইউরোপীয় ব্যাপারে সত্য জ্ঞান লাভে বাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ইন্দো ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির সাধু দল রূপে বর্ণনা করা হয়। ইহা শুধু মিথ্যাই নহে, পক্ষান্তরে সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উক্তি।

আর্যরা এমন একটি জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে যাহারা মনুষ্য জাতিকে বোকা বানাইবার ক্ষমতায় সুদক্ষ এবং এইরূপ কার্যে আর্যগণ সর্দারের কাজ করিয়াছে।

সঙ্গতকারণেই তাইত "ভাষা তত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এখন আর্যদের লইয়া আর চিন্তা-ভাবনা করেন না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোনও একটি

www.pathagar.com

গোত্রকে আর্য বলিয়া গণ্য করিবার স্বপেক্ষ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বর্তমান পৃথিবীতে কাহারা তথাকথিত আর্যজাতির বংশধর তাহা জানিবার উপায় নাই। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ কিছু থাকিলেও এমন কোন প্রমাণ নাই যে ভারতীয় ভাষা ইউরোপীয় ভাষা হইতেও প্রাচীনতর। তথাকথিত আর্য ভাষা সমূহের মধ্যে ধারাবাহিক পূর্বিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। কারণ এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই।" (J. Manchip white, Teach yourself Anthropology).

"মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোন নির্দশন পাওয়া যায়নি, সংস্কৃত গ্রীক ও লাতিনের তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আনুমানিক রূপ পুনর্গঠিন করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৩২৩, ভাষাতত্ত্ব, রফিকুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ)।

"উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় ভাষাবিদগণ সংস্কৃত ভাষার সহিত পারসিক ও য়ুরোপীয় ভাষা সমূহের কতকগুলি শব্দের মধ্যে জাতিগত (রেসিয়েল) ঐক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে কল্পিত জাতির নাম দেওয়া হয় আর্য বা অ্যারিয়ান। ইংরেজ, জার্মান, রুশ, ভারতীয় এমনকি বাঙালিরা সংস্কৃত ভাষা বলে, অতএব সকলেই 'আর্য' মহাজাতির শাখা। এই তত্ত্বকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার উপাদান তখন ইউরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামতকে আমরা স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর কল্পনার রঙে রাঙাইয়া গ্রহণ করিলাম এবং আমরা যে 'আর্য' এই মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম—ইহাকেই বলে আর্যামী। এই আর্যামীকে লক্ষ্য করিয়া কবি (রবীন্দ্রনাথ) পরে লিখিয়াছিলেন—

"মোক্ষমূলার বলেছে 'আর্য'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

(পৃষ্ঠা-২১৩, ২১৪, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)

প্রখ্যাত শিল্পাচার্য প্রয়াত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরও তাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "আকৃতির হিসাবে দেখছি আর্য ছাঁদের মানুষ। কিন্তু বৃত্তির হিসাবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু ও বুদ্ধির হিসাবে একেবারে বর্ব্বর। এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবী জোড়া আর্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই।..........হঠাৎ একদল মানুষ সিঁড়ি না ভেঙে তেতালায় উঠে এল, উড়ো কল সৃষ্টি না করে উড়ে পড়ল

www.pathagar.com

আকাশে—এ অসম্ভব কল্পনা আর্টিষ্ট হয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আর্যরা পেয়ে গেলেন এবং নিয়ে এলেন এদেশে সকল সভ্যতা, সকল বিদ্যা—হঠাৎ এ বললে অনেক আপদ এড়িয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে খোঁচার শেষ হয় না।" (আর্য ও অনার্য শিল্প, মাসিক বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩৫২, ৫ম বর্ষ, পৃষ্ঠা-১৭৪)।

যে মানুষ আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে সে অতি বড় পাপী। —ম্যাকসমুলার।

"আর্য বা সেমিটিক নর গোষ্ঠী বলে ম্যাকসমুলার যে ভুল করেছিলেন, ১৮৮৮ সালে তিনি সে ভুলের জন্য অনুতাপ করেছেন। আর্যদের 'টিউটন' বা 'গল' বলে জাহির করে, নর গোষ্ঠীর বৈষম্যবাদী তাত্ত্বিকরা কি গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন, তা হয়ত ম্যাকসমুলার অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ১৮৮৮ সালে বলেছিলেন, 'আমার মতে, যে জাতিতত্ত্ব আর্য নর গোষ্ঠী, আর্য রক্ত, আর্য চক্ষু বা আর্য কেশের কথা বলে এবং যে ভাষাবিদ লম্বা মাথাবিশিষ্ট অভিধান বা চওড়া মাথা বিশিষ্ট ব্যাকরণের কথা বলে, তারা উভয়েই উচু দরের পাপী'।" (পৃষ্ঠা-৬২, ৬৩, নৃ-তত্ত্বের সহজ পাঠ, মাহমুদা ইসলাম,মূল—Teach yourself Anthropology, J. Manchip White).

আর্য নামের ভাঁওতা

উপরে বর্ণিত আর্য তত্ত্বের ভ্রান্তি সমূহ জানা সত্ত্বেও জাতিতত্ত্ববিদগণ আর্য-তত্ত্ব সমর্থন করেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন প্রফেসর এম. নেসতুর্খ (Prof. M. Nesturkh) তাঁহার (The Races of Mankind) 'দি রেইসেস অব ম্যানকাইণ্ড গ্রন্থে, যাহার অংশবিশেষ পাঠকের অবগতির জন্য এতদস্থলে হুবহু উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"--- the racists are unable to use the data on its development to prove their assertion that the Negroid race is a lower category than the Europoid. (Page-48)----- Europeans have a physical structure that is no "higher" than that of other peoples. (Page-52)----- The myth of the "Pure Race" is an Invention of the racists that contradicts scientific facts. (Page-65)---- There can be no doubt that at some time in the past these two great races formed a single whole. Evidence of this, for example, are the upper palaeolithic finds of two

www.pathagar.com

skeletons with Negroid features (the Grimaldi type, found in 1906) discovered in the Grotte de Enfants at Menton on the Franco—Italian frontier. At a later date the basic group split in to two great races, the Europoid and the Negroid.

These two great races then spread, in the course of thousands of years, over various regions and continents, varying degrees of heat, humidity, etc. and so developed very different racial features. Thousands of years of development in greatly different conditions led to the difference between the dark skinned Sudanese Negro and the northern or Eastern European with his weak pigmentation. (Page-70)----- As far as their evolution is concerned, none of the races stands higher or lower than the others in its level of physical development. (Page-96)

Why do the racists insist on their false views? The answer is a simple one. The theory of "higher" or "lower" races, of the right of one race to dominate over another, justifies war betwen nations—it is the ideological mask concealing imperialist politics. (Page-98)

If language is the offspring of the race spirit, the peoples speaking Indo-European languages should possess the features of the northern, "Aryan" race. But this is not so. The kurds, and many other peoples who ware Indo-European in language, have skin and hair that is much darker------

The tall, light eyed and light haired Fins and Estoniaus, on the other hand, are close to the North European type in their racial features, the languages of the Fins and Estonians, however, have nothing in common with the Indo-European languages.

Thus the theory of an Indo-European or Aryan "first language" and "common ancestor" with all the features of the "Aryan race" is refuted, and at the same time it is obvious that

www.pathagar.com

no race has the right to call itself "Aryan-noble-born." (Page-100)

বঙ্গানুবাদ ঃ জাতি তত্ত্ববিদগণ তাহাদের দৃঢ় দাবি যে নিগ্রোজাতি ইউরোপীয়দের অপেক্ষা একটি নীচ শ্রেণী তাহা প্রমাণের জন্য ইহার ক্রমবর্দ্ধনের স্বীকৃত সত্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। (পৃষ্ঠা-৪৮)---- ইউরোপীয়দের একটি শারীরিক কাঠামো রহিয়াছে যাহা অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নততর নহে। (পৃষ্ঠা-৫২) অবিমিশ্র বা অকৃত্রিম জাতির মিথ্যা কাহিনী জাতি তত্ত্ববিদদের আবিষ্কার, যাহা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। (পৃষ্ঠা-৬৫)--- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে অতীতে কোন এক সময়ে এই দুই মহান জাতি একই দলভুক্ত ছিল। ইহার প্রমাণ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে, নিগ্রোজাতির মুখের আদলসহ প্রাচীন প্রস্তর যুগের দুইটি কঙ্কাল (১৯০৬ সালে আবিষ্কৃত গ্রিমালডি নমুনা) ফ্রাঙ্কো-ইতালীয়ান সীমান্তে মেনটনে গ্রোট দ্য এনফ্যান্টস-এ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে উক্ত মৌলিক দল ইউরোপীয় ও নিগ্রো নামে দুইটি মহান জাতিতে বিভক্ত হয়।

অতঃপর এই দুই মহান জাতি বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে পরিবর্তনশীল উষ্ণতা, আদ্রতা ইত্যাদির মধ্যে ছড়াই পড়ে এবং ফলে অত্যন্ত পৃথক মুখের আদলে প্রকাশ পায়। হাজার হাজার বছর ধরিয়া অত্যন্ত ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা কালো চামড়ার সুদানীজ নিগ্রো ও ক্ষীণ রঙ চামড়ার উত্তর অথবা পূর্ব ইউরোপীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। (পৃষ্ঠা-৭০) তাহাদের ক্রমবিকাশের কথায় বলিতে গেলে, তাহাদের শারীরিক ক্রমবিকাশের বিবেচনায় কোন জাতিই অন্য কোন জাতি অপেক্ষা উচ্চ বা নীচ নহে।

আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি গোপন করিবার জন্যই "আর্য" শব্দ একটি কাল্পনিক মতবাদের মুখোশ মাত্র।

জাতি তত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের মিথ্যা দর্শনে জিদ করে কেন ? ইহার উত্তর খুব সহজ। উচ্চ এবং নীচ জাতির মতবাদ, এক জাতির উপরে অন্য জাতির আধিপত্য বিস্তারের অধিকার, জাতি সমূহের মধ্যে যুদ্ধকে ন্যায় সম্মত প্রমাণ করে—সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি গোপন করিবার জন্যই ইহা কাল্পনিক মতবাদের মুখোশ মাত্র। (পৃষ্ঠা- ৯৮, প্রাগুক্ত)

ভাষা যদি জাতির আত্মার সন্তান হইয়া থাকে, তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনসাধারণের উত্তর অঞ্চলের আর্যজাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।

www.pathagar.com

কিন্তু ইহা তাহা নহে। কুর্দ এবং অন্যান্য অনেক জন সাধারণ যাহারা ভাষাগতভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় তাহাদের চামড়া ও চুল অধিকতর কালো।

অপরদিকে লম্বা, ক্ষীণ রঙের চক্ষু ও ক্ষীণ রঙের চুল বিশিষ্ট ফিন ও এসটোনিয়ানগণ তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য উত্তর উইরোপীয় নমুনার নিকটবর্তী হইলেও ফিন ও এসটোনিয়ানদের ভাষা সমূহের সহিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের কোনও মিল নাই।

এই রূপে, ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য মতবাদের "প্রথম ভাষা" ও "গোষ্ঠীগত পূর্ব পুরুষ" তাহাদের "আর্যজাতির" বৈশিষ্ট্য সহ খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং একই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট হয় যে কোন জাতিরই নিজেকে "আর্য উচ্চ বংশ" বলিবার অধিকার নাই।

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুও তাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"আভিজাত্য গর্ব এবং বর্ণাশ্রম সংক্রান্ত গোড়ামি সত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার না করে উপায় নেই—আমরা বর্ণ সঙ্কর জাতি। জাতের মর্যাদা নিয়ে যে সব জাত বাড়াবাড়ি করে তাদের মত আমাদের ধমনীতেও নানা জাতের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্য, দ্রাবিড়, তুরেনিয়, সেমিটিক ও মোঙ্গল জাতির উল্লেখ করা যেতে পারে।" (পৃষ্ঠা-১৫১, ভারত সন্ধানে)

www.pathagar.com

অধ্যায়-১০

রবীন্দ্র নাথের মৌলিক আরব জাতীয় পরিচয়

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌত্তলিক আরব কুশাইরিদেরই বংশধর। বাঙালীর আর্যামিকে তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

জগতে ইসলামের আবিভার্বের বহুপূর্বে প্রাচীন বঙ্গদেশে প্রাচীন পৌত্তলিক আরব জাতির উপনিবেশ ও বসতি সম্বন্ধে আলোচনায় এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের অধ্যায়-৬-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন সিরীয় নাবিকদের সহিত "কুশাইরী" নামে অপর একটি আরব জাতিও সমুদ্রের জল-পথে প্রাচীন বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশ সংলগ্ন আসামে আগমণ করিয়া উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ঢাকার জিনজিরার একটি কবরের শিলালিপিতে মৃত ব্যক্তির নামের সহিত কুশাইরী কুল উপাধি যুক্ত রহিয়াছে দৃষ্টে ধারণা হয় যে মৃত ব্যক্তি প্রাচীন পৌত্তলিক কুশাইরীদেরই অধঃস্তন বংশধর এবং ধর্মান্তরিত মুলমান ছিলেন। আর উক্ত জিনজিরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের 'কুশাইর' নামেও বঙ্গদেশে আরবের কুশাইরীদের উপস্থিতির ও অবস্থানের প্রমাণ মিলে। এতদ্ব্যতীত, বঙ্গদেশ সংলগ্ন আসামে একটি জাতির কুশারী নামেও উক্ত কুশাইরীদের পরিচয় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্ব কবি বলিয়া খ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে উপরে বর্ণিত প্রাচীন আরবের পৌত্তলিক কুশাইরীদেরই অধঃস্তন বংশধর ছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষের নামের সহিত যুক্ত কুল উপাধি 'কুশারী' শব্দটির সহিত উক্ত 'কুশাইরী' শব্দের ধ্বনিগত ঐক্যে এবং আরবের পৌত্তলিক কুশাইরী জাতি যেমন ব্যবসায়ী ছিল তেমনি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষও ব্যবসায়ী ছিলেন বিধায় সহজেই ধরিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষের কুল উপাধি যে কুশারী ছিল তাহা নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

"কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কুশারী বংশের অন্যতম অধঃস্তন পুরুষ। রবি বাবুর পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলনা জেলা ত্যাগ করিয়া কালিঘাটের নিকট গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।..................রবি বাবু যে খুলনা জেলার পিঠাভোগের কুশারী বংশ সম্ভূত উহারই সমর্থনে কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা-১২৪,১২৫, সুন্দর বনের ইতিহাস, এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল; ৩য় খণ্ড।)

www.pathagar.com

অতঃপর, রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যবহৃত কুল উপাধি "ঠাকুর" শব্দটি বিবেচ্য। জগতে ইসলাম ধর্মের আবিভার্বের পূর্বেকার আরবের মক্কার কাবা ঘরের এক দেবীর নাম ছিল "তাকুত"। এই "তাকুত" শব্দ হইতেই "ঠাকুর" শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেমন তাকুত> টাকুট>টাকুর> ঠাকুর। ইহা হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের আরবীয় পৌত্তলিক কুশাইরী পূর্ব পুরুষগণ উক্ত 'তাকুত' দেবীর ভক্ত ও পূজারী ছিলেন বিধায় তাকুত দেবীর নামানুসারে "ঠাকুর" কুল উপাধি ব্যবহারেরও অধিকারী ছিলেন। আর ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষদের আরব জাতীয়তা অধিকতর ভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

এতদ্ব্যতীত, কবি রবীন্দ্রনাথ "দূরন্ত আশা" শিরোনামে প্রকাশিত তাঁহার একটি কবিতায় নিজেও আরব পরিচয়ে পরিচিত হইবার জন্য দুরন্ত আশা ব্যক্ত করিতে গিয়া এক প্রকার দুরন্ত ভাষায়ই যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতপক্ষেই উপরিউক্ত পৌত্তলিক আরব কুশাইরীদেরই অধস্তন বংশধর তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও থাকিতে পারে না। আর বাঙালী জাতিও যে কোন প্রকারেই আর্য নহে, বরং প্রাচীন পৌত্তলিক আরব জাতি সম্ভূত যে একটি জাতি তাহাও উক্ত কবিতায় প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আর্যত্বের একেবারে হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উক্ত "দূরন্ত আশা" শিরোনামের কবিতায় বরীন্দ্র নাথ ব্যক্ত করিয়াছেন—

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনও ভাল মানুষ সেজে
বাঁধানো হুকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেজে
খেলিতে হবে কষে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসি স্তন্যপায়ীজীব
জন দশেকে জটলা করি' তক্তপোষে বসে।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি
গৃহের প্রতি টান,
তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা রসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান।

www.pathagar.com

বাঙালী মোরা ভদ্র অতি পোষমানা এ প্রাণ,
বোতাম আটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন,
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি'
চলেছি নিশিদিন,
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ।
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাঁধাহীন।

পাদুকা তলে পড়িয়া লুটি'
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
যেতেছ ফিরি ঘর,
ঘরেতে বসে গর্ব কর পূর্ব পুরুষের
আর্যতেজ দর্পভরে পৃথিবী থরথর।

হেলায় মাথা দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি,
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে
ভব্যতার গণ্ডি মাঝে শান্তি নাহি মানি।

কবিতাটিতে বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান বা রাশিয়ান কোনটাই হইতে চাহেন নাই, একমাত্র আরবই যে হইতে চাহিয়াছেন ইহাতেই কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ একদিকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার বাহিরের বাঙালী সমাজের ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজের পদ লেহন করিয়া ইংরেজ প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মিথ্যা আর্য উপাধি গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া প্রকারান্তরে বাঙালী যে প্রকৃত পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনাই করিয়াছে, বাঙালীর সেই আত্মপ্রবঞ্চনার আর্যপরিচয়কে যেমন অত্যন্ত ঘৃণা ও তিরস্কারের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; অপরদিকে ঠিক তেমনি তাঁহার ও তাঁহার বাহিরের

www.pathagar.com

বাঙালী সমাজের আরব জাতীয় প্রকৃত পরিচয়কে প্রকাশ করিবার জন্য অত্যুগ্র গোপন বাসনাও ব্যক্ত করিয়া প্রকারান্তরে এই সত্যই প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে তিনি ও তাঁহার বাহিরের বাঙালী সমাজ প্রকৃতপক্ষেই পৌত্তলিক আরবদের এতদ্দেশে আগত বংশধরদের অধস্তন বংশধর। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, "হিন্দুরা ভারত ভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না, দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এখানে অবস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশীয়েরা তো এ বিষয়ে একটি অতি মাত্রায় হীনজাতি হইয়া পড়িয়াছে।....................হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই।" (পৃষ্ঠা-১, ১২৪, ১২৫, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ।) বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন, "বাঙালীর ইতিহাস নাই। সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যায় তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।"

তাই ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মত একজন উচ্চ শ্রেণীর ও অতিশয় শক্তিশালী লেখক ও চিন্তাবিদ শ্রী অক্ষয় কুমার দত্তেরও বঙ্কিম চন্দ্রের উপরিউক্ত উক্তির বিষয়ে চিন্তা করিয়া একেবারে নিশ্চুপ বা স্থির থাকিতে না পারিয়াই শেষ পর্যন্ত হিন্দু জাতির, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কোনও সূত্র হইতে হয়ত জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাচীন জড় পূজক ও পৌত্তলিক বাঙ্গালী জাতি প্রাচীনজড়-পূজক ও পৌত্তলিক আরব জাতি হইতে উদ্ভূতই একটি স্বতন্ত্র জাতি। কিন্তু আত্মবিস্মৃত ও মিথ্যা আর্য গৌরবে ও অহমিকায় স্ফীত ভব্যতার ধারণায় আচ্ছন্ন বর্তমানের হিন্দু বাঙালী সমাজে তিনি তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না বলিয়া অসহ্য মর্মযাতনা ভোগ করিতেছেন তথা শান্তিও পাইতেছেন না। তাই হিন্দু বাঙালী সমাজের বাহিরে অন্য কোথাও যাইতে পারিলে তিনি বাঁচিয়া যাইতেন বলিয়াও কবিতাটির সমাপ্তি রেখা টানিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতের এককালীন রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণন তাঁহার রচিত "দি ফিলসফি অব ট্যাগোর (The Philosophy of Tagore) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনও এক সময়ে তাঁহার কবিতা সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) তাঁহার কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেহেতু বলিয়াছেন যে কবিতায় তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই সেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপরিউক্ত "দুরন্ত আশা" কবিতায়

www.pathagar.com

বাঙালীর মিথ্যা আর্যত্বের গৌরব ও অহমিকাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও তিরস্কারের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার নিজের তথা তাঁহার বাহিরের বাঙালী সমাজের আরব হইবার অর্থাৎ মৌলিক প্রাচীন আরব-জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হইবার যে অত্যুগ্র বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে না বলিয়া উহাকে প্রকৃতপক্ষেই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। সঙ্গতকারণেই তাই রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতপক্ষেই প্রাচীন পৌত্তলিক আরব কুশাইরীদেরই এক অধঃস্তন বংশধর এবং প্রাচীন বাঙালী জাতিও যে প্রাচীন জড় পূজক ও পৌত্তলিক আরব জাতি সম্ভূত স্বতন্ত্র একটি জাতি তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

www.pathagar.com

অধ্যায়-১১

বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ

বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশই সর্বাপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল। বাংলাদেশে মুসলমানদের এই সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় যে বাংলায় মুসলমান শাসন ও মুসলমান সুফী সাধকদের ধর্ম প্রচারের কারণেই বাংলায় মুসলমানরা এত অধিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহা হইলে তো দ্বিতীয় প্রশ্নও উঠিতে পারে যে বাংলার পূর্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেওতো মুসলমান শাসন ছিল এবং মুসলমান সুফী সাধক ধর্মপ্রচারকগণও তো বাংলার পূর্বেই তৎসমুদয় অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তবুও সে সমুদয় অঞ্চলের মুসলমানগণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিল না কেন? কেবল মাত্র বাংলায়ই এত অধিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা কেমন করিয়া লাভ করিল? ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হইবে যে শুধুমাত্র মুসলমান শাসন ও তৎসঙ্গে মুসলমান সুফী সাধক ও ধর্ম প্রচারকদিগের কারণেই বাংলায় মুসলমান ধর্মের প্রসারের দ্বারা মুসলমানদিগের এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ হয় নাই। তবে কেমন করিয়া এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ হইল, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

মুসলমানদের এ সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ আরও গভীরে অনুসন্ধান করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, বাঙালী জাতি মূলতঃ তথাকথিত দ্রাবিড় অর্থাৎ আরব জাতি হইতে উদ্ভূত একটি জাতি বলিয়া আরবীয় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের কালেই আরব নাবিক ও বণিকদের মাধ্যমে এই বাংলাদেশে পৌঁছা মাত্রই সঙ্গত কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এ দেশবাসীর হৃদয়ে শিকড় গাড়িয়া বসে। এমন কি এ দেশবাসী সাধারণ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ তখনও প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তথা ইসলামের ধর্ম ও মত নিরপেক্ষ সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের এক অভূতপূর্ব মহামানবতার আদর্শ প্রকারান্তরে তুলিয়া ধরিয়া এই দেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ-জয়যাত্রার সূচনা করিয়াছিল। সুবিখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক মার্কো পলোর বিবরণী হইতেও এই সত্যের আভাস পাওয়া যায়। "মার্কো পলো লিখিয়াছেন যে সুমাত্রার অধিবাসীরা যদিও প্রধানতঃ দেবদেবীর উপাসক তবু সামুদ্রিক বন্দর এলাকায় যাহারা বসবাস করে তাহারা সারাদিন মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিয়াছে।" (Indonesia, Detas C. Smith)। সোজা কথায়, বাঙালী তথাকথিত দ্রাবিড়

www.pathagar.com

অর্থাৎ আরব জাতির বহু দূরাগত রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় বলিয়াই আরব বণিক ও নাবিকদের মাধ্যমে আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের সংবাদ শুনিয়া স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের পূর্ববর্তী স্বদেশের টানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং এইরূপেই আরবীয় ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিয়া বাংলাদেশে মুসলমানদিগকে অত্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা দান করে। বাঙালীর এই মৌলিক আরবত্বের কারণেই আজ পর্যন্তও আর্য হিন্দুগণ বাঙালী হিন্দুদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে 'চেরর (মালাবার) রাষ্ট্রের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন-------' (বিশ্বকোষ, ১৪-২৩৪)। তৎকালে আরব বণিক ও নাবিকগণ স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া মালাবার পৌঁছিয়া মালাবার হইতে বাংলাদেশ ও কামরূপ হইয়া চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। তাই বাংলাদেশেও ইসলাম ধর্মের প্রচার তৎকালেই যে শুরু হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ কথার সত্য ও ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মালাবারের অমুসলমান রাজা তাঁহার অভিষেক উৎসব কালে আরবী পোষাক পরিতেন। আর সে অভিষেক উৎসব পরিচালনা করিত একজন মোপলা যাহার পূর্ব পুরুষ ছিল আরব। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান কালে তলোয়ার তুলিয়া ধরিয়া আরবীতে উচ্চারণ করিতেন— "মক্কা হইতে আমার পিতৃব্যের ফিরিয়া আসা পর্যন্তই আমি এই তরবারি ধারণ করিব।"

ছাহাবী আবু হোরায়রা বলিয়াছেন—"রসূলুল্লাহ্ আমাদিগকে হিন্দ -অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়াছেন। অতএব যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকি তবে আমি তাহাতে আমার জান ও মাল ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইহাতে যদি আমাকে কতল করা হয় তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিগণিত হইব আর যদি ছহী-ছালামতে ফিরিয়া আসি তবে আমি হইব দোষমুক্ত আবু হোরায়রা। (নাছায়ী ২৬২পৃঃ)" (পৃষ্ঠা-৫৭, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আকরম খাঁ।) অতএব, বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়।

বাবা আদম শহীদ

১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের পূর্বেই যে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের অধিবাস ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে।

www.pathagar.com

"In the course of the twelfth century, Islam was well established in the east coast and the Muslims Seemed acquired sufficient importance for they were noticed alongwith the Vaisyas as to bring presents to the Ceylonese general who invaded the Pandua Kingdom in 1171-72 A.D. (Eliot, History of India, iii, 32)

ঐতিহাসিক এলিয়টের উপরিউক্ত ইংরেজী ভাষ্যতেই সুস্পষ্ট যে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগে ১১৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৩ বৎসর পূর্বেই এই উপমহাদেশের পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাইত ১১৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে জনৈক সিংহলী প্রধান সেনাপতি যখন বাংলাদেশের পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার নিকট উপহার আনয়নকারী বৈশ্যদের সহিত মুসলমানদিগকেও দেখা গিয়াছিল। সুতরাং ১১৭১-৭২ খৃষ্টাব্দ কাল হইতে বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেনের ১১৬০-১১৭৮ খৃষ্টাব্দের রাজত্ব-কালের মধ্যে বিক্রমপুর-বাংলায় ও মুসলমান সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বুঝিতে পারা যায়। সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের দাওয়াতেই সাধারণ প্রজাদের উপরে রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচার ও ইসলাম বিরোধিতাকে বন্ধ করিয়া ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র নিষ্কন্টক করিবার জন্য হজরত বাবা আদম শহীদ সাড়ে সাত হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া সুদূর মক্কানগরী হইতে সমুদ্র পথে বিক্রমপুর-বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল সেনও মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। আর এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের পূর্বেই। সাড়ে সাত হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া সমুদ্র পথে বাবা আদম শহীদের বিক্রমপুর-বাংলায় আগমনের ঘটনাকে যাহারা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করেন তাহারা নিম্নে উদ্বৃত ভাষ্যের দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন যে তখনকার দিনে সাড়ে সাত হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া ও সমুদ্র পথে বিক্রমপুর-বাংলায় আগমন করা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। নিম্নে উদ্বৃত ভাষ্যেও উক্ত সত্যের পরিপূরক আভাস মিলে—

"Even China entered the fray at one point early in the 15th century, with a fleet of 62 ships and an escort of some 3,700 men, after the king of Malindi had sent the Chinese emperor a

www.pathagar.com

gift of a giraff ! Many of the traders stayed to settle and intermarry with the Africans." (Page-35, East Africa, Geoff Crowther.)

বাবা আদম শহীদের উপরিউক্ত সত্য ঘটনার কারণেই ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের শাসনামলে প্রতাপশালী সেনাপতি মালিক কাফুর মুস্লিম স্থাপত্য শিল্পের অত্যন্ত সুন্দর বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত, অত্যন্ত শ্রম ও ব্যয়বহুল একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বাবা আদম শহীদের মাজারের পার্শ্বে, বাবা আদম শহীদের পবিত্র স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখিবার জন্য ; যাহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতঃপর, উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই ইংরেজ শাসনামলে ইংলণ্ডের সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ১৯২২ সালের ২রা অক্টোবর বাবা আদম শহীদের উক্ত মাজারটিকে protected monument বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছিলেন। (Calcutta Gezzette, October, 4, 1922 দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া, উক্ত মাজারটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৎকালে একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায়, বাবা আদম শহীদের মাজারটি যে বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রাচীনতম কীর্তিরই নিদর্শন তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিক্রমপুরের কোন কোনও মুসলমান ভদ্রলোকদের পূর্ব পুরুষের পারিবারিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাবা আদম শহীদের প্রকৃত নাম শেখ মহিউদ্দীন আবু ছালেহ আরাবী। পীর দরবেশের প্রকৃত নাম উচ্চারণ করা বেয়াদবি বিবেচনা করিয়া ভক্তেরা সাধারণতঃ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোনও একটি নাম দিয়াই তাহাদের পীর দরবেশের পরিচয় দিয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—'মাওলানা ভাসানী', কামরাঙীরচরের 'হাফেজ্জী হুজুর'। ঠিক তেমনি সুফী দরবেশ শেখ মহিউদ্দীন আবু ছালেহ আরাবীও 'বাবা আদম' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

এই বাবা আদম ও ষোড়শ শতাব্দীর বা তারও পরে রচিত আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতের 'বায়াদুম্ব' যে একই ব্যক্তি নহেন তাহা নিম্ন বর্ণিত ঐতিহাসিক সত্য হইতে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইবে। "কংস নারায়ণকে (১৪০৫–১৪১৭ খৃঃ) 'বারেন্দ্র কুল' গ্রন্থে দ্বিতীয় বল্লাল সেন বলা হইয়াছে। এই কংস নারায়ণই রাজা গণেশ"। (গৌড়ের ইতিহাস, রজনী কান্ত চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-১৪৮–৪৯)। এই রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেব নাম গ্রহণ করিয়া রাজা বল্লাল সেনের মতই মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করিতেন বলিয়া রাজা

www.pathagar.com

গণেশের কালে পাণ্ডুয়ার সুফী দরবেশ ছিলেন যে নুর কুতুবুল আলম সেই নুর কুতুবুল আলমও শায়েস্তা করিয়াছিলেন রাজা গণেশকে, যেমন বাবা আদম শায়েস্তা করিয়াছিলেন রাজা বল্লাল সেনকে। তাই রাজা গণেশের পরে ষোড়শ শতাব্দীতে বা তারও পরে আনন্দ ভট্ট তাহার বল্লাল চরিতে রাজা গণেশকে যেমন রাজা বল্লাল সেনের সহিত তুলনামূলক ভাবেই 'বল্লাল সেন' বলিয়াছেন, তেমনি নূর কুতুবুল আলমকেও বাবা আদমের সহিত তুলনামূলকভাবেই 'বায়াদুম্ব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গতকারণেই, আনন্দ ভট্টের 'বল্লাল চরিত' গ্রন্থের কল্প-কাহিনীর বায়াদুম্ব-এর ভিত্তিহীন অজুহাত তুলিয়া বাবা আদম শহীদের উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা চলে না। বিক্রমপুরের রামপালে বাবা আদম শহীদের মাজার তাই অতিবাস্তব ঐতিহাসিক সত্যেরই নিদর্শন সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, ইহাতে এই সত্যও ধরা পড়িতেছে যে, বঙ্গদেশে মুসলমান শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে শিকড় গাড়িয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল বিধায় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অতি সহজে বঙ্গ বিজয়ও সম্ভব হইয়াছিল। আর এই সমুদয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মহানুভবতা লক্ষ্য করিয়া হিন্দু আমলের ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনসাধারণ অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান শাসনকে মানিয়া লইয়াছিল। তাইত এতদ্দেশে সুদীর্ঘকালের মুসলমান শাসনামলেও অমুসলমান হিন্দুদিগকে মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায় নাই। "তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, রমেশ চন্দ্র মজুমদার)। নিম্নে উদ্বৃত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নিদর্শন প্রণিধানযোগ্য।

"Another equally important factor about the increase of muslim population was the missionery and proselytising zeal of the great Sufis who preached the principles of Islam. In fact the missionery activiteis were first started by Arab navigators and merchants long before the conquests of Bengal by Buktiar Khilji. The sufis came from the west by hazarding perilious journeys and sacrificing everything dear and precious in life only to raise the degraded Hindus of Bengal to the high standard of Islamic civilization. The masses of Bengal were

www.pathagar.com

then groaning under the heals of the heaven-born Brahmin oligarchy who used them as helots and out castes and denied them even the elementary rights of human beings. A European writer says, "No where in India Hinduism was so debased and so carrupt as in Bengal. No where have the masses been treated with grater contumely and inhumanity as in Bengal." At that moment the sufis offered them complete equality in matters of their social and spiritial needs. They also offered them a comprehensive code of Law in the form of the Holy Quran like which they could not have dreamt of. So the Hindus finding a safe asylum under their new conqueros began joyfully embracing Islam in thousands. In corurse of this peaceful and righteous pursuits many sufis lost their lives in the hands of enemies----

Luckily the question of Bengali and non-Bengali did not then crop up, because the incomers fully identifeid themselves with the Bengalis. They shared our joys and sorrows and became one of us. (Pages-XII, XIII, Introduction, Glimlpses of old Dhaka, Syed Muhammad Taifur).

বাঙালী তথাকথিত দ্রাবিড় অর্থাৎ আসলে প্রাচীন আরব জাতি সম্ভূত একটি জাতি বলিয়াই পরবর্তীকালে আরব বণিক ও নাবিকগণ বাংলাদেশে আগমন করিলে অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন বাঙালী সমাজে এক হইয়া মিশিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শাসনামলে ও ইংরেজ শাসনামলে বাংলার সেই অতীত সত্যের ইতিহাসকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এমনি করিয়া বিকৃত করা হইয়াছে যে, আজ সেই বিকৃত ইতিহাসের পাতা হইতে প্রাচীন বাংলাদেশের সেই অতিসত্য ইতিহাস আবিষ্কার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

www.pathagar.com

বাংলার মূল

দ্বিতীয় ভাগ

ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের প্রাচীনতম যোগসূত্রে
বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মূল
ইতিহাসের কথা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

বাংলার ইতিহাস নাই

"এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের (বাংলাদেশের) প্রি-হিস্টরি জানা যায় নি।" —প্রফেসর এ, এল, ব্যাসাম।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতীতকাল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্যের একটি কথা বলিয়াছেন।

'হে অতীত! তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।'

অর্থাৎ পৃথিবী জুড়িয়া নানা কালের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অতীত কালই প্রকৃতপক্ষে কোনও না কোন প্রকারে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাজ করিয়া চলিয়াছে, যাহা আমরা ভাবিয়া দেখিবারও ফুরসৎ পাই না। এমন কি বর্তমান কালের পর যে ভবিষ্যৎ কাল, সে ভবিষ্যৎ কালকেও যে অতীত কালই বর্তমান কালের পশ্চাতে থাকিয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া আগাইয়া দিতেছে তাহাও রবীন্দ্রনাথ অব্যক্ত রাখেন নাই, বলিয়াছেন—'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।' ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলিয়াছেন—'দেশকে বুঝতে হলে দেশের অতীতকে বুঝতে হবে।' (পৃষ্ঠা-৪৩, ভারত সন্ধানে)।

সুতরাং বর্তমান কালকে জানিতে বুঝিতে হইলে যেমন অতীত কালকে জানিতে বুঝিতে হইবে তেমনি ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলেও অতীতকাল সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। বর্তমান ও অতীতের বিষয়ে এইরূপ জ্ঞান আহরণ কার্য যেহেতু ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয় সেহেতু অতীতকে বর্জন করিয়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন কালেরই ইতিহাস ত্রুটিমুক্ত, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

আমাদের বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের বাংলাদেশের প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার যোগসূত্রে এ যাবত কোন ইতিহাস যেমন রচিত হইতে পারে নাই তেমনি কোন প্রকৃত ইতিহাসই যে রচিত হইতে পারে নাই তাহা সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে—

www.pathagar.com

"বোধ হয় না কি যে বাংলার ইতিহাসের কিছু সার কথা আছে? সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙালীর ইতিহাস আছে কি? সাহেবরা বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে ভুরি ভুরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত ভারি যে ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান, লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকি তালে বাঙলার ইতিহাস লিখিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

অনভিজ্ঞ ইংরেজরা বাঙালীর ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায় বাঙলার পূর্ব গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।.......... আমাদের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস নাই।..........বাঙলার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র। বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙলার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে, যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর আমাদের সর্ব সাধারণের মা জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?" (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাঙলা রচনা, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৪)।

অনুরূপভাবে ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলিয়াছেন—"ভারতের যে ইতিহাস আমাদের অধিকাংশকেই পড়তে হয়েছে তা বেশির ভাগই ইংরেজদের লেখা, তাতে পাওয়া যায় ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর; আর পাওয়া যায় তাদের এ দেশে আসার আগের হাজার বছর যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে এক প্রকার খোলাখুলি ভাবেই অবজ্ঞা প্রকাশ।" (পৃষ্ঠা-১০৮, ভারত সন্ধানে)।

"ইংরেজ ও কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিক এ দেশের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং ইংরেজ যুগ।" (পৃষ্ঠা-২৫৮, ভারত সন্ধানে, জওহর লাল নেহেরু।) ইংরেজ "এ দেশে আসার আগে হাজার বছর যা ঘটেছিল" বলিয়া উপরের উদ্ধৃতির ভাষ্যে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ইংরেজের আগের যে হাজার বছরের ইতিহাসের কথা বলিয়াছেন সে হাজার বছরের মধ্যে এতদ্দেশের ইতিহাসের উপরিউক্ত প্রাচীন বা হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগকে ধরিতে হইলেও শুধুমাত্র মুসলমান যুগের ইতিহাসের কথাই বিবেচনা করিতে হইবে। কেননা, মুসলমান আমলের পূর্বেকার প্রাচীন যুগ বা হিন্দু যুগে এতদ্দেশে ইতিহাস লেখার প্রচলন ছিল না। যাহা ছিল তাহা শুধু মাত্র হিন্দু রাজা বা সামন্ত প্রভুদের বংশপঞ্জি মাত্র। কিন্তু

www.pathagar.com

কাহারও বংশপঞ্জি তো ইতিহাস হইতে পারে না। তাই ইংরেজ "এ দেশে আসার আগের হাজার বছরে"র ইতিহাস বলিতে সোজা কথায় একমাত্র মুসলমান যুগের ইতিহাসের কথাই বলিতে হইবে। মুসলমান যুগ হইতেই এই দেশে সর্ব প্রথম ইতিহাস রচনার সূচনা হয়। মুসলমান যুগে এতদ্দেশের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ইংরেজরাই যে তাহাদের মহাফেজখানায় লুকাইয়া ফেলিয়াছিল সেই সংবাদ ইংরেজদের লেখা হইতে জানা গিয়াছে বলিয়া বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান যুগের ইতিহাস সমূহ এইরূপে লোক চক্ষুর আড়াল করিয়া তদস্থলে ইংরেজদের মনগড়া মিথ্যা ইতিহাস রচনা ও প্রচলিত করিয়া এতদ্দেশে ছলে-বলে কৌশলে যে কোনও প্রকারেই হোক ইংরেজের শাসন দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকাইয়া রাখিবার জন্যই যে ইংরেজ উহা করিয়াছিল তাহা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও স্পষ্ট—"...... ইংরেজরা বাঙলার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায় বাঙলার পূর্ব গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড)।

দাদের উপর বিষ ফোড়া

এই তো গেল, একদিকে ইংরেজ কর্তৃক এতদ্দেশের ইতিহাস বিকৃত করিয়া মিথ্যা ইতিহাস রচনার কথা। অপরদিকে, দাদের উপর বিষ ফোড়ার মত এতদ্দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ইংরেজের দেখাদেখি এতদ্দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ইংরেজেরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া বিভিন্ন পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া উহাদের বয়স গোপন করিবার জন্য রচনার দিন তারিখ উল্লেখ না করিয়া তন্মধ্যে তাহাদের মনগড়া মুসলমান যুগের পূর্ববর্তী এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অতীব কাল্পনিক মিথ্যা বিবরণ দিয়া ইংরেজের উপরেও টেক্কা মারিয়া এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল। ঐ সমুদয় পূরাণাদি ধর্মগ্রন্থে রচনার দিন তারিখ উল্লেখ না থাকায় উহাদের বয়স গোপন থাকায় ঐ সমুদ গ্রন্থ যে ইংরেজের দেখাদেখি ইংরেজ আমলেই রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। প্রয়াত প্রখ্যাত অধ্যাপক বিজয় চন্দ্র মজুমদারও তাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"কিন্তু এই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বয়স কত, তাহা যখন সুনির্দিষ্ট নয়, তখন ঐ দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গদেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বলা চলে না।" (পৃষ্ঠা-৪৩০, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, নব্য ভারত, কার্তিক, ১৩১৭।)

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত, উক্ত পুরাণাদি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত বিবরণ হইতে এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জানিবার যে উপায় নাই তাহা নিম্নে উদ্বৃত ভাষ্য হইতেও বোধগম্য হইবে।

"Although traditional history has been built up for the period antedating the historical beginning on the basis of the accounts given in the puranas, the historians themselves agree that these accounts are vitiated by exaggeration, mythological details, pronounced religious bias and the divergencies in the texts of the different puranas and subsquent modifications and revisions of the same by different scholars at different periods. So nothing substantial can be gathered for linking the geological past with the beginning of history." [Rivers we live with (5) the Missing Link, M. I. Chowdhury. The Pakistan Observer, July 10, 1966]

অর্থাৎ, "পুরাণাদি গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণের ভিত্তিতে ইতিহাসের সূচনা কালকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া যদিও ঐতিহ্যগত ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে তথাপি ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই স্বীকার করেন যে, পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহে প্রদত্ত ঐ সমুদয় বিবরণ অতিরঞ্জণের, সবিস্তারে কাল্পনিক বিবরণের, সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্টতার এবং বিভিন্ন পুরাণের মূল পাঠের বিভিন্নতার তথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের কৃত বিভিন্ন পরিবর্তনের ও পুনঃ পুনঃ সংশোধনের দ্বারা বিকৃত করা হইয়াছে। সুতারাং ইতিহাসের সূচনা কালের সহিত ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের যোগসূত্র রচনার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।" এতদ্দেশের প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার বাস্তবতার প্রকৃত পরিচয়ের সহিত বাংলাদেশের এ যাবতকালের রচিত ইতিহাসের কোনও যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাইয়া এতদ্দেশের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া আখ্যায়িত হিন্দু ধর্মের পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহে অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত পক্ষে কোন কিছুই জানিতে না পারিয়াই ভূ-বিজ্ঞানী এম, আই, চৌধুরী যে উপরিউক্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা উক্তিটিতেই সুস্পষ্ট। ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উপরিউক্ত সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে—

"আমি সর্বদাই ধর্মপুস্তক পড়তে ইতস্তত করেছি। এদের সম্বন্ধে দাবি করা হয় যে এরা প্রত্যেকটি সমগ্রভাবে অভ্রান্ত। এ কথায় আমার আস্থা নেই।.... পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধেও আমার মনের প্রতিক্রিয়া এইরূপ। এগুলিকে প্রকৃত ঘটনা বলে বিশ্বাস করলে ব্যাপারটা অসঙ্গত ও হাস্যকর হয়ে উঠবে।"

www.pathagar.com

(পৃষ্ঠা-৭৬,৭৭, ভারত সন্ধানে)। সুতরাং হিন্দু ধর্মের পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহ হইতে এতদ্দেশের যে সমূদয় প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহা যে প্রকৃত ইতিহাস হইতে পারে নাই তাহা সকলেই বুঝিবেন।

উপরন্তু, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হইয়া থাকিলেও বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত পরিচয় যে আজ পর্যন্তও অজ্ঞাতই রহিয়াছে তাহা নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

"It is dangerously confounding for a nation to live anonymously for any length of time. Anonymously, that is in the historical sense. The truth about us as a nation is that we have so far not made a full and sensitive bid to know the truth about us. And that is because, frightfully indeed, we have lived so far without a properly perceptively recorded history of our own.

What has been done even by our scholars is chiefly writing text books for our students, the motivation being obviously professional and commercial. We do not say, we do not need text books, but we mention the fact to show that the demands made on our scholars, teachers, educationists, universities, research centres etc. by a new born nation anxious to know itself in relation to its past present and future is yet far from, fulfilled....." (Editorial, Writing our history, The Pakistan Observer, Dacca, January, 28, 1970)

অর্থাৎ "একটি জাতির পক্ষে যে কোন দীর্ঘ সময় ধরিয়া নাম পরিচয় বিহীনভাবে জীবিত থাকা বিপজ্জনক ভাবেই বিভ্রান্তিকর। নাম-পরিচয় বিহীন অর্থাৎ ঐতিহাসিক ধারণায়। একটি জাতি হিসাবে আমাদের সম্বন্ধে সত্য ইহাই যে, আমরা এ যাবৎকাল আমাদের জাতির সত্য পরিচয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য পরিপূর্ণভাবে ও গভীরভাবে আগ্রহী হইতে চেষ্টা করি নাই। এবং ইহারও কারণ যে প্রকৃতপক্ষে ভীতিজনকভাবেই আমরা সম্পূর্ণভাবে এবং প্রত্যক্ষ করা যায় এমনভাবে আমাদের নিজস্ব লিপিবদ্ধ ইতিহাস ব্যতিরেকেই এ যাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি।

এমন কি আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা আমাদের ছাত্রদের জন্য প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া যাহা করা হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবেই পেশাদারি ও ব্যবসাদারি। আমরা বলি না যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা এই সত্যটা দেখাইবার জন্য উল্লেখ করি যে, আমাদের পণ্ডিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের, শিক্ষকদের, শিক্ষাবিদদের, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের, গবেষণা কেন্দ্র সমূহের ইত্যাদির উপরে একটি নবজাত জাতি তাহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সূত্রে নিজেকে জানিবার জন্য যে আশা পোষণ করিয়াছিল তাহা এ যাবৎকাল পূর্ণ হয় নাই।"

উপরের উদ্বৃত ভাষ্যে, আমরা আজ পর্যন্তও যে নাম-পরিচয় বিহীন একটি অজ্ঞাতমূল জাতি হিসাবে জীবিত থাকিয়া আমাদের জাতির সমূহ বিপদের কারণ ঘটাইতেছি, এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি অপরিহার্য বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। কেননা, এই পরিচয়ের অভাবেই আমরা বাংলাদেশের বাঙাল বাঙালীরা আজ পর্যন্তও 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায়ই আছি। ফলে, আমরা স্বদেশে বাস করিয়াও বিদেশী, আর পরদেশে বাস না করিয়াও প্রবাসী। অর্থাৎ বাঙাল নামে আখ্যায়িত বাঙালীরা বাংলাদেশের নির্ভেজাল খাঁটি বাঙালী অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের আরবীয় ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের কারণে বাঙালী হিন্দু সমাজের কিছু সংখ্যক লোক তাহাদের ঘোরতর ইসলাম ধর্ম বিদ্বেষ বশতঃ বাঙালী মুসলমানদিগকে খাঁটি বাঙালী বিবেচনা করিতে না পারিয়া বাংলাদেশ ছাড়িয়া মক্কা মদিনায় যাইবার পরামর্শও দিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে হিন্দু মহাসভার সভাপতি প্রয়াত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী মুসলমানদের আরবদেশে খেজুর তলায় হটানোর হুমকি দিলে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক শ্যামা প্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেশ ছেড়ে যেতে হলে তোমাদেরই যেতে হয়। কারণ তোমরা আর্য, আর আর্যরা এ দেশে আক্রমণকারী আগন্তুক জবর দখলদার।" শ্যামা প্রসাদের মত সংকীর্ণ মনা ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় হিন্দুরা বাঙালী মুসলমানকে তাঁহাদের আরবীয় ইসলাম ধর্মের কারণে বাংলাদেশের প্রকৃত অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে না পারিয়া বাঙালী মুসলমানকে বাংলাদেশ হইতে আরবের মক্কা-মদিনার খেজুর তলায় হটাইয়া দিয়া বাংলাদেশকে একমাত্র হিন্দুর দেশেই পরিণত করিতে চায়। কিন্তু অবাঙালী হিন্দুরা যে বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দুকেও খাঁটি হিন্দু বিবেচনা করিতে না পারিয়া অবাঙালী হিন্দুদের অধীনে বাংলাদেশেও একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া মনে করে এই মাত্র কারণেই যে অবাঙালী হিন্দুদের ধারণায় বাংলাদেশও একটি হিন্দু দেশ, আর অবাঙালীরাই খাঁটি হিন্দু। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এ সত্য সুস্পষ্ট—

"এ কথাও মনে রাখতে হবে যে যৌথ জাতীয়তা ও সামাজিক উদারতার পথে এগিয়েছিল বলেই বাংলার হিন্দু মুসলমানকে অবাঙালীরা খাঁটি হিন্দু বা

www.pathagar.com

খাঁটি মুসলমান বলে অনেক সময়েই মনে করে না।" (পৃষ্ঠা-৫৬, বাঙালী, প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ)। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যেহেতু মূলতঃ আর্যজাতি বহির্ভূত অতি প্রাচীন প্রাগার্য সুসভ্য, আরবজাতি সম্ভূত জাতি সেহেতুই তথাকথিত আর্য নামধারী অবাঙালীরা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানকে খাঁটি হিন্দু বা খাঁটি মুসলমান বিবেচনা করিতে দ্বিধা বোধ করে। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান মূলতঃ আর্যদের অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন প্রাগার্য সুসভ্য আরব জাতি সম্ভূত জাতি হইয়া থাকিলেও বাংলার ও বাঙালীর প্রাচীন ও প্রকৃত ইতিহাসের অবর্তমানেই তথাকথিত আর্য নামধারী অবাঙালীরা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই অবজ্ঞা করিয়া অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইতেছে।

সঙ্গত কারণেই, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত একজন বিখ্যাত বাঙালী হিন্দুও একদিন বলিয়াছিলেন, "ফজলুল হক মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত যেমন খাঁটি মুসলমান তেমনি মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালী।" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত।) উক্তিটি ব্যক্তিগতভাবে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক সম্পর্কে উচ্চারিত হইয়া থাকিলেও প্রকারান্তরে উক্তিটির মাধ্যমে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে যে খাঁটি মুসলমানীত্বে ও খাঁটি বাঙালীত্বে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। কেননা নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতেও বাঙালী মূলতঃ দ্রাবিড় জাতি সম্ভূত একটি প্রাগার্য জাতি। আর দ্রাবিড় জাতির মূল অধিষ্ঠান ভূমি যেহেতু আরবের বাহরাইন ও দাহরানে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেহেতু দ্রাবিড় জাতিও আরব জাতির অন্যতম শাখা বিধায় দ্রাবিড় বলিতে আরব জাতিকেই বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে।

১৯৭৩ সালের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস সম্মেলন

ইতঃপূর্বে বাংলার ও বাঙালীর প্রাচীন ও প্রকৃত ইতিহাস অবর্তমানের অর্থাৎ না থাকিবার যে কথা বলা হইয়াছে ১৯৭৩ সালের ১২ই মে হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ইতিহাস সম্মেলনের নিম্ন বর্ণিত সংবাদ ভাষ্য হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

"এ সম্মেলনে দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিকেরা যোগ দিয়েছিলেন।---- সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন অনেকে সত্যি কিন্তু সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন দু'জন—ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এবং প্রফেসর ব্যাসাম।--- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুই দিক পাল এরা দু'জন।"----

www.pathagar.com

(ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেন) "ভারত বর্ষে আগে বাঙালীদের আর্টিকুলেশনের পথ বন্ধ ছিল। তাদের কোন সামাজিক ক্ষমতা ছিল না। এখন শতাব্দীর পর সে সুযোগ এসেছে। ---- ইতিহাসে এই প্রথম সুযোগ এসেছে কিছু করার যা না করলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ ক্ষমা করবে না। ----- "(ডঃ রায়ের প্রতি সাংবাদিকদের প্রশ্ন)"—সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?" (উত্তরে) ডঃ রায় বললেন, সম্মেলনে অনেক প্রবন্ধ পড়া হচ্ছে, বাংলাদেশের অনেকেও প্রবন্ধ পড়ছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই এমন প্রবন্ধ লেখেননি যা ভবিষৎ কিছুর উপর আলোক সম্পাত করতে পারে। পাণ্ডিত্যের চেয়েও দরকার এখন দূরদৃষ্টির। সম্মেলনে এমন কোনও প্রবন্ধ নেই যা বর্তমান কালের উপর আলোক সম্পাত করতে পারে। ---- (ডঃ রায়কে আর একটি প্রশ্ন) "আপনি বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্ব কি লিখবেন না ?" উত্তরে তিনি একটু হেসে বললেন, ইউ কান্ট ফোর্স ইনভেন্টস (You can't force invents)। সারকামস্টেনস (Circumstance) এখনও তৈরী হয়নি। তৈরী হলেই লিখব। আর লিখবই বা কিভাবে। বাংলাদেশের খবরাখবর এতদিন জানতাম না। আর দেখ প্রথম পর্বও বহু দিন ছাপা নেই। এখনও ছাপাতে দেয়নি। কারণ ঐ বই বের হওয়ার পর এক ময়নামতি থেকেই ১১টা তাম্র শাসন পাওয়া গেছে যা আমি দেখিনি। নতুন কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ সব পরীক্ষা না করে, না জেনে কি লিখবো?

(ডঃ রায়কে শেষ প্রশ্ন)- বাঙালীর ইতিহাসে আপনি লিখেছেন, বাঙালীরা হলো বেতস লতার মত। ঝড় আসলে নুয়ে পড়ে। ঝড় শেষ হলে মাথা তুলে দাঁড়ায়, আপনি কি এখনও সেই মত পোষণ করেন? নির্বিকারভাবে ডঃ রায় বলেন, হ্যাঁ (পৃষ্ঠা-৮, ৯, ১০, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৫শে মে, ১৯৭৩)।

(প্রফেসর এ এল ব্যাসাম)

(প্রফেসর ব্যাসামকে সাংবাদিকের প্রশ্ন)—"বাংলাদেশ-ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাস শিক্ষা বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাস শিক্ষা সম্পর্কে আপনার মতামত এবং শিক্ষার সমস্যাগুলো কি ও কিভাবে এসব সমস্যা দূর করা যায় ?"

উঃ এই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা এবং শিক্ষা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার এবং অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সংক্ষেপে বলছি।

এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রি-হিষ্ট্রি এখনও জানা যায়নি। আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু তাই নয়, প্রাক মৌর্য যুগ সম্পর্কেও খুব একটা ভালো ধারণা আমাদের নেই। এই উপমহাদেশে সভ্যতা এসেছিল কিভাবে ? কোত্থেকে ?---

www.pathagar.com

পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ-বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এখানকার বৌদ্ধরা অন্যান্য অঞ্চল থেকে একটু আলাদা ছিল। বস্তুত এখানে এক "পিকুলিয়ার ফর্ম অফ বুডিঢজম (Peculiar form of Buddhism) নজরে পড়ে। এই সব বৌদ্ধদের অনেকে আবার পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এদের সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। এসব জানতে হবে। ---- ইতিহাস রচনার মেথডোলজির (Methodology) ব্যাপারে কোন ধারাবাহিক নিয়ম আমি অনুসরণ করি না। ইতিহাস এক ধরনের বিজ্ঞান। সমস্ত সোর্সকে (source) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। ইতিহাস রচনার সময় অনেক তথ্যাবলী, ঘটনা আমাদের নজরে পড়বে। সেগুলিকে সঠিক না অতিরঞ্জিত সেই সব বিশ্লেষণ করতে হবে। ক্রিটিক্যালি (Critically) এনালাইজ করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ঐসবের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ইতিহাস রচনা করা উচিত।

বাংলাদেশ বা বাঙালীরা যেন কাউকে অনুসরণ না করে। তাদের মনে যেন কখনও এই চিন্তা না জাগে যে আমাদের রাশিয়ার মতো হতে হবে বা আমেরিকা বা চীনদের মতো হতে হবে। বাঙালীরা নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের এককভাবে গড়ে তুলবে। বাঙালী বাঙালী হবে। বাংলাদেশ বাংলাদেশ হবে।" (পৃষ্ঠা-১১, ১২, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৫শে মে, ১৯৭৩, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা)।

১৯৭৩-এর মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস সম্মেলনের উপরিউক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে "ভারতবর্ষে আগে(অর্থাৎ ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে) বাঙালীদের আর্টিকুলেশনের অর্থাৎ স্পষ্টভাবে কথা বলার পথ বন্ধ ছিল।" নিম্নলিখিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নির্দশন মিলে—"র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার "ভারতের জাগরণ" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শ্রমিক নেতারূপে যখন তিনি বোম্বাইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ বাঙালী বাবুদের সম্পর্কে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।" (বাংলার বৈশিষ্ট্য, শ্রী শচীন্দ্র মজুমদার, বাংলার শক্তি, শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা—২২।) বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে বাঙালীদের আর্টিকুলেশনের পথ বন্ধ ছিল বলিয়া ডঃ নীহার রঞ্জন রায় উক্ত ইতিহাস সম্মেলনে তাই অতি বাস্তব সত্যের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন "এখন (অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে) সে সুযোগ (অর্থাৎ বাঙালীদের কথা বলিবার সুযোগ) এসেছে। ----ইতিহাসে এই প্রথম সুযোগ এসেছে কিছু করার যা না করলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ ক্ষমা করবে না। ---পাণ্ডিত্যের চেয়েও দরকার এখন দূরদৃষ্টির।"

www.pathagar.com

আর উক্ত সম্মেলনে প্রফেসর এ. এল. ব্যাসামের বক্তব্য হইতে জানা যাইতেছে—"এই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা ও শিক্ষা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার---এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রি-হিস্ট্রি (Pre-history) এখনও জানা যায়নি। --- প্রাক মৌর্য যুগ (অর্থাৎ ২৯৮-২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দের বিন্দু-সারের যুগ) সম্পর্কেও খুব একটা ভালো ধারণা আমাদের নেই। ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত এই সমুদয় অতিবাস্তব সত্য হইতে ইহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রি-হিস্ট্রি অর্থাৎ প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের ইতিহাস এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস নামে এ যাবৎ কাল রচিত গ্রন্থ সমূহেও বাংলাদেশের নির্ভেজাল ইতিহাস রচিত হইতে পারে নাই।

অথচ প্রত্ন প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরাতন প্রত্ন প্রস্তর যুগ হইতেই মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা হইতেই যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পরবর্তী ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়াই মানুষ যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বসবাস করিয়া আসিয়াছে সেহেতু পৃথিবীর যে কোনও স্থানের মানুষের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার যোগসূত্রেই তাহা করিতে হইবে বিধায়, পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসের সহিত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাও বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

"To have a scientific knowledge relating to the history of Bengal it is essentially pre-requisite for linking the geological past with the beginning of history in as much as it will enable us to have a scientific knowledge in respect of the topographical condition the remotest past of this part of the country in its geographical formation and as the history of man is correlated with geography it will also enable us to know the people who has stepped in to the same first to make their home finding the same to be more congenial for their livelihood than their original home land subsequently giving rise to a civilization of their own through the ages.

www.pathagar.com

Yet, to know the geological past of Bengal it is necessary to have a knowledge regarding the geological past of the Indo-Bang-Pak sub continent in general as Bengal being the eastern part of the sub-continent together with the geological past of the Asiatic continent of which this sub-continent is part too." (Rivers we live with (3) M.I. Chowdhury Observer Sunday Magazine, January 24, 1965)

সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অতঃপর লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-২

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের যোগসূত্রে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের পরিচয়

এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোনও ভূমির অর্থাৎ মাটির অস্তিত্ব ছিল না। এই মাটির পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পূর্বে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ছিল প্যানথালাসা (Panthalassa) নামে আখ্যায়িত এক সর্বব্যাপী মহাসাগর। এই মহাসাগরেই গঠিত হয় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম একটিমাত্র স্থলভাগ।

"কন্টিনেন্টাল রিফট" তত্ত্বের প্রবক্তা উইজেনার (Wegener)-এর মতে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগে ছিল এক সর্বব্যাপী মহাসাগর প্যানথালাসা (Panthalassa)। এই সাগরেই গঠিত হয় মূল পৃথিবীর স্থলভাগ। এই ভূ-খণ্ড এক সময়ে বিভক্ত হয়ে বিশাল ভাসমান দ্বীপের মত দূরে গিয়ে সৃষ্টি করে বর্তমান মহাদেশ এবং দ্বীপসমূহ। ভূ-ভাগের দূরে সরে যাওয়া এখনো চলছে। তবে সে গতি অত্যন্ত শ্লথ, কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র।

বিগত বরফ যুগে পানির স্তর দু'শত ফুট নিচে ছিল বলে যদি ধরে নেয়া যায়, তবে দেখা যাবে হাওয়াই দ্বীপসহ আরো বেশ কিছু দ্বীপ মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আরো দেখা যাবে দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে স্থল যোগাযোগ ছিল আর ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া আশেপাশের সমুদ্রতল দেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও সমুদ্রের ওপর ছিল।

এই মহাসমুদ্রের যে অংশ এখনও সমুদ্রই রয়ে গেছে তার গভীর অংশে পর্বতমালার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি এবং মানুষের আবির্ভাবের পর কোন বিশাল ভূ-খণ্ড বা মহাদেশ এই সমুদ্রে বিলীন হয়েছে বা নিমজ্জিত হয়েছে এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তবে উপকূলের অদূরে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে এক পর্বতমালা। এই পর্বতমালারই বেশকিছু অংশ সৃষ্টি করেছে..... হাওয়াই ও অন্যান্য দ্বীপমালা।" (ডঃ রফিকুল ইসলাম, রহস্যময় অতীত, মূল-চার্লস বার্লিজের 'মিস্ট্রিস ফ্রম ফরগটন ওয়ার্লড,' দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ই মে, ১৯৯৩, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ সন।)

সে যাহা হউক, উপরে উল্লেখিত প্যানথালাসা (Panthalassa) নামে আখ্যায়িত এক সর্বব্যাপী মহাসাগরে সাড়ে ২২ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্যাঙ্গিয়া (Pangaea) নামে আখ্যায়িত এক সুবিশাল ভাসমান

www.pathagar.com

স্থলভাগ গঠিত হয়। সেই প্যাঙ্গিয়া (Pangaea) স্থলভাগ ২০ কোটি বছর আগে লওরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানা নামে দুইভাগে বিভক্ত হয়। পরে লওরেশিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্বপশ্চিমে উত্তর আমেরিকা এবং পূর্বে দুইভাগ এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ ভূমি গঠন করে। ধারণা করা হয় যে, এশিয়ার অধিকাংশ ভূমি ইউরেশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার ভূমি দ্বারা গঠিত হয়।

আর উক্ত গণ্ডোয়ানা ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ গঠন করে। ভূখণ্ড বিভক্তির এই রীতি এখনও অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়া ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা। আর আফ্রিকা মহাদেশ বিভক্ত হইবার প্রমাণ মিলে আফ্রিকা মহাদেশ হইতে আরব উপদ্বীপের বিভক্তির ও বিচ্ছিন্ন হইবার বাস্তব ঘটনায়, যাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

"The Arabian peninsula, of which Soudi Arabian state forms by far the largest part, is thought to be a detached fragment of an even larger continental mass which included Africa. Large rifts developed because of thermal currents in the lower mantle of the earth, forming apart surface masses or plates. The Arabian plate is held to have drifted northwards impelled by the opening of the Red Sea and Gulf of Aden, and by subsequent spreading of the sea floors—a movement that may will be continning." (Page-4, The Bangladesh Illustrated Wekly, January, 28, 1979).

অর্থাৎ আবর উপদ্বীপ, যাহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ গঠন করিয়াছে সৌদি আরব, উহা এমনি একটি বৃহত্তর মহাদেশীয় পিণ্ডের (Plate) একটি বিচ্ছিন্ন টুকরা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল আফ্রিকাও। পৃথিবীর নিম্নস্তরের আবরণে তাপ প্রবাহের কারণে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগের ভূ-পিণ্ডসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ধারণা করা হইয়া থাকে যে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের আবির্ভাবের দ্বারা তাড়িত হইয়া এবং পরবর্তীকালে সমুদ্রতলের সম্প্রসারণের ফলে যা এখনো চলিতেছে, আরবীয় পিণ্ডটি (Plate) উত্তরদিকে সরিয়া গিয়াছে। এই উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতে সহজেই ধরিতে পারা যায় যে, আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকা মহাদেশ অতীতে একই ভূ-খণ্ডে অবস্থিত ছিল এবং সেই একই ভূ-খণ্ড যে একটি বৃহত্তর মহাদেশীয় পিণ্ডের (Plate) অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া যে কথা উপরের উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে সেই একই বৃহত্তর মহাদেশীয় পিণ্ড (Plate) যে উপরে বর্ণিত

www.pathagar.com

গণ্ডোয়ানা মহাদেশীয় পিণ্ডই (Plate) ছিল তাহাও ধরিতে পারা যায় এই সত্য হইতে যে গণ্ডোয়ানা-ভূমি পিণ্ড (Plate) তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যে তিনটি মহাদেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই তিনটি মহাদেশেরই একটি হইতেছে আফ্রিকা মহাদেশ, যাহা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মানব জাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আদি বাসস্থান

আফ্রিকা মহাদেশের সহিত একই ভূমিখণ্ডে আরব উপদ্বীপের একত্র সংলগ্নতায় তথা অবস্থানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপ পূর্ব আফ্রিকারই অংশ ছিল। পূর্ব আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপের বর্তমান ম্যাপের অর্থাৎ ভূ-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে যখন লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর ছিল না তখন আরব উপদ্বীপ পূর্ব আফ্রিকার সহিত একই ভূমিতে সংলগ্ন ও অবস্থিত ছিল। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের দুই পার্শ্বে পূর্ব আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপের পাশাপাশি অবস্থানে এই সত্য সহজেই ধরা পড়ে। আর ঐতিহাসিকগণ পূর্ব আফ্রিকাকেই যেহেতু মনুষ্য জাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম আবাসস্থল বিবেচনা করিয়াছেন সেহেতু পূর্ব আফ্রিকার সহিত একই ভূমিতে একত্রে সংলগ্ন পূর্ব আফ্রিকারই প্রাচীন একাংশ আরব উপদ্বীপকেও মনুষ্য জাতির প্রাচীনতম আদিম আবাসস্থল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

ঐতিহাসিকগণ যে পূর্ব আফ্রিকাকেই মানব জাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম আদি আবাসস্থল বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে।

"But by far the earliest remains of men and their tools known today came from East Africa, which may have been the original home of the human race." (Page-31, The history of our world, Teachers Edition, Edited by Arthur E. R. Boak and others. Houghton Mifflin co. Boston, New York.)

এতদসত্ত্বেও আরব উপদ্বীপকে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পশ্চিম এশিয়া নাম দিয়া এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত একটি ভিন্ন দেশ বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আরব উপদ্বীপের প্রাচীনতম আদি পরিচয় লোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও আরব উপদ্বীপের সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়া আফ্রিকার মিসরের সহিত আরব উপদ্বীপের যে স্থল সংযোগ তথা ভূমিগত সংলগ্নতা রহিয়াছে তাহাতে আরব উপদ্বীপ যে অতি প্রাচীনকালে

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষেই আফ্রিকা মহাদেশের বিশেষ করিয়া পূর্ব আফ্রিকার সহিত একই ভূমি সংলগ্ন তথা একই ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নিম্নবর্তী ভাষ্য হইতে স্পষ্ট হইবে। "The Mediterranean Sea on the west and the Arabian desert on the east, made Syria-Palestine a kind of corridor about four hundred miles long and less than a hundred broad. With Mesopotamia the north-east and Egypt on the south west, the land formed a highway between the continents of Asia and Africa. Its possession. was therefore, of the greatest importance to the leading powers of the two continents, both for military parposes and also because of the trade routes, and also, of course, for the march of armies." (Page-218, The Legacy of Egypt, Edited by S. R. K. Glanville.)

এতদ্ব্যতীত, আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকার মানুষ যে অতি প্রাচীনকালে একই জাতিভুক্তও ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে প্রকারান্তরে সহজেই বোধগম্য হইবে।................"Their (i.e, Egyptiens and Africans) language was Semitic in grammar, though there are comparatievly few definitely Semitic words in the language of the old kingdom. An invasion, preceded no doubt by peaceful penetration, seems to my mind to be indicated; and though it is by no means clear as to where the invaders came, I suggest the highlands of Palestine or Syria." (Page-125, Ibid)

উপরের উদ্ধৃতিতে যে সেমিটিক ব্যাকরণ ও ভাষার কথা উল্লেখিত হইয়াছে সেই সেমিটিক বলিতে শুধুমাত্র আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও আরবী ভাষাকেই বুঝায় না, আরব জাতীয় মানুষকেও বুঝায়। কেননা, সেমিটিক জাতির আদি বাসস্থান যেহেতু আরব উপদ্বীপেই ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন সেহেতু যাহা সেমিটিক তাহাই আরব বুঝিতে হইবে। সেমিটিক তাই আরবেরই নামান্তর। আর এই আরবদের আরব উপদ্বীপ যেহেতু অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত একই ভূমিখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু উভয় স্থানের মানুষের ভাষাও একই প্রাচীন সেমিটিক ভাষা ছিল বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। অতঃপর কালক্রমে আরব উপদ্বীপ ও পূর্ব আফ্রিকার ভূমিগত বিচ্ছিন্নতা ঘটিলে ভাষাগত বিচ্ছিন্নতাও ঘটে বলিয়াও ধারণা করা যায়। ফলে, বর্তমানে আফ্রিকার ভাষা-বিচ্ছিন্নতায় বিভিন্নতা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

আফ্রিকার ভাষায় মূল সেমিটিক ভাষার ব্যাকরণই অনুসৃত হইয়া থাকে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উপরের উদ্ধৃতিতে যে বলা হইয়াছে "An invasion.......by peaceful penetration......and.......whence the invaders came" "অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রবেশ করিয়া দখল করা এবং দখলকাররা কখন আসিয়াছিল" কথার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন আরবীয় নাম যে ছিল "জিনজ" তাহাতেও পূর্ব আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপের একই ভূমি সংলগ্নতা ধরা পড়ে। কেননা, একই ভূমি সংলগ্ন না হইলে আরব দেশের একটি স্থানের নামেই পূর্ব আফ্রিকার নাম হইবে কেন? পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন নাম যে ছিল "জিনজ" তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে প্রতিপন্ন হইবে। "The word "Zinj" the ancient Arab name of East Africa", (Page-45, The races of mankind, Prof. M. Nesturkh, Progress Publications, Moscow, translated by George Hanna, 2nd Edition, 1966). অর্থাৎ 'জিনজ' শব্দটি পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন আরব নাম। 'জিনজ' শব্দটি আরব নাম বিধায় শব্দটির মূল আরবীতেই অনুসন্ধানযোগ্য। আরবীতে শব্দটির মূল শব্দ হইতেছে 'কিন্দ'। আরব ভূখণ্ডের একটি স্থানের নাম কিন্দ এবং কিন্দের অধিবাসীদের নাম কিন্দি বা কিন্দা। "In the second half of the fifth century the powerful tribe of Kinda—having its seat in central Arabia- succeeded to a kind of overlordships over other tribes." (Page-10, The Arab civilization, translated in English by S. Khuda Bakhsh, M. A. B. L. Bar-at-law from original Die kultur der Araber (in German language) by Prof. Joseph Hell.)। উক্ত কিন্দি শব্দ হইতেই আক্কাদিয়া (Akkadein) শব্দ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেমন—আল্ কিন্দিয়া> আককিনদিয়া> আককানদিয়া> আককাঁদিয়া (Akkadia)। এই আক্কাদীয়গণ যে আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরে প্রভুত্বশালী ও প্রতিপত্তিশালী একটি সম্প্রদায় ছিল তাহা উপরের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখিত হইয়াছে। এমন কি উক্ত আক্কাদীয়গণ সুমেরীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়াও জানা যায়। "Sumerians in Sumar (lower Mesopotamia) were the pioneers in developing Mesopotamian civilization. This way of life was adopted by the Akkadians......of upper Mesopotamia who became thier political rivals." (Page-36, The history of our world, Edited by Arthnr E. R. Boak.)

www.pathagar.com

সে যাহা হউক, উক্ত 'কিন্দ' শব্দ হইতেই ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'জিনজ' (Zinj) শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যথা (আরবী) কিন্‌দ>গিন্‌দ (আফ্রিকার মিসরীয় উচ্চারণে 'ক' স্থলে 'গ' হইয়া)> জিনদ (ইংরেজীর মত go-এর গ (g) স্থলে জ (Z) উচ্চারিত হইয়া, যেমন, geographyর gতে 'গ' উচ্চারিত না হইয়া 'জ' উচ্চারিত হইয়া)> জিনজ (Zinj) (আরবীতে 'দ' স্থলে 'জ'ও উচ্চারিত হয় বিধায় জিনদ-এর 'দ' স্থলে 'জ' হইয়া জিনজ (Zinj) হইয়াছে। সুতরাং উক্ত জিনজ (Zinj) শব্দটির মূলে যে আরবী কিন্দ শব্দটি রহিয়াছে তাহাই নির্দেশ করিতেছে যে, প্রাচীনকালে আরব ভূখণ্ড পূর্ব আফ্রিকার সহিত একই ভূমিতে অবস্থিত ছিল। তাহা না হইলে পূর্ব আফ্রিকার নাম জিনজ (Zinj) অর্থাৎ মূলে (আরবী) কিন্দ হইবে কেন?

www.pathagar.com

বৃহত্তর গণ্ডোয়ানা মহাদেশ

ইতঃপূর্বে যে বর্ণিত হইয়াছে, অতি প্রাচীন বৃহত্তর গণ্ডোয়ানা মহাদেশ বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ গঠিত হইয়াছে, সেই গণ্ডোয়ানা নাম শব্দটিও আরব উপদ্বীপের পূর্বোল্লেখিত আরবী কিন্‌দ্ শব্দ হইতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে বিধায় আফ্রিকার সহিত একই ভূমিতে অবস্থিত আরব উপদ্বীপও যে উক্ত গণ্ডোয়ানা ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়। গণ্ডোয়ানা শব্দটিও যে মূলতঃ উক্ত আরবী 'কিন্‌দ্' শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে। "Mr. Hishop observed : The name of Gond or Gund, seems to be a form of kond or kund, the initial guttarals of the two words being interchangeable." (Page- 276, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part 1, No. III-IV-1890.) এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে উল্লেখিত Gond, Gund, Kond, Kund শব্দগুলোর সহিত উপরিউক্ত আরবী 'কিন্‌দ্' (Kind) শব্দটির ঐক্য ও সাদৃশ্য হেতু স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে উক্ত গণ্ডোয়ানা শব্দটির মূল শব্দ যে 'গণ্ড' (Gond) শব্দটি, উহাও আরবী কিন্দ (Kind) শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যথা- Kind>Kund>Kond>Gond (গণ্ড)।

এই Gond (গণ্ড) শব্দ হইতেই গণ্ডোয়ানা নাম শব্দটিও যে তাই গঠিত হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না। অতএব, আফ্রিকার মত আরব উপদ্বীপও যে গণ্ডোয়ানা ভূমির এক বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত, আমাদের এই বাংলাদেশ ও উক্ত মূল গণ্ডোয়ানা ভূমিরই অপর এক বিচ্ছিন্ন অংশ বিধায় দাক্ষিণাত্যের মত বাংলাদেশও যে এই উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম দেশও বটে তাহা পরবর্তী আলোচনার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইবে।

ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যখন কোনও মাটির অস্তিত্ব ছিল না তখন পৃথিবীতে প্যানথালাসা (Panthalassa) নামে আখ্যায়িত এক সর্বব্যাপী মহাসাগর ছিল। সেই প্যানথালাসা মহাসাগরেই (Triassic period) সাড়ে ২২ কোটি বছর আগে সর্বপ্রথম গঠিত হয় পাঙ্গিয়া (Pangaea) নামে আখ্যায়িত মাটির পৃথিবীর মূল ভাসমান এক সুবিশাল স্থলভাগ। সেই পাঙ্গিয়া ২০ কোটি বছর আগে লওরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানা নামে

www.pathagar.com

২ ভাগে বিভক্ত হয়। পরে লওরেশিয়া ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা এবং পূর্বের ২ ভাগে এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ ভূমি গঠন করে। ধারণা করা হয় যে, এশিয়ার অধিকাংশ ভূমি ইউরেশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার ভূমি দ্বারা গঠিত। আর উক্ত গণ্ডোয়ানা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ গঠন করে।

অবশেষে (Jurassic period) ১৯ কোটি হইতে সাড়ে ১৩ কোটি বছর কাল মধ্যে গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশ পৃথক হইয়া উত্তরে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উপরন্তু, অস্ট্রেলিয়ার মত গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশও একই (Plate) ভূতল-ত্বক থালায় অবস্থিত থাকায় নবসৃষ্ট ভারত মহাসাগরের (sea floor) সমুদ্র তলের সম্প্রসারণ ঘটিলে উক্ত ভূতল-ত্বক-থালার অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে উভয় এলাকাই অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ও গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশ উত্তর দিক সরিয়া আসে।

অতঃপর (Eocene time) ৬ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর কাল মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশ আরও দ্রুত উত্তর-দিকে অগ্রসর হইয়া ইউরেশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার (Plate) ভূতল ত্বক থালার সহিত প্র৮৮- বেগে ধাক্কা খায়। ফলে অস্ট্রেলিয়ার ভূতল ত্বক থালা হিমালয়ের রেখা বরাবর একদিকে পূর্ব এশিয়ার (Plate) ভূতল ত্বক থালার নীচে ঢুকিয়া পড়ে, যাহার ফলে পূর্ব এশিয়ার ভূতল-ত্বক-থালাও অস্ট্রেলিয়ার ভূতল-ত্বক থালা আরাকান ইয়াত্তমা পাহাড় শ্রেণীর নীচে এখনও পর্যন্ত একে অপরকে ঘর্ষণ করিতেছে। অপর দিকে গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশও দাক্ষিণাত্য মালভূমি, বাংলাদেশও যাহার অংশ বটে গঠন করে উক্ত (Eocene times) ৬ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর কাল মধ্যেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রাচীনতা

হিমালয় অপেক্ষাও বাংলাদেশ প্রাচীন। দাক্ষিণাত্যও বাংলাদেশের তুলনায় সমগ্র উপমহাদেশ নূতন।

উল্লেখ্য যে ৬ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর (Eocene times) কাল মধ্যে ইতঃপূর্বে বর্ণিত গণ্ডোয়ানার ভারতীয় অংশে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশও যাহার অংশ বটে উহা বাদে আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণ তিব্বত পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশ যখন এক বিশাল অগভীর জল সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল বাংলাদেশের উত্তরে পর্বতরাজ হিমালয় তখন টেথিস (Tethys) সাগরে নিমজ্জিত ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে ইহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে—"It has come down to us from the modern geological researches made by the most competent authorities that the whole of the Indo-Bang-Pak-sub continent besides the Gondwana land on the south of the same was under water of a shallow sea which "covered the whole of the western Himalayas extending to Afganistan and southern Tibet" in the Eocene times..... The shallow sea or gulf was a part of the vast expansive Arabian sea in those days and.......the plain of upper india formed a part of the more extensive Arabian sea...... (River we live with (3), M. I. Chowdhury, Observer Sunday Magazine, January, 24, 1965.)

অর্থাৎ সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা হইতে জানা গিয়াছে যে সাড়ে ৫ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর (Eocene times) কাল মধ্যে বঙ্গ-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড (দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশ যাহার অংশ বটে) বাদে সমগ্র উপমহাদেশ ছিল এক অগভীর জল-সমুদ্রে নিমজ্জিত, যাহা আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণ তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পূর্ণ পশ্চিম হিমালয়কে আবৃত করিয়াছিল।.........সেই অগভীর জল-সমুদ্র বা গর্ত তৎকালীন বিশাল বিস্তৃত আরব সাগরের একটি অংশ ছিল এবং.....উচ্চতর অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের সমতল ভূমি আরব সাগরের অধিকতর বিস্তৃত একটি অংশ ছিল। সাড়ে ৫ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর (Eocene times) কাল মধ্যে হিমালয় যখন ছিল না, তখনও বাংলাদেশ যে ছিল তাহার পরিপূরক সাক্ষ্য

www.pathagar.com

নিম্নবর্ণিত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—"হিমালয় যখন ছিল না তখন বিন্ধ্যাচল ছিল। এই পর্বত শ্রেণী হিমালয়ের মত একটানা নয়, বিক্ষিপ্ত, রাজমহল অবধি তার বিস্তৃতি।......প্রাচীন নথিপত্র প্রাচীন বাঙলার সীমারেখা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে না। যদিও যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে বঙ্গের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের ২৪ পরগনা, যশোহর ও খুলনা নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগকে বলা হত বঙ্গদেশ বা বঙ্গাল দেশ।........ প্রাচীন বাংলার ভূ-পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনাতেই প্রকাশ যে প্রাচীন বাঙলায় পর্বতরাজ হিমালয় ছিল না। পরবর্তীকালে বাঙলার উত্তরে এসে দাঁড়াল পর্বতরাজ হিমালয়। পশ্চিম সীমান্তে পার্বত্য নেপাল, বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড়, লুসাই ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর প্রান্তে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।.....বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যে বাঙ্গালীর মূল বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে বাঁধতে মধ্য যুগের শুরুতে তার বিকাশ ঘটে। মুসলমান ইংরেজ আমলে সে স্পষ্টতা লাভ করে।....লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম রাষ্ট্র এবং মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এর স্থান দ্বিতীয়।" (পৃষ্ঠা-২৯, ৩০, ৩১ বাঙ্গালী জীবনে বিবাহ, শঙ্কর সেন গুপ্ত।)

সে যাহা হউক, বাংলাদেশে তখন মহাদেশীয় পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সিলেট, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের সেই সময়ের শিলা স্তূপের মধ্যে কয়লার টুকরা প্রাপ্তিতে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত পূর্ব এশিয়া (Plate) ভূ-তল থালার সহিত অস্ট্রেলিয়ার (Plate) ভূ-তল থালার ধাক্কা লাগিবার কিছু পরে (oligocone period) ৩ কোটি ৮০ লাখ বছর কালে গণ্ডোয়ানার পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের অংশ ভুক্ত বাংলাদেশের একটি অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের নীচে নিমজ্জিত হয়। তবে পরবর্তী ৩ কোটি ৭০ লাখ বছর কাল মধ্যে উহা ভরিয়া উঠিয়া বাংলাদেশ অববাহিকা সৃষ্টি করে। সুতরাং গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অতি প্রাচীন প্রস্তরের উপরে পুঞ্জিভূত বিপুল পরিমাণ পলল দ্বারা বাংলাদেশ অববাহিকা গঠিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ অববাহিকার দুই দিকে অবস্থিত পূর্বে মেঘালয় এবং পশ্চিমে বিহারের ছোট নাগপুর মালভূমিতে গণ্ডোয়ানার প্রাচীন প্রস্তর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যবর্তী বাংলা অববাহিকার এই সংকীর্ণ অংশ (Garo Rajmahal gap) গারো-রাজমহল ফাটল নামে পরিচিত। এই ফাটলের রেখা বরাবর রংপুর ও নওগাঁতে ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নিকটে ও প্রাচীন প্রস্তর বাহির

www.pathagar.com

হইতে দেখা যায়। সিলেটের জাফলং, সুনামগঞ্জের টাকেরঘাট, রাজশাহীর উত্তরাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় কয়েক মিটার মাটির নীচে ৫ কোটি বছরের প্রাচীন চুনা পাথর আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা সাধারণত সিলেট চুনাপাথর নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির মালিছড়ি বাজারের কাছে দীপছড়ি নদীতে ৫ কোটি বছরের পুরাতন লোহার ফসিল স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (দৈনিক বাংলা, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৮)। এই সত্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইউসিন যুগের অর্থাৎ ৬ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর কালের গণ্ডোয়ানা মহাদেশের দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলাদেশেরও এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। তবে প্রসঙ্গত এই কথাও উল্লেখযোগ্য যে আর্যাবর্তের ভারতের সহিত দাক্ষিণাত্যের ও বাংলাদেশের একই রূপ অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে নাই তাহারও কারণ আর্যাবর্তের ভারতের সহিত গণ্ডোয়ানা মহাদেশের মূলত কোন সম্পর্ক নাই। আর্যাবর্তের ভারতের সহিত মূলত পূর্ব বর্ণিত লওরেশিয়ায় ইউরেশিয়াও পূর্ব এশিয়ারই অভিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। সঙ্গত কারণেই, দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশ যে মূলতঃ আর্যাবর্তের ভারতের বাহিরের ভিন্নদেশ তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাইত আর্যদের ঋগ্বেদ সংহিতায় দাক্ষিণাত্যের উল্লেখও নাই। এমনকি, গঙ্গা নদীও যেহেতু মূলতঃ দাক্ষিণাত্যেরই নদী, আর্যাবর্তের নদী নহে সেহেতু গঙ্গা নদীর নামও আর্যদের ঋগ্বেদ সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। "সিন্ধু ও স্বরস্বতীর উদ্দেশে যেমন বহুতর স্বতন্ত্র সূক্ত উক্ত হইয়াছে, ঋগ্বেদ সংহিতায় গঙ্গা নদীর স্তুতিগর্ভ তাদৃশ একটি সূক্তও বিদ্যমান নাই।.....যে ঋকটিতে ঐ.....নদীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা ঋগ্বেদ সংহিতার সমধিক অপ্রাচীন ভাগেরই অন্তর্গত। ....ঋগ্বেদ সংহিতায় না কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, না মলয় মহেন্দ্র সহ্যাদ্রি দক্ষিণাপথস্থ কোন বস্তুর উল্লেখ নাই।......ঋগ্বেদ-সংহিতায় হিমালয়ের নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উহার কোন অংশে বিন্ধ্যগিরির নাম লক্ষিত হয় না।" (পৃষ্ঠা-৬৫, ৬৬, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, শকাব্দ ১৭৯২।)

উপরিউক্ত এই সত্য হইতে অতঃপর অধিকতরভাবেই প্রমাণিত হয় যে হিমালয় এবং আর্যাবর্তের ভারত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশও যাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে অধিকতর প্রাচীন। নিম্ন লিখিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে—

www.pathagar.com

"বাংলাদেশের কোথাও ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতলে এমন কি খনন কালেও অলিগোসিন (সাড়ে ৪ কোটি হইতে সাড়ে ৩ কোটি বছর) উপযুগের শিলা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কাজেই উক্ত শিলার আপাত অনুপস্থিতি সাময়িকভাবে হলেও প্রমাণ করে যে অলিগোসিন যুগে (সাড়ে ৪ কোটি হইতে সাড়ে ৩ কোটি বছর কালে) সমস্ত বাংলাদেশ ছিল একটি স্থল ভূমি।" (বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস, এম এ বারি বিশ্বাস, পৃষ্ঠা-৬, আজকের বিজ্ঞান, দৈনিক ইনকিলাব, ৩০শে আগস্ট, ১৯৮৭ ; ১৩ই ভাদ্র ১৩৯৪।)

অতঃপর মধ্য ইউসিনে (Mid Uocene অর্থাৎ ৩ কোটি বছর কালে) পৃথিবীতে এক প্রচণ্ড ভূ-আলোড়ন ঘটে। এই আলোড়নের ফলে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূ-খণ্ড, বাংলাদেশও যার একটা অংশ ছিল, ভাংগতে শুরু করে এবং টেথিস (Tethys) সাগরে এ পর্যন্ত জমা বিপুল পরিমাণ পলল পানির নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠে আসে এবং বিশাল হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি করে।......" (ঐ)। হিমালয়ের সৃষ্টির পরে অপরদিকে প্রাকৃতিক কারণে সিন্ধুর উপকূলেরও কচ্ছের ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইলে পূর্ব বর্ণিত আরব সাগরের পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ আরব সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে বিশুদ্ধ পানির এক বিশাল হ্রদে পরিণত হয়। এই হ্রদেই শেষ পর্যন্ত এক বিশাল নদীর সৃষ্টি হয়। এই বিশাল নদীই ভূ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা ইন্দো-ব্রহ্ম ও সিওয়ালিক (Indo-Brahm and Siwalik) এই দুই নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে। যাহা চীন দেশ পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল বলিয়া ভূ-বিজ্ঞানীগণ ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন। (এই পুস্তকের ১ম ভাগের ১ম অধ্যায়ের ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)।

সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি

ইন্দো-ব্রহ্ম ও সিওয়ালিক এই দুই নামের উপরিউক্ত একটি নদী হইতেই (Mid Tertiary Era) ২ কোটি বৎসর কালে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নামে তিনটি নদীই একই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং হিমালয়ের রেখা বরাবর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট খাতের মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধু নদীর খাত বাহিয়া আরব সাগরে পতিত হইতে থাকে। সিন্ধু এবং গঙ্গার দুইটি বদ্বীপের মধ্যস্থলে কোনও উচ্চ ভূমির অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে যে অতীতে উভয় নদীই একটি নদী ছিল, যাহা পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইত। তাই ভূ-পৃষ্ঠের সামান্য পরিবর্তনেও যে কোন সময়ে একটি নদী অপর নদীতে পরিবর্তিত হইতে পারে।

অতঃপর রাজপুতনা ও গুজরাটের ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইলে পশ্চিমে প্রবাহী উক্ত সিওয়ালিক নামের মূল নদীটি গতি পরিবর্তন করিয়া পূর্ব দিকে

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতে থাকে। পরে রাজমহল পাহাড় ও আসামের পাহাড়ের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হইলে উক্ত সিওয়ালিক নদীটি মধ্যস্থলে গঙ্গা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নামে দুইভাগে বিভক্ত হয়। উল্লেখ্য যে গঙ্গা নদী শুরুতে দাক্ষিণাত্যের পাহাড় হইতেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হইত। পরে গারো রাজমহল ফাটলের সৃষ্টি হইলে হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্য প্রণিধানযোগ্য।

"That the river Ganges flowed through Gondwana land (Deccan) at the beginning to fall in the Bay of Bengal but after the formation of the Garo-Rajmahal gap it was flowing from the eastern Himalayas now.....In Bertolis map it may be noted that the Ganga......rises in the mountain of Deccan and falls in to the "Golfo De Bengala.......The Ganges........falls in to the Golfo De Bengala through six channels. In the mouths of the branches sand banks are shown. In this map (Gastaldis map of Bengal, 1561) also the Ganga rises in the Deccan and falls in to the Golfo De Bengala"...... [River we live with (8). M. I. Chowdhury, Observer Sunday Magazin, August, 7, 1966.]

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নাম গণ্ডোয়ানার "গণ্ড" শব্দের সহিত "গঙ্গা" নাম শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য ও নির্দেশ করে যে গঙ্গা নদী সর্বপ্রথমে গণ্ডোয়ানার দাক্ষিণাত্য হইতেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হইত। তাহা না হইলে গণ্ডোয়ানার "গণ্ড" নাম শব্দের সহিত 'গঙ্গা' নাম শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে কেন এবং 'গঙ্গা' নাম শব্দটিও ইহা ব্যতীত কেমন করিয়া সৃষ্টি হইতে পারে? গণ্ডোয়ানার 'গণ্ড' নাম শব্দের সহিত 'গঙ্গা' নাম শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে। যেমন- গন্দ> গণ্ড, গন্দা>গন্জা (আরবী রীতিতে দ স্থলে 'জ' উচ্চারিত হইতে পারে বিধায়)> গন্গা (আবার 'জ' যে 'জ' ও 'গ' দুই রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে বিধায় যেমন, ইংরেজীতে Geography শব্দে দৃষ্ট হয়)> গঙ্গা।

উপরন্তু, 'গণ্ড' শব্দের মূল যে কন্দ শব্দ ("The neme of Gond, or Gund, seems to be a form of Kond or Kund" ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে) সেই কন্দ শব্দের মূল যেহেতু আরবী 'কিন্দ' যাহা পূর্বেও উল্লেখিত হইয়াছে সেই কিন্দ শব্দ হইতেও 'গঙ্গা' শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, যেমন—কিন্দ>কন্দ, 'গন্ড'>কন্দা>কন্জা (দ স্থলে জ হইতে পারে বিধায়,

www.pathagar.com

যাহা উপরে উল্লেখিত হইয়াছে)>কংগা, (ইংরেজী 'Geography' শব্দের মত 'জ' শব্দ 'জ' ও 'গ' উভয় শব্দ হইতে পারে বিধায়), খুলনার একটি নদীর নাম কংগা আর আফ্রিকার একটি নদীর নামও কংগো। উক্ত কংগা হইতেই হইয়াছে>গংগা (মিসরীয়রা 'ক' স্থলে যেমন 'গ' উচ্চারণ করে তেমিন 'কংগা' শব্দের 'ক' লোপ পাইয়া 'গ' উচ্চারিত হইয়া হইয়াছে গংগা>গঙ্গা।

সুতরাং গণ্ডোয়ানার অংশ দাক্ষিণাত্য হইতেই সর্বপ্রথম উপরে উদ্ধৃত ছয়টি খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়াই যে গঙ্গা নদীর 'গঙ্গা' নাম হইয়াছে তাহা বুঝিতে অতঃপর বেগ পাইতে হয় না।

পরবর্তীকালে গঙ্গা নদী কেমন করিয়া হিমালয় হইতে বঙ্গোসাগরে পতিত হইতে শুরু করিয়াছে তাহা নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে— "..........the Ganges after draining Tibet passed under the Himalayas through a natural tunnel.

In memoirs of a map of Hindustan (1793) Rennel writes, "This great body of water forces a passage through the ridge of mount Himalayas and sapping its very foundation rushes through a cavern and precipitates itself in to a vast basin" on which it has worn in the rock at the higher foot of the mountains.

The Ganges thus appears to spectators to derive its original spring from this chain of mountains and the mind of superstition has given to the mouth of cavern the form of the head of a cow, an animal held by the Hindus in a degree of veneration almost equal to that in which the Egyptians of old held their God Apis." [Rivers we live with (8), M. I. Chowdhury, Observer Sunday Magazine, August, 7, 1966.]

অর্থাৎ "গঙ্গা নদী দাক্ষিণাত্য হইতেই তিব্বতকে প্লাবিত করিয়া হিমালয়ের পাহাড় শ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া এবং সুড়ঙ্গ করিয়া ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া একটি গভীর খাদের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া একটি বিশাল অববাহিকায় পরিণত হয় এবং হিমালয়ের পাদদেশে উর্দ্ধতর স্তরের প্রস্তরের মধ্যে জীর্ণ হয়।

এইরূপে গঙ্গাকে দেখিলে বোধ হয় যে এই পাহাড় শ্রেণী হইতেই ইহার মূল ধারা বাহির হইয়াছে এবং ধর্মীয় সংস্কারান্ধ মন হিমালয়ের উক্ত খাদকে

www.pathagar.com

হিন্দুগণ যে জন্তুকে ভক্তি করিয়া থাকে সেই গরুর মাথা বিবেচনা করিয়াছে, প্রাচীন মিসরীয়গণ তাহাদের আপিশ দেবতাকে যেমন ভক্তি করিত তেমনি একই প্রকারে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপরের উদ্ধৃতিতে মিসরের সে আপিশ দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই আপিশ শব্দটি মূলত মিসরীয় আরবী ভাষায় আবিশ। আরবী ভাষায় 'প' শব্দ নাই বিধায় শব্দটি মূলত 'আবিশ'-ই বুঝিতে হইবে। আরও উল্লেখ যে মিসরের পার্বত্য দেবতা উক্ত আবিশ শব্দ হইতেই এতদ্দেশের হিন্দুদের পার্বত্য দেবতা 'শিব' নামেরও যে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। যেমন—আরবী ভাষার রীতিতে আবিশ শব্দটি ডাহিন দিক হইতে পড়িলে যাহা হয় শ ই ব আ>আ+ব+ই+শ>আবীশ>আবিশ; ইহাই বাংলা ভাষার রীতিতে বামদিক হইতে পড়িলে হয়, শ ই ব আ> শ+ী+ব+া > শীবা >শিবা শিব। সুতরাং প্রাচীন মিসরের আবিশ দেবতাই যে এতদ্দেশে 'শিব' দেবতা হইয়াছে তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ৩ কোটি বৎসর আগে (Mid Eocene time) পৃথিবীতে এক প্রচণ্ড ভূ-আলোড়ন সংঘটিত হয়, যাহার ফলে একদিকে যেমন হিমালয়ের উত্থান ঘটে, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূ-খণ্ড, বাংলাদেশও যাহার অংশ ছিল ভাংগতে শুরু করে এবং পুনরায় পানির নীচে নিমজ্জিত হয়। এইরূপে দীর্ঘকাল পানির নীচে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় এই সময়ে বাংলাদেশে ১০ হাজার মিটারেরও বেশি পলল জমা হয়। অতঃপর "প্লায়োসিন" উপযুগে (অর্থাৎ ২ কোটি হইতে ১ কোটি বৎসর কাল মধ্যে) বাংলাদেশ আবার পানির উপরে উঠে আসে। নদীর প্লাবণ জনিত পলল এ সময় উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে জমা হয়। এ সমস্ত জেলায় যে কাঁকর, বালি ও লাল কাদার স্তর দেখা যায় তা ঐ সময়েরই সৃষ্টি।.........প্লায়োসিন উপযুগের পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ আর কোন সময় পানির নীচে যায়নি। প্লেইস্টোসিন.......উপযুগে (অর্থাৎ ১০ লক্ষ বৎসর কালে) যে সমস্ত পলল বাংলাদেশে জমেছে ও জমছে তার প্রায় সবটাই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বাহিত।" (বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস, এম এ বারি বিশ্বাস, পৃষ্ঠা-৬, দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ শে আগস্ট, ১৯৮৭।)

উপরের এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে "প্লায়োসিন উপযুগে (অর্থাৎ ২ কোটি হইতে ১ কোটি বৎসর কালে).....উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে.......যে কাঁকর বালি ও লাল কাদার স্তর দেখা যায় তা ঐ সময়েরই সৃষ্টি।" কিন্তু উক্ত কাঁকর বালি ও লাল কাদার স্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতেও যে দেখা যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে—

www.pathagar.com

"ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত একটি অংশ জুড়িয়া গৈরিক পার্বত্য গজারী বনময় একটি পুরা ভূমির স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা মধুপুর গড় নামে খ্যাত। ঢাকা জেলার ভাওয়ালের গড়ও তাহাই। মধুপুর গড়ের উপরের স্তরের মাটি যেন লাল কাদা জমানো মাটি, কিন্তু তাহার নীচের স্তরেই লাল বালি, এই বালি ও অজয় বরাকর উপত্যকার লাল বালি একই গৈরিক পার্বত্য মাটি।" (পৃষ্ঠা ১২৭, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।)।

এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে "মধুপুর গড়ের উপরের স্তরের মাটি যেন লাল কাদা জমানো মাটি, কিন্তু তাহার নীচের স্তরের লাল বালি, এই বালি ও অজয় বরাকর উপত্যকার লাল বালি একই গৈরিক পার্বত্য মাটি।" ইহা হইতে সহজেই ধরিতে পারা যায়, মধুপুরের লাল বালি ও অজয় বরাকরের লাল বালি যেহেতু প্লায়োসিন উপযুগের (২ কোটি হইতে ১ কোটি বৎসর কালের) একই লাল বালি সেহেতু মধুপুরের লাল বালি ও প্লায়োসিন অর্থাৎ ২ কোটি হইতে ১ কোটি বৎসর কালের প্রাচীন। আর মধুপুরের উক্ত লাল বালির উপরের স্তরে যে লাল কাদা জমানো মাটি দেখা যায় তাহা প্লায়োসিন উপযুগের পরবর্তী (Pleistocene) প্লেইসটোসিন যুগের অর্থাৎ ১০ লক্ষ বৎসর কালের সৃষ্ট।

মধুপুর গড় অঞ্চলের উক্ত পার্বত্য ভূমি যে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, এমন কি বুড়ি গঙ্গার অপর তীরের একটি ক্ষুদ্র অংশেও যে উক্ত ভূমির অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে বোধগম্য হইবে—"In the south, the tract (Madhupur) reaches to the Buriganga and a small bit of it has been traced on the other bank." (Page-31, Geography of Bangladesh, Haroun Er Rashid.)

"পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এই পুরাভূমিই (অর্থাৎ গণ্ডোয়ানার দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ভূমিই) গাড়ো পাহাড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।" (পৃষ্ঠা-১২৫, বাঙ্গালীর ইতিহাস, নীহার রঞ্জন রায়।)।

পূর্ব দিকে মধুপুর অঞ্চলের প্লেইসটোসিন যুগের অর্থাৎ ১০ লক্ষ বৎসরের পুরাতন লাল মাটির প্রাচীন পার্বত্য ভূমি যে রহিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যে প্রণিধান যোগ্য।"

"Eastern Tract : Three bits of the terrace are detatched from the main tract by the old Brahmaputra and Lakhia river. The

www.pathagar.com

southern most Sonargaon is very small. The northern most Eagaro Sindur, is also small. South east of the latter area is third, fairly large block in Monohardi and Shibpur Thanes." (Ggeography of Bangladesh, Page-31)

উপরন্তু, উল্লেখ্য যে "ঢাকা জেলার রায়পুরা, শিবপুর এবং মনোহরদি থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে একটি লাল মাটির পাহাড়। এটা বাংলাদেশের প্রাচীন সমতট অঞ্চলের মধ্যবর্তী অরণ্য ও পার্বত্য ভূমির ক্ষয়িত অংশ। ময়মনসিংহের মধুপুর গড় আর ঢাকার ভাওয়াল গড়ের সঙ্গে যুক্ত এই উচ্চ ভূমি। এককালে সংলগ্ন ছিল কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি পাহাড় অঞ্চলের সঙ্গে। গাড়ো পার্বত্য ভূমির যে বাহুটি ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেষে মধুপুর হয়ে ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ছুঁয়ে বিস্তৃত হয়েছিল মেঘনার ওপারে, লাল মাটির এ উচ্চ ভূমি তার অন্তর্গত। নদীর গতি পরিবর্তন, ভাংগন এবং ভূমি ক্ষয়ের ফলে এর সেই প্রাচীন সংলগ্নতা আর নেই।....... রায়পুরা, শিবপুর ও মনোহরদি থানার এই পার্বত্য লাল মাটি অঞ্চলের এখনকার উচ্চতা বিশ ফুট থেকে একশ' ফুটের মতো। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি ত্রিশ মাইল। পূর্বে পশ্চিমে পনেরো মাইলের কাছাকাছি। মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ঐতিহাসিক ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা আড়িয়ল খাঁ।"

(বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পদ ও প্রত্ন অনুসন্ধান, শফিকুল আসগর, দৈনিক বাংলা, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)।

উপরন্তু, উত্তরাঞ্চলীয় সিলেট জেলায়ও যে উপরিউক্ত প্লেইসটোসিন যুগের অর্থাৎ ১০ লক্ষ বৎসর আগের লাল কাদা ও বালি যে দেখা যায় তাহা নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও বোধগম্য হইবে—

"Tilla is the name given to small hillocks. There are four main groups of hillocks in the northern Sylhet district.......A few miles to the south-east is the 30 sq. mile Dhaka dakhin group of Tilas which reaches up to 200 feet at Kailash Tila and over 200 north of the Surma river..........Those Tilas have pleistocenc clays and sands over course ferruginous sand stones, molted sandy clays and shales of middle miocene age (15 million years) (Dupi Tila series) (Pages, 34, 35, Geography of Bangladesh, Haroun Er Rashid.)

www.pathagar.com

এইরূপে প্লেইসটোসিন যুগের অর্থাৎ ১০ লক্ষ বৎসর আগের লাল মাটির যে পলল দ্বারা বাংলাদেশের ৪ ভাগের ৩ ভাগই আবৃত তাহার অধিকাংশই ভাসিয়া গিয়াছে বা অধুনা নদী বাহিত পললের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। গণ্ডোয়ানা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের বাংলাদেশ অংশে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলের বাংলাদেশ অংশে গণ্ডোয়ানার অতি প্রাচীন প্রস্তরের উপর পলল পুঞ্জিভূত হইবার সময় কাল ২ কোটি হইতে ১ কোটি বৎসরর। (Pliocene period) এবং দেড় কোটি হইতে ১০ লক্ষ বৎসর (middle Miocene and pleistocenc)। বাংলাদেশের একমাত্র দক্ষিণাংশই সম্ভবতঃ ১০ হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।

অতঃপর উল্লেখ্য যে উপরে উল্লেখিত প্রাচীন ভূ-তাত্তিক বিবরণের অতি বাস্তব সত্য হইতে যেমন জানিতে পারা যায় যে দাক্ষিণাত্যের মত বাংলাদেশও অতি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূমির অপর একটি অংশ তেমনি বাংলাদেশের কোন কোন স্থানের নাম শব্দে দাক্ষিণাত্য নাম শব্দটির মূল শব্দ 'দক্ষিণ'-এর অবস্থিতিতেও ধরিতে পারা যায় যে গণ্ডোয়ানার বর্তমান ভারতীয় অংশ যে দাক্ষিণাত্য সেই দাক্ষিণাত্য বাংলাদেশের এলাকায়ও বিস্তৃত ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যে এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য—

"Pilgrim (Dr. H. G. E. Pilgrim) advocates.....that in the Eocene time, when sea covered the whole of the western Himalayas extending to Afganistan and southern Tibet,..........the Deccan platean of southern India must then have been extended north-east to Shillong and beyond." (River we live with, M. I. Chowdhury, Observer Sunday Magazine, June, 12, 1966.)

অর্থাৎ ভূ-বিজ্ঞানী ড. পিলগ্রীন সমর্থন করেন যে সাড়ে ৬ কোটি হইতে সাড়ে ৪ কোটি বছর (Eocene time) কালমধ্যে আফগানিস্তানও দক্ষিণ তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পূর্ণ পশ্চিম হিমালয় যখন সাগর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল তখন দক্ষিণ ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি উত্তর-পূর্ব দিকে শিলং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমন কি শিলং-এর বাহিরে (অর্থাৎ বাংলাদেশে)ও বিস্তৃত ছিল।

শিলং-এর দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং বাংলাদেশের ঢাকার উত্তরে অবস্থিত সিলেটের 'ঢাকা-দক্ষিণ' নামক একটি স্থানের দক্ষিণ নাম শব্দটি এবং ঢাকা শহরের লাগ-উত্তরাংশে অবস্থিত 'দক্ষিণ খান' নামক স্থানটি দাক্ষিণাত্যের মূলশব্দ যে দক্ষিণ, সেই দক্ষিণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সিলেট ও ঢাকা যে দাক্ষিণাত্য মালভূমিরই খণ্ডিত অংশও বটে তাহাই নির্দেশ করে। আর দাক্ষিণাত্য যে গণ্ডোয়ানা মহাদেশেরই অংশ সেই গণ্ডোয়ানা শব্দটিও যেহেতু পূর্ব বর্ণিত 'কিন্দ' শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে সেহেতু দাক্ষিণাত্য শব্দটিও যে উক্ত "কিন্দ" শব্দ হইতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। যেমন, বাদিয় কিন্দ (শব্দটি আরবী)। অর্থাৎ 'কিন্দ' সম্প্রদায়ের অধিকৃত অনাবাদী স্থান)>বাদকিন্দ>দবাকিন্দ (initial gutharals of the two words being interchangeable, Page-276, Journal of the Asiatic Society of Bengal)> দ্বাকিন্দ> দ্বাক্কিণ> দাক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য)> দক্ষিণ। অতএব, দাক্ষিণাত্যের মত বাংলাদেশের সিলেট ও ঢাকা যে অতি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূমিরই অংশ তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়। বিশেষ করিয়া সিলেটের ঢাকা দক্ষিণ নামক স্থানের টিলার উচ্চ ভূমিতে (Middle Miocene) দেড় কোটি বৎসর আগের প্রাচীন প্রস্তরময় নিদর্শনের উপরে (Pleistocene) ১০ লক্ষ বৎসর আগের লাল কাদা এবং বালির অস্তিত্বে তথা সিলেটের জাফলং ও সুনামগঞ্জের টাকের ঘাটে ৫ কোটি বৎসরের চুনা পাথরের অস্তিত্ব হইতেও নিঃসন্দেহে প্রমাণিতও হয় যে বাংলাদেশের সিলেট ও ঢাকা প্রকৃত পক্ষেই অতি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূমির অংশও বটে।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অতি প্রাচীন ভূমির অংশ দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলের অংশ হিসাবে সিলেটের ভূমি পরিচয়ের কথায় উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সিলেটের বিখ্যাত আউলিয়া শাহজালাল যখন আরবের মক্কা হইতে তাঁহার গুরুর নির্দেশে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারে বাহির হন তখন তাঁহার গুরু তাঁহার হাতে মক্কার এক মুঠা মাটি তুলিয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ঐ এক মুঠা মাটির মত স্বাদে ও গন্ধে একই প্রকারের মাটির সন্ধান যে স্থানে পাওয়া যাইবে সেখানের মাটিতেই যেন আউলিয়া শাহজালাল তাঁহার ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র বা আস্তানা গড়িয়া তোলেন। শাহজালাল সিলেটে আগমন করিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে সিলেটের একটি স্থানের মাটি চাখিয়া দেখিতে নির্দেশ দিলে তাঁহার শিষ্য সে স্থানের মাটি চাখিয়া দেখিয়া জানায় যে শাহজালালের গুরু শাহজালালকে মক্কার যে মাটি নমুনা স্বরূপ দিয়াছেন সেই মাটির সহিত সিলেটের উক্ত স্থানের মাটির হুবহু সাদৃশ্য ও মিল রহিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া শাহজালাল সিলেটের উক্ত স্থানেই তাঁহার ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র বা আস্তানা গড়িয়া তোলেন যাহা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর শাহজালালের উক্ত শিষ্যের মাজারও চাষনী পীরের মাজার নামে সিলেটে রহিয়াছে। এই বাস্তব ঘটনা হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে আরবের মক্কা যে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের

www.pathagar.com

অংশ যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে বাংলাদেশের সিলেটও সেই প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশেরই একটি অংশ বটে। সুতরাং অতি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের সহিত আরবের মক্কার ও বাংলাদেশের সিলেটের অতি প্রাচীন যোগসূত্রেই যে মক্কার ও সিলেটের মাটির সাদৃশ্য ও মিল সূচিত ও সাধিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সিলেট ও আরবের মক্কার উপরিউক্ত ভূমিগত ঐক্য ও সাদৃশ্য প্রকারান্তরে আরবের সহিত বাংলাদেশের ঐক্য ও সাদৃশ্য যেমন সূচিত করে তেমনি আরবে ও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রত্ন প্রস্তর যুগের প্রস্তরাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য ও সাদৃশ্যও নির্দেশ করে যে প্রত্ন প্রস্তর যুগ হইতেই বাংলাদেশের সহিত আরব দেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্য প্রতিপন্ন হইবে।

"দক্ষিণ মালভূমির পশ্চিমস্থ আরাবল্লি পর্বত হতে শুরু করে পূর্ব দিকে (বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত) আসামের শিলং মালভূমি (..........the Deccan plateau.......must then have been extended north east to Shillong plateau and beyond—Dr. H. G. E. Pilgrim) পর্যন্ত গণ্ডোয়ানা ভূমি নামে এক বিস্তৃত ভূ-ভাগ ছিল। উত্তর বাংলায় সাম্প্রতিক কালে গণ্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা সপ্রমাণ হয়েছে। নোয়াখালী জিলার ছাগল নাইয়াতেও (অর্থাৎ সাগর নাইয়াতে, বাংলাদেশের কিংবদন্তী, শামসুল ইসলাম) ইহা বের হয়েছে।......চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ড পাহাড়ে প্রত্ন প্রস্তর যুগের কিছু অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তার সঙ্গে আরব ভূমিতে প্রাপ্ত প্রস্তরাস্ত্রের সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়—প্রত্ন প্রস্তর যুগের কাল হতেই আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তখন বাংলাদেশের সেটুকু স্থানই মাত্র দক্ষিণ সাগরের বাইরে ছিল, যা ছিল গণ্ডোয়ানা ভূমির অন্তর্গত অর্থাৎ শুধু লাল মাটি কাকর এলাকা। (পৃষ্ঠা-১, টাঙ্গাইলে ইসলাম, মোফাখখারুল ইসলাম)। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে "হিমালয় যখন ছিল না তখন বিন্ধ্যাচল ছিল। এই পর্বত শ্রেণী হিমালয়ের মত একটানা নয়, বিক্ষিপ্ত, রাজমহল অবধি তার বিস্তৃতি।" ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে গারো পাহাড়ও বিন্ধ্যাচল পর্বতেরই একটি বিক্ষিপ্ত অংশ। রাজমহল পাহাড় ও গারো পাহাড়ের মধ্যে (Rajmahal gap) রাজমহল ফাটল-এর কারণে গারো পাহাড়কে রাজমহল পাহাড় তথা বিন্ধ্যাচল পর্বত শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও আসলে বিচ্ছিন্ন নহে; বিন্ধ্যাচল পর্বত শ্রেণীর বিক্ষিপ্ততার স্বাভাবিক কারণেই গারো পাহাড়, বিন্ধ্যাচল পর্বত শ্রেণী হইতে ভিন্ন পাহাড় বলিয়া মনে হয়। এই "গারো পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকেই একটি পাহাড় শাখা ক্রমে ক্রমে পূর্ব

www.pathagar.com

দক্ষিণে লম্বা হয়ে যায়। এখনকার ভূ-তত্ত্ববিদেরা একে বলেন—মধুপুর জঙ্গল।........সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক—আবুল ফজল আল্লামীর আকবর নামায় সর্বপ্রথম এই মাটির বৈশিষ্ট্যটি তার প্রদত্ত 'কুহিস্তান-ই-ঢাকা' নামে ধরা পড়ে। গারো পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি থেকে ক্রমশ পূর্ব-দক্ষিণে ঢালু হতে হতে এ পাহাড় শ্রেণী ঢাকা শহরের সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঠেকেছে........ তাই এই পাহাড়ী এলাকার নাম রেখেছে 'কুহিস্তান-ই-ঢাকা'।" (পৃষ্ঠা-২১, টাঙ্গাইলে ইসলাম, মোফাখখারুল ইসলাম।)।

বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম লোক বসতি

বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব প্রাচীন প্রথম লোক বসতি কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের নিম্নে উল্লেখিত ভাষ্যে—

"New Delhi, Sept. 19 (1962) Prof. Humayun Kabir, union minister for Scientific Research and eultural Affairs said in Hyderabad......It was however certain that the Indo-Gangetic people was comparatively new and for a time when the Deccan plateau was populated the Gangetic plain was unfit for human habitation." (The Pakistan Observer, Dacca Sept. 20, 1962)

অর্থাৎ সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে ভারতীয় গাঙ্গেয় লোক সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে নূতন কোন এক সময়ে দাক্ষিণাত্য মালভূমি যখন জনপূর্ণ ছিল গাঙ্গেয় সমভূমি তখন মনুষ্য বাসের অযোগ্য ছিল।

এই সত্য হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে দাক্ষিণাত্য যখন জনপূর্ণ ছিল তখন বাংলাদেশও জনপূর্ণ ছিল। কেননা, বাংলাদেশও দাক্ষিণাত্য মালভূমিরই পূর্বাঞ্চলীয় অংশ, যাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দাক্ষিণাত্যে প্রত্ন প্রস্তর যুগের যে সমুদয় নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তদনুরূপ প্রত্ন প্রস্তর যুগের নিদর্শন বাংলাদেশেও আবিষ্কৃত হইয়াছে বিধায় অতীতে দাক্ষিণ্যত্য যখন জনপূর্ণ ছিল তখন বাংলাদেশও যে জনপূর্ণ ছিল তাহা অধিকতরভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রত্ন প্রস্তর যুগ

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "বাঙালা দেশে উত্তর, দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে; এই সকল প্রদেশেই বাঙ্গালা দেশের প্রত্ন প্রস্তর যুগের পাষাণ নির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত

www.pathagar.com

হইয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে, চট্টগ্রামের পার্বত্য-প্রদেশে, যে সমস্ত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আকারে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের ন্যায়.........আর্যাবর্তের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের পাদ মূলে ও পার্বত্য উপত্যকাসমূহে, আদিম মানবের বাসের কোন চিহ্নই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য প্রদেশে দুইটি মাত্র প্রস্তর যুগের শিলা নির্মিত আয়ুধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই জাতীয় আর একটি অস্ত্র প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের সমতল ক্ষেত্রে আবিস্কৃত হইয়াছিল। ....সুবিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ভিন্সেন্ট বল মাদ্রাজে আবিষ্কৃত প্রত্ন প্রস্তর যুগের অস্ত্রসমূহের সহিত বঙ্গেদেশের ও উড়িষ্যার এই যুগের নিদর্শনসমূহের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই উভয় প্রদেশের প্রাচীন শিলানির্মিত প্রহরণের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।...........মাদ্রাজে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময়ে উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়, যে স্থান বাঙ্গালা দেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত।" (পৃষ্ঠা-৬, ৭, বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।)।

এই উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতেও সহজেই ধরিতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম ভূমি বাংলাদেশ পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল বিধায় দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশের প্রত্ন প্রস্তর যুগের নিদর্শন একই সময়ের ও একই প্রকারের হইতে পারিয়াছে। আর দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রত্ন প্রস্তর যুগের প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের আকৃতি প্রকৃতি একই প্রকার এবং পাষাণও একই জাতীয় বিধায় তথা যে স্থানে এই জাতীয় পাষাণ পাওয়া যায় তাহা বাংলাদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল বিধায় স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায়, ১০ হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রত্ন প্রস্তর যুগে পশ্চিম এশিয়ার আরব ভূ-খণ্ড হইতে মানুষ যেহেতু শত শত ক্রোশ দূরবর্তী বেরিং প্রণালী পার হইয়াছিল [B.C. 10,000—First immigrants from Asia (i.e. Arabia of western Asia) to cross Behring straits—Pears cyclopaedea, Editor, L. Mary Barkar] সেহেতু আরব ভূখণ্ড হইতেই মানুষ প্রত্ন প্রস্তর যুগেই দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশেও পদাপর্ণ করিয়াছিল এবং আরব ভূ-খণ্ডের প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রও তাহাদের সহিত বহন করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। কুমিল্লা জেলার লালমাই ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্ন প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ার এবং সিলেট জেলার জয়ন্তিয়াপুর নামক স্থানে সোজাভাবে দণ্ডায়মান পাথরের মেগালিথ (অর্থাৎ প্রত্ন প্রস্তর যুগের স্মৃতি স্তম্ভাদিতে ব্যবহৃত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড) আবিষ্কৃত হইয়াছে।

www.pathagar.com

নব্য প্রস্তর যুগ

অতঃপর ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, "লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পাষাণ খণ্ড হইতে অস্ত্র নির্মাণ করিয়া আদিম মানব যে যুগে এই জাতীয় অস্ত্র নির্মাণে পারদর্শী হইয়া উঠিল, সেই যুগের নাম নব্য প্রস্তর যুগ। এই যুগে দূর হইতে অস্ত্র বর্ষণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া মানব জাতি জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।.........বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন প্রস্তর যুগের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, সেই প্রদেশেই নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।.......১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নিকট সীতাকুণ্ড পর্বতে অশ্মীভূত কাষ্ঠ (Petrified or fossilized wood) নির্মিত একখানি কৃপাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা-৮, ৯, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাগুক্ত) "ঢাকা জেলার (বর্তমানে নরসিংদী জেলার) রায়পুরা থানার রাজবাড়ী গ্রামের জনৈক ড. খালেকুজ্জামানের বাড়ির কাছে গর্ত খোড়ার সময় কয়েক ফুট মাটির নিচে প্রাচীন কালের একটি কুড়াল পাওয়া গেছে। কুড়ালটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত ছাগল নাইয়া (অর্থাৎ সাগর নাইয়া—বাংলাদেশের কিংবদন্তী, শামসুল ইসলাম) থেকে পাওয়া নব্য প্রস্তর যুগের পাথুরে কুড়ালটির সমসাময়িক বলে অনুমান করা যায়। রাজবাড়ী গ্রামটি আদি যুগের প্রত্ন সম্পদে সমৃদ্ধ উয়ারী বটেশ্বর গ্রামদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কয়েক বছর আগে উয়ারী বটেশ্বর থেকে প্রচুর লৌহ কুঠার, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, পাথুরে ছুরি, নকশী পাথরের গুটিকা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ সম্পর্কে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ ও ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮০-তে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় দু'টি প্রবন্ধও ছাপা হয়। আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে এ অঞ্চলে কোন অনুসন্ধান চালানো হয়নি। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলে উল্লেখিত স্থানগুলো থেকে প্রাচীন যুগের অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে অনেকের ধারণা। (পৃষ্ঠা-১২, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৯ই আষাঢ়, ১৩৯০; ২৪শে জুন, ১৯৮৩, ঢাকা।)।

সে যাহা হউক, বাংলাদেশে নব্য প্রস্তর যুগের যে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাহা যে আরব ভূ-খণ্ডের জেরিকো হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

B. C. 7000—Neolithic revolution in middle Esat, Agricultural settlements (e.g. Iericho). Settled way of life leading eventually to such skills as weaving, metallurgy, invention as ox-drawn plough, wheeled cart." (Pears cyclopaedea, Editor—L. Mary Barkar).

www.pathagar.com

তাম্র যুগ (Copper Age)

ঐতিহাতিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন—"নব্য প্রস্তর যুগে আদিম মানবগণ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। ....মানব জাতির সর্ব প্রাচীন ধাতব অস্ত্রসমূহ তাম্র নির্মিত।....... নব্য প্রস্তরের যুগের পরবর্তীকালকে তাম্রের যুগ (Copper age) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাম্রের যুগের শেষ ভাগের নাম ব্রঞ্জের যুগ।...... বাঙ্গালা দেশে......তিন স্থানে তাম্র নির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।......প্রাচীন মিশর, বাবিরুষ (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্র নির্মিত অস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রত্নবিদ্যাবিদগণ অনুমান করেন যে, মিশর দেশে সাম্রাজ্যের যুগের পূর্বে (Pre-dynastic age) তাম্রের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল।" (পৃঃ ১০, ১১, ১৩, বাঙ্গালার ইতিহাস)। এই উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতেও সহজেই ধারণা করা যায় যে বাংলাদেশে যে তাম্র নির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাও আরবদেশ ও আরব দেশ সংলগ্ন মিশর হইতেই বাংলাদেশে আসিয়াছে। ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ূন কবীরের নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—New Delhi, Sept. 19 (1962) "Prof. Humayun Kabir..... said..... that the recent archaeological finds in Egypt had confirmed that there were close contact between the Tamils in south India and the pre-dynastic Egyptians." (The Pakistan Observer, Dacca, Sept. 20, 1962.) অর্থাৎ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন যে মিশরের সাম্প্রতিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিশ্চিত করিয়াছে যে দক্ষিণ ভারতের তামিল ও সাম্রাজ্যের যুগের পূর্বের (Pre-dynastic age) মিশরীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল।

ব্রোঞ্জ যুগ (Bronge age)

অতঃপর ব্রঞ্জ যুগের নিদর্শনও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। আর উক্ত নিদর্শনও যে আরব ভূ-খণ্ড ও আরব ভূ-খণ্ড সংলগ্ন সুমের হইতেই বাংলাদেশে আসিয়া থাকিবে, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও ধারণা করা যায়।

"ব্রঞ্জের নির্মিত পাত্র এবং ভাস্কর্যঃ

প্রাচীন মিশরীয় ও মেসোপটেমিয়ানরা ধাতু বিদ্যা প্রয়োগকৃত যান্ত্রিক কলা-কৌশল সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ছিল। খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে মিসরীয়রা

www.pathagar.com

তামা ও টিন জাতীয় খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী করত। তা ছাড়া মেসোপটেমিয়ানরাও ৩৫০০-৩০০০ খৃঃ পূর্বে ব্রোঞ্জ ধাতুর আবিষ্কার করে বলে অনেকে মনে করেন। তাদের ব্যবহৃত বাসনপত্র ও ভাস্কর্য আজকে আমাদের ধারণাকে অবাক করে। সেকালে ধাতু বিদ্যায় তারা যেমন ছিল জ্ঞানী তেমনি শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ছিল উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন। মেসোপটেমিয়ানরা কারিগর হিসাবে এতো দক্ষ ছিল যে তাদের এ দক্ষতার গুণে এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের তৈরি মসৃণ কিছু প্রস্তরাস্ত্র ধাতব সামগ্রী নির্মাণে ব্যবহার করত যার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে চীন দেশে। তাদের ব্যবহৃত নানান বস্তু থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সেকালে তারা জানত কিভাবে ব্রোঞ্জকে গলানো যায়, বিশুদ্ধ করা যায় এবং শক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিগুলো তারা ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিল বলেই ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে ধাতুর প্রচলন ঘটে।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বাংলাদেশেও ব্রোঞ্জের বাসনপত্র ও মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বস্তু আশানুরূপ হলেও দুঃখের বিষয় এদের উপর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চালান ও প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে আমাদের পক্ষে আজও জানা সম্ভব হয়নি, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এত বছর আগে কি কি পদ্ধতিতে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করেছিল। কয়েক হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ানদের অথবা চীনের সাং বংশীয়দের কাজের প্রভাব এদেশের মানুষের উপর পড়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তা হলে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এত দক্ষ কারিগর হয়েছিল কি ভাবে? তবে কি আমাদের সভ্যতা আরও প্রাচীন? খৃঃ পূঃ প্রায় দুই হাজার সালে চীন দেশে ব্রোঞ্জের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মিলেছে। অনেকের ধারণা দক্ষিণ এনোটলিয়ায় (তুরস্কে) প্রায় ৮ হাজার বছর আগে মানুষ আগুনের সাহায্যে ধাতু গলিয়েছিল।"(প্রাচীন সভ্যতায় অজৈব প্রত্নবস্তু, এম. এ. ইয়াহিয়া, দৈনিক বাংলা, ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৩।)।

"The Egyptian came early in to contact with the world around them. Even in the age before history, raw materials were exchanged between nations.......Egypt very early developed a sea going fleet. In the third dynasty (2815—2690 B.C.) Egypt was already engaged in maritime commerce with the Syrian coast.......contact between Egypt and sumar in the Pre-dynastic period, whether direct or indirect, is attested by various artistic motifs and material evidence." (Page-23, The Legacy of Egypt, Editor- S.R.K. Glanville and others.)

www.pathagar.com

"Egypt and Babylonia may have traded indirectly through the Syrian ports. A recent discovery of an Asiatic treasure deposited in chests beneath a temple in upper Egypt containing such a miscellaneous hoard". (Page-30, Ibid)

উপরে বর্ণিত এই সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে অতঃপর এই সত্যই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে যে অতি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের বিক্ষিপ্ত অংশ হিসাবে আরব ও মিসর দেশের মত বাংলাদেশও অতি প্রাচীন একটি দেশ এবং অতি পুরাতন প্রত্ন প্রস্তর যুগ হইতেই বাংলাদেশের সহিত আরব ও মিশর দেশের মানুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক অতীতের অতি প্রাচীন যোগসূত্রে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানিতে বুঝিতে হইলে আরব ও মিশরের বিশেষ করিয়া আরব ভূ-খণ্ডের অতি প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যে এক অপরিহার্য কর্তব্য, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করিবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও অনুধাবন করিবেন যে বর্তমান কালের আরবের ও মিশরের মানুষের অজ্ঞতা, অকর্মন্যতা, সংকীর্ণতা ও সর্বোপরি অযোগ্যতার কারণে আরবের মেসোপটেমিয়া ও মিশরে বিশ্বমানব সভ্যতার যে সূচনা, বিকাশ, সমৃদ্ধি ও সর্বকালের বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল সেই ইতিহাসকে বর্জন করিয়া পৃথিবীর যে কোনও স্থানের মানব সভ্যতার ইতিহাস যেমন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না তেমনি সে ইতিহাসের অস্পষ্টতাও দূর হইতে পারে না।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩

বাংলাদেশ ভারতের কোনও অংশ নহে

"বিদেশী ভ্রমনকারীগণ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে প্রায়ই আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন না—এ দেশে আসেন ভারতীয় ভাবধারা ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতুহলী হইয়া—তাঁহাদের ইহা বুঝিতে দেরি হয় না যে, এই বিরাট দেশের মধ্যে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং ভারতের অপরাপর জাতির মধ্যে বাঙালীগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

হেনরি নোয়েল ব্রলসফোর্ডের প্রসিদ্ধ পুস্তক "বিদ্রোহী ভারত" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা এই স্থানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাংলাভূমির মিল নাই। প্রকৃতিই বাংলার সীমা নির্ধারিত করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের রৌদ্র দগ্ধ মরুভূমি ও উত্তরাঞ্চলের বিশুষ্ক সমতল ক্ষেত্রের তুলনায় বাংলার তৃণাচ্ছাদিত ভূমির শ্যামলতা মনোমুগ্ধকর।------বাংলায় পদার্পণ করিলে মনে হয়, যেন এক নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়াছি এবং বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে। বাঙালীদের সৌন্দর্য পিপাসু মনের পরিচয়ও এইখানে পাওয়া যায়।" (বাংলার বৈশিষ্ট্য, শ্রী শচীন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-২২, বাংলার শক্তি, শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

বাংলাদেশ যে প্রকৃত পক্ষেই ভারতের বাহিরে একটি ভিন্ন দেশ তাহা নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও বোধগম্য হইবে—

"বৈশিষ্ট্য, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ দেখিয়া ধরিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের বাহিরে ছিল। (বৈশিষ্ট্য ১, ৮—১৫; বৌধায়ন ১ প্র, ২ কা, ৯) (পৃষ্ঠা-৪২৯, নব্য ভারত, কার্তিক ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার)।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুও বলিয়াছেন—Bengal, which had never been properly a part of India until the British regime......." Buddha Dev Bose, Nazrul and Modern Bengali music, News values, September, 1949.

বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তির পরিপূরক সাক্ষ্য নিম্নলিখিত ভাষ্যেও সবিশেষভাবেই প্রনিণধানযোগ্য—

www.pathagar.com

ভারতের ইতিহাস

"ভারত ভাগের কথাটাই আগে বিচার করা যাক। যে ভারত ভাগ হয়েছে সেটা বৃটিশ ভারত। সেই 'অখণ্ড ভারত' সৃষ্টির পিছনে হিন্দুদের দান কোনও সময় ছিল না। রাম সেই ভারত সৃষ্টি করেননি, কৃষ্ণও না। মৌর্য ভারতও সেটা নয়, গুপ্তরাও সে ভারত সৃষ্টি করতে পারেননি। এটা ইতিহাস।

যে ভূগোল প্রতিমাকে আমরা এ যুগের 'অখণ্ড ভারত' বলে ধরে নিচ্ছি, সেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল এবং বৃটিশের সৃষ্টি। এটাও ইতিহাস। কিন্তু সেটার নির্মাণ শুরু হয়েছিল মোগল যুগে।

বাবর ভারতে সেই মোগলদের আদি পুরুষ। তিনি ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোগল ডাইনেষ্টির গোড়াপত্তন বা শিলান্যাস করেন। পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসকেরা আধুনিক 'অখণ্ড ভারতের' ভূগোল প্রতিমাকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। এই হল ইতিহাস।

এটা হল রাজনৈতিক ভারতের রূপরেখা। কোনও সময়ে এই ভারতের ভৌগোলিক রেখা সংকুচিত হয়েছে, কখনও বা এই ভারতের ভৌগোলিক সীমানা প্রসারিত হয়েছে। এই ভারতের স্ফীতি বা সংকোচনে ভারতীয় হিন্দুদের ভূমিকা ছিল বেতনভুক আমলার। এটাও ইতিহাস।" (পৃষ্ঠা-১১০, ১১১, সানন্দা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯; ২৮ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কলিকাতা, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ, গৌর কিশোর ঘোষ)।

সুতরাং বাংলাদেশ যে সম্পূর্ণরূপেই একটা ভিন্ন দেশ। ইংরাজের সৃষ্ট তথাকথিত অখণ্ড ভারতের কোন অংশ যে কোন প্রকারেই হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৪

অতীতে ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্ত নামে কোন দেশ ছিল না

ঐ নামে কোন অখন্ড একটি মাত্র দেশও ছিল না। ইংরেজ আসাতে ইহা গজাইয়া উঠিয়াছে।

উপরের শিরোনাম দেখিয়া পাঠক হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রয়াত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের একটি ভাষণে এই সত্য দিবালোকের মতই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়া বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু বলিয়াছেন—

"আমার কোন বন্ধুর হয়ত মনে পড়বে ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মতের সমর্থন করে সম্মানের সঙ্গে ডিগ্রী পেয়েছেন এক বিদ্বান, যিনি পুরাকালে ভারত বলে কোন দেশ সত্তার কল্পনা এখানকার লোকের মনে উঠতো না, পরে ইংরেজ আসাতে এটা গজিয়ে উঠেছে—এইটে প্রমাণ করেছে"। (দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৭ই জুন, ১৯৭৩; ৩রা আষাঢ়, ১৩৮০, কলিকাতা)।

তেমনি "আর্যাবর্ত" নামেও কোন দেশ সত্তার কল্পনা যে এখানকার লোকের মনে উঠিত না, পরে ইংরাজ আসাতে ইহা গজাইয়া উঠিয়াছে, ইহা ধরা পড়ে এই সত্য হইতেই যে এতদ্দেশে ইংরাজ আমলে বঙ্গদেশের প্রধান বিচারপতি ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি (Sir William Jones) স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং মিসরতত্ত্ববিদ (Sir Thomas Young) স্যার টমাস ইয়ং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যেহেতু সর্বপ্রথম 'আর্য' শব্দের ব্যবহার শুরু করেন সেহেতু 'আর্য' শব্দ হইতে 'আর্যাবর্ত' নামে যে একটি কাল্পনিক দেশ সত্তাও ইংরেজ আমলেই গজাইয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়। সুতরাং ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে 'আর্যাবর্ত' নামে কোন দেশ যেমন ছিল না, তেমনি অখণ্ড একটি দেশ বলিতেও কিছুই ছিল না।

আর্যাবর্ত নামে কোন দেশ যে ছিল না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে এই সত্য হইতেই যে বর্তমানে ভারত নামে আখ্যায়িত দেশটিতে এযাবৎকাল সে সমুদয়

Ref. Greek writers called it the Indos, Romans the Indus--- (Page-186, The Periplus of the Erythraean sea, Lionel Casson)

www.pathagar.com

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে আর্যদের কোন নিদর্শন যেমন মিলে নাই তেমনি ভাষাগত অনুসন্ধানেও তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এ সত্য "আর্য নামের ভাঁত্ততা" শিরোনামে এই পুস্তকের প্রথম ভাগের একটি আলোচনায় বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে।

এমনকি ইংরাজ আমলের পূর্বে ভারত নাম যেমন ছিল না, যাহা পূর্বেই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণিত হইয়াছে তেমনি অখণ্ড ভারত বলিয়াও যে কোন দেশ ছিল না তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন লিখিত ভাষ্যের সত্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে।

"একথা মনে রাখা উচিত দেশবাসী সকলকে আমরা এক নাম দিয়ে পরিচিত করিনি। মহাভারতে কাশী, কাঞ্চি, মগধ, কোশল প্রভৃতি প্রদেশের কথা শুনেছি, কিন্তু তাদের সমস্তকে নিয়ে এক দেশের কথা শুনিনি।" (পৃষ্ঠা-৪২ বাংলাভাষা পরিচয়)।

১৯৭৬ সালে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ইংরেজ মাউন্ট ব্যাটেন নিজেই বলিয়াছেন, "ভারত যে একটি দেশ নহে ইহা উপলব্ধি করিবার পূর্বে আপনারা ভারতের সমস্যা বুঝিতে পারিবেন না। এশিয়া মহাদেশের সহিত যুক্ত বলিয়াই ইহাকে উপমহাদেশ বলা হইয়া থাকে। অথচ আসলে ইহা একটি মহাদেশ।" (মাউন্ট ব্যাটেন এণ্ড দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া, পৃষ্ঠা-৪২।) (ভারত বিভাগ রঙ্গমঞ্চের গ্রীন রুমে, ফারুক মাহমুদ, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ মে, ১৯৮৮)।

সুতরাং ভারত একটি মাত্র অখণ্ড দেশ নহে, বরং অনেক গুলি ছোট বড় দেশের সমন্বয়ে একটি মহাদেশ, এই অতি বাস্তব সত্যের কথা জানিয়াও ইংরেজ তাহার সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই এই মহাদেশটিকে একটি মাত্র অখণ্ড দেশে পরিণত করিয়া সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মানুষের উপরে অত্যাচার ও অবিচারের নির্মম নিষ্পেষণ চাপাইয়া দিয়া সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মানুষকে যে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া গিয়াছে নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্যেও উহার পরিপূরক সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য—

"Truly, the colonical powers have divided the world to their advantage by artificially dividing countries. They did not care about the consequences to the local population.

They punished a big country like Iraq by giving it only one port Basra, while they rewarded the tiny Sabah family with immense oil wealth and good ports. Look at Malayasia and oil

www.pathagar.com

rich Brunei! Whatever British Prime minister Margaret Thatcher says about right and wrong, a lot of blood and atrocitics could have been avoided if tiny Britain had not gone to conquer the world. The atrocities that the British committed in India during their rule are unforgivable. Hundreds of thousand innocent people died during the partition of India and Pakistan. The same for Palestine.

Now the British talk about democracy and justice. They forget the days when a tiny island like Britain made most of the world its slave.—O Vasan, Yorba Linda" (The Los Angeles Times, October, 19, 1990, Metro Page).

উক্ত বিদেশী শাসক ইংরেজই যে তাহার সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অখন্ড ভারত তথা হিন্দুস্থানেরও সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—

The shock of mutiny drove the London and the Calcutta Government to consider how to achieve a closer contact with Indian opinion in order to avoid similar tragedy in future. (C. H. Philips, India, Hutchinsons Uiversity Library, London, 1948).

"In 1861 enacted the "Indian councils Act of 1861" Which provided for nomination of "Indian non-official representatives on the council of the Governor-General---- Awakening of the Hindu mass was taken up and political preaching started. The sky was rent with the cries of "Indian Nationality" and "Indian aspirations." "We were," wrote Sir Edwin Arnold in his study of Lord Dalhousis adminstration in 1865, "making a people in India where hitheto there have been a hundred tribes but no people. (Discovery of Pakistan" A. Aziz).

তাইত, ইংরেজ সৃষ্ট অখণ্ড ভারতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাঞ্জাবে শিখ, জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসী, দাক্ষিণাত্যে তামিল, মিজোরামে মিজো, আসামে আসামী, নাগাল্যাণ্ডে নাগা প্রভৃতি জাতিগণ আজ পর্যন্তও যে সংগ্রাম করিতেছে তাহাতেও ধরা পড়ে যে ভারত প্রকৃত পক্ষে একটি অখণ্ড দেশ নহে।

www.pathagar.com

"They (The Nagas) now claim autonomy over the part of the territory occupied by them which is called Nagaland". (Page-667, A dictionary of Indian history, Sachchinanda Bhattacharya, C. U. 2nd Edition). ইহা ছাড়া, যে ইংরেজ অখণ্ড ভারতের স্রষ্টা সেই ভারতে ইংরেজদেরই সর্বশেষ ইংরেজ-গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনও তাঁহার এক সাক্ষাৎকারে যেহেতু বলিয়াছেন যে ভারত একটি দেশ নহে, একটি মহাদেশ সেহেতু ভারত যে একটি দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহা বুঝিতে আর অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন হয় না।
(মাউন্ট বাটেন এন্ড দি পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া)

"অধ্যাপক রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় Fundmental unity of India নামক গ্রন্থে, প্রাচীনকালে আর্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি রায় বাহাদুর রমা প্রসাদ চন্দ সমগ্র আর্যাবর্তে---------পূর্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিতান্ত অসম্ভব ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন।" (সবুজপত্র ১ম বর্ষ, পৃঃ ৪০৩।)।

অধ্যায়-৫

বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামের প্রাচীনতা

বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি কত প্রাচীন, তাহা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ও হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য হইতে কিছুই জানিবার উপায় নাই। শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কিন্তু 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে দেখিতে পাই। --- অথর্ব পরিশিষ্টে দেশবাচী বঙ্গ শব্দের প্রয়োগ আছে। তারপর দেশ সূচক বঙ্গ শব্দের এইটিই সর্ব প্রাচীন প্রয়োগ।" (পৃষ্ঠা-৬৩১, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৮, বাঙ্গালীর ইতিহাস)।

কিন্তু অধ্যাপক শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার বলেন ভিন্ন কথা, "বহু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ নামের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ---- হিন্দু প্রাচীন সাহিত্যে উহার নাম পাওয়া যায় না। --- কিন্তু এই প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের বয়স কত, তাহা যখন সুনির্দিষ্ট নয়, তখন ঐ দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গ দেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বলা চলে না।" (পৃষ্ঠা-৪২৯, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, নব্য ভারত, কার্ত্তিক, ১৩১৭)।

আর ১৮০৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত প্রবর অক্ষয় কুমার দত্ত লিখিয়াছেন,—

"পাঁচশত বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত ঐ সমস্ত তন্ত্র গ্রন্থ ঐ সময়ের অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।---কোন কোন তন্ত্রে ভবিষ্যৎ কীর্তন ছলে লণ্ডন নগর ও লণ্ডনবাসী ইংরেজদের নাম পর্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠ করিলে অক্লেশেই বুঝিতে পারা যায় ঐ তন্ত্র ইংরেজদের ভারত বর্ষাধিকার প্রবর্তনের উত্তর কালে বিরচিত হয়।" (পৃষ্ঠা- ১৮৫, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ+৭৯=১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)।

প্রাচীন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের বয়স কত তাহা যেমন সুনির্দিষ্ট নয়, তেমনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সমূহে উল্লেখিত বিবরণ সমূহে অতি কথন, অতিরঞ্জন, ধর্মীয় কুসংস্কার বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি কারণেও প্রাচীন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে বঙ্গদেশের তথা বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই দেখিয়া একজন বিশিষ্ট গবেষকও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"Although traditional history has been built up for the period antedating the historical

www.pathagar.com

beeginning on the basis of the accounts given in the puranas, the historians themselves agree that these accounts are vitiated by exaggeration, mythological details, pronounced raligious bias and the divergencies in the texts of the different Puranas and subsequent modifications and revisions of the same by different scholars at different periods. So nothing substantial can be gathered for linking the geological past with the beginning of history" (Rivers we live with (5): The missing link, M.I. Chowdhury, The Pakistan Observer, July 10, 1966)

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের ও সাহিত্যের মত বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে ও সাহিত্যেও বঙ্গ নাম পাওয়া যায় না। "খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পালি নামে পরিচিতি প্রাকৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার স্থানে স্থানে এমন বিষয়ের অবতারণা আছে যাহাতে আর্যজাতির পরিচিত দেশগুলির সম্পূর্ণ উল্লেখ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সে সকল স্থানে বঙ্গ নাম পাওয়া যায় না। তখন মনে করা যাইতে পারে যে অথর্ব বেদে এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দেশ সংস্থান সম্বন্ধে যতদূর পাওয়া যায়, পূর্বদেশ সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগে তদরিক্ত দেশের জ্ঞান ছিল না। (Buddhistic India, P. 29)। বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রগুলি যে বুদ্ধদেবের সময়ের অনেক পরবর্তী তাহাও এই নির্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়।" (পৃষ্ঠা-৪৩২, নব্য ভারত, কার্তিক ১৩১৭, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার)।

বঙ্গদেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধন বঙ্গদেশের প্রাচীনতম রাজধানী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই "পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বলিতে কেবল উত্তর বঙ্গ বুঝায় না, বর্তমান সময়ে আমরা যে দেশকে পূর্ববঙ্গ বলি তাহার কিয়দংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষণ সেন দেবের পুত্র কেশব সেন দেবের রাজ্যকালের একখানি তাম্র শাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (পৃষ্ঠা-৬৪, বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের অত্যাচারে বঙ্গদেশের উক্ত প্রাচীনতম রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ও বঙ্গ দেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই।

"হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। রাজা মিহিরকুল বৌদ্ধ জনপদ গান্ধার দেশের চৈত্য বিহার প্রভৃতির উন্মূল করিয়া ষাটি হাজার লোকের প্রাণনাশ করেন।" "দেবানাং পিয়াপয়দসসির" আজ্ঞায় অল্প সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উপকণ্ঠী গোপপল্লীর সতর (১৭) হাজার জৈনের প্রাণ নাশ হয়। রাজা পুষ্যামিত্র বৌদ্ধ শ্রমণদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিতে ইতঃস্তত করেন নাই। দারুণ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া রাজা বৃহদ্রথ এক রাক্ষসের (অর্থাৎ অব্রাহ্মণের) প্রাণবধপূর্বক তাহার চর্মে ভেরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।" (পৃষ্ঠা-২৪৪, গৌড়ের ইতিহাস, শ্রী রজনী কান্ত চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড)।

"হিন্দুরা যে বৌদ্ধদিগকে নৃশংসভাবে নিগ্রহ করেন তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ ও বিস্তর নির্দশন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশ্মীর সমীপস্থ সর্নাথ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্তমান থাকিতেই সর্নাথের বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেবমূর্তি এবং অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। ঐ সর্নাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে----জগৎ সিংহ, কানিংহেম, ফিটো, টমাস ও হল ঐ স্থান খনন ও অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন অস্থি, লৌহ, আর্দ্ধদ্রব লৌহরাশি পিত্তল পিণ্ড, শষ্ঠ, প্রস্তর, প্রস্তুত রুটি, দগ্ধ শস্য ও অস্বিন্ন অন্ন একত্র রাশিকৃত রহিয়াছে। মনুষ্য, দেবালয় ও দেব-প্রতিকৃতি যে একত্র ধ্বংস করা হয়, ঐ সমুদয় তাহারই নিদর্শন।----মাধবাচার্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংহার উদ্দেশ্যে এই আদেশ দেন যে, ---- একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবাল বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ করে না তাহাদিগকে বধ কর।" (পৃষ্ঠা-১৯৩, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ১ম খণ্ড, ১৮০৪ শকাব্দ +৭৯ = ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের উপরিউক্ত অমানুষিক অত্যাচারের কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের পূর্ববর্তী এতদ্দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস করিয়া তদস্থলে এতদ্দেশের প্রাচীন সভ্যতা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদেরই দান, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্যই যে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগণ এতদ্দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের উপরে উপরিউক্ত অত্যাচার করিয়াছিল তাহা চীনদেশের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত হইবার কারণ, খৃষ্টপূর্ব ২২৯ সালে প্রথম সম্রাট যিনি "চেহীন"-এর প্রিন্স ছিলেন তিনি নিজেকে চীনের প্রথম সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাসের সমস্ত নিদর্শন পোড়াইয়া ধ্বংস করেন। অথচ তিনি চীনের প্রথম সম্রাট ছিলেন না।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের উপরে বর্ণিত উত্থান কেবল উপরিউক্ত অত্যাচারেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তৎসঙ্গে চতুর্দিকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেরও যে

www.pathagar.com

চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে এতদ্দেশের প্রাচীন সভ্যতা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদেরই দান, এমন অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগণ এতদ্দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের উপরে একদিকে যেমন অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল অপরদিকে তেমনি এতদ্দেশের প্রাচীন নির্দশন সমূহও ধ্বংস করিয়াছিল।

"শশাংকের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত (৬১৯খৃঃ)। ---- বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য নরেন্দ্র গুপ্ত (শশাংক) অত্যাচার, অনাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। --- অসংখ্য অত্যাচারের কাহিনীতে ইহার রাজত্বকাল পূর্ণ। --- (ব্রাহ্মণ্য) হিন্দু ধর্মের এই উত্থান উৎপীড়নেই পর্যবসিত হইল না, চতুর্দিকে প্রাচীন (ব্রাহ্মণ্য) শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হইল। এই অত্যাচার ও প্রাচীন (ব্রাহ্মণ্য) শাস্ত্র চর্চাই আর্য (ব্রাহ্মণ) পূর্ব বাঙ্গালা রচনার বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার কারণ।" (পৃষ্ঠা-৭৮, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান, ১ম খণ্ড)। নিম্ন লিখিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—

"পানিনির পরে পতঞ্জলি বঙ্গাদিদেশ এবং প্রাচ্যদেশীয় কথ্য ভাষা বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য দিয়াছিলেন। এসব সত্ত্বেও সে যুগের গৌড় বঙ্গে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয়ই রক্ষা পায়নি। হয়ত আর্য-ভাষার সাহিত্য রীতি থেকে এই ভাষা সাহিত্যের প্রকৃতিগত মূল পার্থক্যের দরুনই তা সযত্নে রক্ষিত হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্য ভাষাকে অসূর্য ভাষা বলা হয়েছে, পাতঞ্জলিও এ দেশে "আসুর" উচ্চারণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, দেব ভাষার প্রবল প্রসারের দিনে 'দেবেতর' এই "আসুর ভাষার" সাহিত্য কর্ম একদিন অবহেলায় বিলুপ্ত হয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।" (পৃষ্ঠা-১৯, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী ভূদেব চৌধুরী, ১ম পর্যায়, ৩য় সংস্করণ)।

এতদ্ব্যতীত, এতদ্দেশের প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থ হইতেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছুই যে জানিবার উপায় নাই তাহা ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও সহজেই বোধগম্য হইবে—

"ভারতের যে ইতিহাস আমাদের অধিকাংশকেই পড়তে হয়েছে তা বেশীর ভাগই ইংরেজদের লেখা, তাতে পাওয়া যায় ইংরাজ শাসনের প্রয়োজন ও তার উপযোগিতা সম্পর্কে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর, আর পাওয়া যায় তাদের এ দেশে আসার আগের হাজার বছর যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে এক প্রকার খোলাখুলি ভাবেই অবজ্ঞা প্রকাশ।" (পৃষ্ঠা-১৮০, ভারত সন্ধানে)

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামের প্রাচীনতা সম্বন্ধে জানিবার উপায় কি? একমাত্র উপায়, অতি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা দেশের সহিত বাংলা-পাক -ভারতীয় উপমহাদেশের বাহিরের যে সকল দেশের প্রাচীন যোগসূত্র ছিল সে সকল দেশে অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল দেশে বঙ্গদেশের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে সেই নিদর্শনের দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হইতে পারে। তদ্রূপ একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী অপেক্ষাও প্রাচীন

"বঙ্গ নামক জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে একদল আনামে (থাইল্যাণ্ডে) গিয়া উপনিবেশ করে, এ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আনামের রাজকীয় বিবরণে বিবৃত আছে। এই বঙ্গ জাতির প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আনামের ইতিহাসে বঙ্গ জাতি বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে। আবে লোনে (Abb'e Launey-Histoire L' Annam), রোমানে দু'কেলো (Romanet du cailand "Notice sur le Tongking". দে মিশেল (Des Michels—"Annales Imperiales de l, Annam") প্রভৃতি আনাম ইতিহাসের প্রাচীনতম ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, আনাম সভ্যতায় ভারত প্রভাবের (অর্থাৎ বঙ্গ প্রভাবের) যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দিগদর্শন হিসাবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল—

একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আনাম রাজ্যে গমন করেন। তাহার নাম 'লাক লোঙ' (Lak-Long)। ইহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিল। আনাম দেশের বিবরণে আছে যে, ইনি তাহার জন্মভূমি "বন-লাঙ" (Van Lang) পরিত্যাগ পূর্বক আনাম রাজকে বিতাড়িত করিয়া নিজে রাজা হন। এখানে উকি নামে এক রমনীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার এই রাজ্যের নামও তিনি দেন—"বন-লাঙ" রাজধানীর নাম দেন "ফোঙ-চু"। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। গল্পগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে সেই সমস্ত গল্প হইতে সার নিষ্কর্ষ করিতে পারা যায়। তদনুসারে বলিতে পারা যায় যে, 'বন-লাঙের' অধিবাসীর 'বন' বা 'বঙ' নামে পরিচিত ছিল। এই "বন" ও "বঙ্গ" অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই 'বন' বা 'বঙ্গ' জাতি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব করে। আনামের বিবরণে ইহাদের আঠারজন রাজার উল্লেখ মাত্র আছে। উহাদের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ২৫৮ খৃঃ পূঃ শতকে 'সুক' রাজা হন।

www.pathagar.com

'লাক-লোঙ' যিনিই হউন, ইনি যে বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লইবার মত প্রমাণ সুপণ্ডিত জেরিনি প্রমুখ পণ্ডিতগণ দিয়াছেন।" (পৃষ্ঠা-৬৩১, বাঙালীর ইতিহাস, শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৮, ৫ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড, কলিকাতা)।

উপরে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতক অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। কেননা, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকেরও পূর্ব সময় হইতে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি প্রচলিত না থাকিলে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দেশের বাহিরে আনামে প্রকাশিত হইতে তথা আনামের ইতিহাসের প্রাচীনতম ঘটনার বিবরণে উল্লেখিত হইতে পারিত না। এমন কি খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামে দেশের পরিচয় ছিল বলিয়াও নিম্নের ভাষ্য হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

"আরাকান এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি "পূর্বভারত দেশের" (Further India) ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধ দেবের সময়েরও বহু পূর্বে, খৃষ্ট পূর্ব নবম শতাব্দীতে দ্রাবিড় জাতীয়েরা, ভারতের দক্ষিণ এবং পূর্ব বিভাগ (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ) হইতে গিয়া ঐ সকল দেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। --- নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় আদি ভূমির দেশ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নামে নূতন দেশের নদী প্রভৃতির নাম দেওয়ার রীতি (বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি) এখনো অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ---- ইরাক কন হইতে 'আরাকান' নামের উৎপত্তি।" (পৃষ্ঠা-৪৩১, ৪৩২, নব্য ভারত, কার্তিক, ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা—কলিকাতা, বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার)। ইরাক একটি আরব দেশ। সেই ইরাক শব্দই (আরবী ভাষার বহু বচনের রীতিতে হয় ইরাক-কীন অর্থাৎ ইরাকীদের) হইয়াছে ইরাক-কন। আর এই ইরাককন শব্দ হইতে 'আরাকান' নাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে যে উপরের উদ্ধৃতির ঐ সকল দেশে গিয়া যাহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন তাহারা মূলত আরবী ভাষা ভাষী আরব জাতীয় লোকই ছিলেন। তাই উপরের উদ্ধৃতিতে যাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতীয়তা বলা হইয়াছে তাহারা যে দ্রাবিড় জাতীয় লোক ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই আরব জাতীয় লোক তাহা উপরিউক্ত 'ইরাক-কন' শব্দই নির্দেশ করিতেছে।

সে যাহা হউক, শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার উপরে বর্ণিত ভাষ্যে উল্লেখিত 'বন-লাঙ' শব্দ হইতে 'লাঙ' বর্জন করিয়া শুধুমাত্র 'বন' শব্দ গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়া 'বুন' ও 'বঙ্গ'কে অভিন্ন শব্দ বলিয়া যে সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে আংশিক সত্য প্রকাশিত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হইতে পারে নাই। কেননা, 'বন-লাঙ' ও বাঙ্গালা শব্দ দুইটির মধ্যে যে ধ্বনি-গত ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে "বাঙ্গালা" শব্দটিই আনামের স্থানীয় উচ্চারণে "বন-লাঙ" এ যে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা অক্লেশেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উক্ত "বন-লাঙ" শব্দে শুধু মাত্র 'বঙ্গ' না বুঝিয়া 'বাঙ্গালা'ই বুঝিতে হইবে। এতদসত্ত্বেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি একই দেশের দুইটি নাম শব্দ রূপেই এ যাবৎকাল যে টিকিয়া রহিয়াছে তাহা নিম্নবর্ণিত ঐতিহাসিক সত্য হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে—

"But Bang and Bangala are mentioned separately in several inscriptions of South India and Tariq-e-Ferojshahi of Shams-i-Siraj Afif---" (Page, 19, The History of Bengal, Vol. I, Hindu period, R. C. Mazumdar)

একই দেশের বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামে দুইটি নাম শব্দের উৎপত্তি কেন হইয়াছে, ইহার কারণ কি তাহা বঙ্গ ও বাঙ্গালা শব্দের মূলে যে আরবী শব্দ রহিয়াছে, সেই আরবী শব্দের অর্থ হইতে শব্দ দুইটির উৎপত্তির কারণ ও তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়িবে, যাহা এই গ্রন্থের ৪ অধ্যায়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূল আরবী বিষয়ে আলোচনায় পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৬

বাংলাদেশের প্রাচীনতম বা আদিম অধিবাসী

প্রাচীন বঙ্গদেশের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের প্রাচীনতম বা আদিম অধিবাসী কাহারা ছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

"আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী।---------উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্যগণ কর্তৃক বিজিত হইবার বহু কাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও মগধ ও বঙ্গ আর্য জাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই।" (পৃষ্ঠা-২৩, বাঙ্গালার ইতিহাস)।

উপরের এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে "যে প্রাচীন জাতি ভূ-মধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল--------এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী" বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রথমেই অনুসন্ধান করা কর্তব্য, কোন প্রাচীন জাতি ভূ-মধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহার পরেই দ্বিতীয়তঃ বিবেচ্য সেই প্রাচীন জাতির নাম দ্রাবিড় ছিল কিনা। তাহা হইলেই সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে কোন প্রাচীন জাতি বাংলাদেশের প্রাচীনতম বা আদিম অধিবাসী ছিল, যাহা হইতে বর্তমান 'বাঙাল' আখ্যায়িত বাঙালী জাতি উদ্ভূত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত কোন প্রাচীন জাতি যে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই স্থির করিতে পারা যাইবে।

"Fertile land between Egypt and Mesopotamia was the center of early civilizations----a narrow strip of land squeezed between mediterranean sea and the barren wastes of Arabia. In ancient times this strip, together with Mesopotamia, formed a crescent shaped area which has become known as Fertile

www.pathagar.com

crescent. Because the coastal plain was suitable for farming and herding. Semitic peoples flocked to it from regions where they found it harder to make a living---early civilizations grew up here, particularly in Phoenicia (i.e. Syria) and Palestine---In the central portion of this narrow coastal plain lived the Phoenicians. In front of them was the Mediterranean Sea, behind them the tall, forest clad Lebanon Mountains. Cut off by the mountains from the land mass to the east, the Phoenicians (i. e. Syrians) naturally turned to the sea for their lievlyhood. As a result they became skilled ship-builders, expert sea men and keen traders." (Page-74, The history of our world, Teachers Edition, Editors Arthur E. R. Boak and others.)

"At many points, specially along the Mediterranean coast of Africa, these sea going Phoenician traders started fishing and trading settlements. In time some of these settlements grew in to important cities--- These Phoenician colonies, in turn, sent out ships of their own on trading voyages and helped to spread new ideas and ways of living--- For a long time Phoenicia was ruled by Egypt, but about 1100 B. C. it became independent. During the next 400 years, fleets from Phoenician cities especially Tyre and Sidon controlled the Mediterranean Sea. After 700 B. C. however, Phoenicia fell under the power of conquerors from Mesopotamia. Although Phoenicia ceased to be an independent state, its merchants continued their sea trade for centuries---- Although the Phoenicians (i. e. Syrians) came from a small country, they became the leading traders of early times in the Mediterranean (Page-74, Ibid)

"There is a written record by the historian Herodotus, after his visit to Egypt, stating that in the time of Pharaoh Necho who ruled about 600 B. C. the Egyptians had dispatched a Phoenician fleet to sail round Africa. Being responsible for the expedition, some of Pharaohsown men obviously participated,

www.pathagar.com

although it is exclusively recorded that ships and sailors were Phoenicians," (Page-243, The R. A. Expedition, Dr. Thor Heyerdahl, translated by Patricia Crampton)

Their (the Phoenicians) home was in the distant eastern Mediterranean----The Phoenicians like their Egyptian neighbours and in most of the earliest Mediterranean civilzations were sun worshipers. (Page-245, Ibid)

"--------Their (Phoenicians) sailors must have taken priests, architects and other representatives of nations elite with them on their voyages of colonization outside the Mediterranean. In fact, the maritime Phoenicians are known first and foremost as traders and intermediaries of civilization in the ancient world --- we know Phonician expedetion sailed on Egyption request. There was phoenician timber in the ships buried in the Egyptian pyramid--- In peace and war there were intimate contact between the two countries." (Page-246, Ibid)

অর্থাৎ ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যবর্তী ভূ-মধ্যসাগর ও আরবের অনুর্বর ও অকর্ষিত প্রায় জনশূন্য ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড মেসোপটেমিয়াসহ একটি ক্ষীণ চন্দ্রাকার অঞ্চল গঠন করে, যাহা "উর্বর ক্ষীণ চন্দ্র" নামে পরিচিত হয়। কারণ, এই উপকূলবর্তী সমভূমি কৃষি কার্যের ও পশু চরাইবার উপযোগী ছিল। যে অঞ্চলে জীবন ধারণ করা কঠিন ছিল সে অঞ্চল হইতে সেমিটিক অর্থাৎ আরবীয় জনসাধারণ এই অঞ্চলে আসিয়া জমা হয়। এইখানেই বিশেষ করিয়া ফিনিশিয়া (অর্থাৎ সিরিয়া) ও প্যালেস্টাইনেই প্রাচীনতম সভ্যতা গড়িয়া উঠে। এই সংকীর্ণ উপকূলবর্তী সমভূমির মধ্যভাগেই বাস করিত ফিনিশীয়গণ (অর্থাৎ সিরিয়গণ)। তাহাদের সম্মুখে ছিল ভূ-মধ্যসাগর ও পিছনে ছিল লেবাননের বনময় পাহাড় শ্রেণী। পাহাড়ের দ্বারা পূর্বদিকের ভূমি হইতে বিচ্ছিন্নতার কারণে ফিনিশীয়গণ (অর্থাৎ সিরিয়গণ) তাহাদের জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সাগরের দিকে নজর দেয়। ফলে তাহারা কুশলী জাহাজ নির্মাতা দক্ষ নাবিক ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হইয়া উঠে।

অনেক অবস্থানে, বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল বরাবর এই সমুদ্রগামী ফিনিশীয় (অর্থাৎ সিরীয়) ব্যবসায়ীগণ মাছ ধরিবার ও ব্যবসার জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালক্রমে এই সকল

www.pathagar.com

উপনিবেশ গুরুত্বপূর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছিল। এই উপনিবেশ সমূহ পালাক্রমে উহাদের নিজেদের জাহাজ সমুদ্রপথে দীর্ঘ বাণিজ্য-ভ্রমণে প্রেরণ করিত এবং নূতন ভাবধারা ও জীবনধারা বিস্তারে সাহায্য করিত। ফিনিশিয়া (অর্থাৎ সিরিয়া) বহুকাল ধরিয়া ইজিপ্ট (অর্থাৎ মিসর) কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু ১১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইহা স্বাধীন হইয়াছিল। পরবর্তী ৪০০ বৎসরকাল ধরিয়া ফিনিশীয় (অর্থাৎ সিরীয়) নগর সমূহ হইতে, বিশেষ করিয়া টায়ার ও সিডন হইতে জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রিত করিত। সে যাহা হউক, ৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে ফিনিশিয়া (অর্থাৎ সিরিয়া) মেসোপটেমিয়ার বিজয়ীদের শক্তির অধীনে পতিত হয়, যদিও ফিনিশিয়া (অর্থাৎ সিরিয়া) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে টিকিয়া থাকিতে ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইহার বণিকগণ তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য শত শত বৎসর ধরিয়া চালাইয়াছিল।-----যদিও ফিনিশীয়গণ (অর্থাৎ সিরীয়গণ) একটি ক্ষুদ্র দেশ হইতে আসিয়াছিল তাহারা প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরে নেতৃত্বদানকারী বণিক ছিল।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস কর্তৃক তাঁহার ইজিপ্ট (অর্থাৎ মিসর) ভ্রমণের পরে একটি লিখিত বিবরণ রহিয়াছে যে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ফেরাউ নিকো যখন রাজত্ব করিতেন তখন ইজিপ্ট (অর্থাৎ মিসর) আফ্রিকার চতুর্দিকে পরিক্রমণের জন্য এক ফিনিশীয় নৌবহর প্রেরণ করিয়াছিল। অভিযানের দায়িত্ব বহন করিবার জন্য ফেরাউর নিজের লোকেরা (অর্থাৎ মিসরীয়রা) অবশ্যই উহাতে অংশগ্রহণ করিত, তথাপি ইহা স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখিত হইয়াছে যে জল-যান সমূহ এবং নাবিকগণ সকলেই ছিল ফিনিশীয় (অর্থাৎ সিরীয়)।

ফিনিশীয়দের (অর্থাৎ সিরীয়দের) বসতি ছিল সুদূর পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরে (অর্থাৎ সিরিয়ায়)। ফিনিশীয়রা তাহাদের মিসরীয় পড়শীদের এবং ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন সভ্যতার অধিকাংশের মত সূর্য-পূজারী ছিল। ---- তাহারা ভূমধ্যসাগরের বাহিরে তাহাদের উপনিবেশ সমূহ স্থাপনের দীর্ঘ সমুদ্র পথ যাত্রায় পুরোহিত, স্থপতি এবং জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় বাছাই করা অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অবশ্যই সঙ্গে লইয়া যাইত। সমুদ্রগামী ফিনিশীয়গণ প্রাচীন পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে প্রথমতঃ ও সর্বাগ্রে বণিক ও সভ্যতার মধ্যস্থতাকারী হিসাবেই পরিচিত ছিল। ----- আমরা জানি মিসরীয়দের অনুরোধে ফিনিশীয় (অর্থাৎ সিরীয়) সমুদ্রাভিযান পরিচালিত হইত। মিসরীয় পিরামিডের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত জল-যানের কাঠ ছিল ফিনিশীয় (অর্থাৎ সিরীয়)।---- শান্তিতে এবং যুদ্ধাবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল।

www.pathagar.com

সে যাহা হউক, উপরে উল্লেখিত ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয় নাবিক ও বণিকগণই প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, উহার প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতির ভাষ্যে উল্লেখিত ভূমধ্যসাগরে ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয় নাবিকদের নেতৃত্ব দানের ঘটনায় যেমন ধরিতে পারা যায় তেমনি উক্ত ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয় নাবিকদের নেতৃত্বেই মিসরীয় জল যানের বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া বঙ্গদেশ পরিক্রমণের সত্য নিম্ন বর্ণিত ঘটনায়ও ধরা পড়ে।

"As early as ca 2400 B.C, Egypt dispatched expeditions to a land called PUNT to bring back myrrh or frankincense---- PUNT is vsually taken to be Somalia, although an argument has been offered that was much nearer to Ethiopean shore of the Red Sea. (K. kitchen "PUNT and how to get there.") (Page-12, The Periplus of the Erythraean sea, Editor, Lionel Casson)

অর্থাৎ ২৪০০ খৃষ্ট পূর্বকালে ইজিপ্ট (অর্থাৎ মিসর) বৃক্ষজ আঠা বিশেষ এবং গুগ গুল বা ধুনা সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য "পুন্ট" নামক একটি স্থানে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিল।-------পুন্টকে সাধারণভাবে সোমালিয়া বিবেচনা করা হয়, তথাপি এমন যুক্তিও উত্থাপন করা হয় যে উহা লোহিত সাগরের ইথিওপীয় উপকূলের অধিকতর নিকটবর্তী। (কে. কিচেন কৃত "পুন্ট এবং সেখানে কেমন করিয়া যাওয়া যায়" দ্রষ্টব্য)।

এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে যে "পুন্ট" নামক একটি স্থানের কথা বলা হইয়াছে উহাকে সাধারণভাবে সোমালিয়া বলিয়া বিবেচনা করা হইলেও উহা যেহেতু লোহিত সাগরের ইথিওপীয় উপকূলের অধিকতর নিকটবর্তী সেহেতু উহা "পুন্ট" হইতে পারে না বিধায় কে. কিচেন কৃত 'পুন্ট এবং সেখানে কেমন করিয়া যাওয়া যায়' শীর্ষক একটি আলোচনায় প্রশ্নও উত্থাপিত হইয়াছে এই অর্থে যে "পুন্ট" এর অবস্থান নিকটবর্তী না হইয়া দূরবর্তী কোন স্থানে হইতে হইবে। এমতাবস্থায়, এই পুন্ট যে ইজিপ্ট (অর্থাৎ মিসর) হইতে বহু দূরবর্তী বাংলাদেশের বহু প্রাচীন স্থান পুণ্ড্র (বৰ্দ্ধন) নগর তাহা পুন্ট শব্দের সহিত পুণ্ড্র শব্দটির ঐক্য, সাদৃশ্য এবং বহু দূরবর্তী অবস্থানের সত্যে সহজেই ধরা পড়ে। সুতরাং উপরে বর্ণিত ২৪০০ খৃষ্টপূর্বকালে ইজিপ্ট যে বাংলাদেশের উক্ত পুণ্ড্র (বৰ্দ্ধন) নগরেই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত, আরও জানা যায় যে ১৫৭৩-১৩১৪ খৃষ্টপূর্বকাল মধ্যে ইজিপ্টের রাণী হাৎশেপসুৎও উক্ত পুন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) নগরে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

In Egypt, ----- the walls of Queen Hatshepsuts temple a Luxor in the Nile Valley, covered with paintings showing that she had sent an expedition of several large wooden ships right down to the Red Sea to Punt--- (Page 247, The R A Expedition, Dr. Thor Heyerdahl).

অর্থাৎ ইজিপ্টে--- নীল নদীর উপত্যকায় রাণী হাৎশেপসুতের মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায় যে তিনি বৃহদাকারের কয়েকটি জল যানে লোহিত সাগর হইতে পুন্ট নামক স্থানে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উক্ত পুন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের উক্ত পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) নগরের উৎপাদিত দামী বস্তু সামগ্রীতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অতিমাত্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াও জানা যায়। "The state treasuries overflowed with the tribute of Syria, the gold of Nubia, and the costly products of PUNT" (Page-35, The Legacy of Egypt, Edited by S. R. K. Glanville) অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমূহ সিরিয়ার উপহার সামগ্রীতে, নুবিয়ার স্বর্ণে এবং পুন্ট-এর উৎপাদিত দামী দ্রব্য সামগ্রীতে অতিমাত্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

উক্ত পুন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) নগরের মত বাংলাদেশের কাপ্তাই হইতেও যে ইজিপ্টে উপহার প্রেরিত হইয়াছিল তাহাও ইজিপ্টের কবরে অঙ্কিত বা খোদিত উপহার বাণীতে উল্লেখিত কেফতিউ শব্দের সহিত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কাপ্তাই নাম শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্যই নির্দেশ করে। "Some of the tribute bearing "Keftiu" who were depicted in Egyptian tombs may be cretans from crete--- " (Page-34, Ibid)

অর্থাৎ ইজিপ্টের কবরে খোদিত উপহার বাণীতে উল্লেখিত "কেফতিউ" শব্দটি ক্রিটের ক্রিটানদের নামও হইতে পারে।

কিন্তু ক্রিটের ক্রিটানদের সহিত কেফতিউ শব্দটির কোন ঐক্য ও সাদৃশ্য নাই বিধায় কেফতিউ শব্দকে ক্রিটের ক্রিটান মনে করিবার কোনও যুক্তি নাই। ইহা অপেক্ষা কেফতিউ শব্দটির সহিত বাংলাদেশের কাপ্তাই শব্দের সম্পূর্ণ ঐক্য ও সাদৃশ্যই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে "কেফতিউ" শব্দটি কাপ্তাই শব্দেরই বিকৃত বা ভাষান্তরিত রূপ। ইজিপ্টের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উক্ত পুন্ট ও ইজিপ্টের কবরে খোদিত উক্ত কেফতিউ শব্দ দুইটির একত্রে ইজিপ্টে

www.pathagar.com

অবস্থিতি প্রকারান্তরে বাংলাদেশের পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) নগর ও বাংলাদেশের কাপ্তাই নামকস্থান দুইটির প্রতি সুস্পষ্টভাবেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিধায় ২৪০০ খৃষ্ট পূর্বকালে এবং ১৫৭৩–১৩১৪ খৃষ্টপূর্ব কাল মধ্যে মিসর ও মিসরের রাণী হাৎশেপসুৎ যথাক্রমে বাংলাদেশের পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) নগরেই যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও সহজেই ধারণা করা যায়। Eratosthenes, Chief librarian of the huge Egyptian papyrus library in Alexandria on the Nile estuary--- reported that "papyrus ship with the same sails and rigging as on the Nile" sailed as far as Ceylon and the mouth of the Ganges in distant India" (Page-247, The R.A. Expedition, Dr. Thor Heyerdahl).

অর্থাৎ নীল নদীর মোহনায় অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিশাল মিসরীয় পেপিরাস লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরীয়ান ইরাটোসথেনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে নীল নদের মত একই কৌশল ও পালের সাহায্যে মিসরীয় পেপিরাস খড়ের জলযান সিলোন (বর্তমান শ্রীলংকা) এবং দূরবর্তী ভারতের গঙ্গা নদীর প্রবেশ পথ পর্যন্ত চলাচল করিত।

দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র হইতে তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন মিসরীয় জলযানের প্রস্তর নির্মিত একটি নোঙ্গর আবিস্কারেও প্রমাণিত হইয়াছে যে মিসরীয় জলযান প্রকৃতপক্ষেই গঙ্গা নদীর প্রবেশ পথ পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশ পর্যন্ত চলাচল করিত।

"সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র থেকে একটন ওজনের প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন নোঙ্গর উত্তোলন করা হয়েছে। নোঙ্গরটি প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে একটি মিসরীয় জাহাজে ব্যবহার করা হতো বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। তবে নোঙ্গর উত্তোলনকারী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা নোঙ্গরটির বয়স নির্ধারণের জন্য এর কিছু প্রস্তর খণ্ড পশ্চিম জার্মান বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়েছেন।"

—এ এফ বি। (পৃষ্ঠা-১, দৈনিক ইনকিলাব, ৩রা জুন, ১৯৮৭, ১৯শে জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৪)।

এতদস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে পেপিরাস খড়ের জলযান সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী কিনা এবং উহাতে প্রস্তর নির্মিত অত্যন্ত ভারি নোঙ্গরও ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর থর হেয়ারডাল তাঁহার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে "Practical evidence that the papyrus boat was originally developed and specifically rigged for ocean navigation was provided by my

www.pathagar.com

experiments which were organized in 1969 and 1970, Two papyrus boats were built (Viz. R A I and R A II) and tested in the open Atlantic Occan." (Page-12, Early Man And The Occan, Dr. Thor Heyerdahl).

অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যবহারিক প্রমাণ যে পেপিরাস জলযান মূলতঃ সমুদ্রে নৌযাত্রার জন্য গড়িয়ে তোলা হইয়াছিল এবং বিশেষ ভাবে পাল মাস্তুল দড়ি দড়া প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল যাহা ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে সংগঠিত করা হইয়াছিল। দুইটি পেপিরাস জলযান ('রা-১' এবং 'রা-২' নামে) প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগরে পরীক্ষিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, উপরে বর্ণিত যে সমুদয় মিসরীয় জলযান বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া প্রাচীন বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিল সে সমুদয় জলযানের দায়িত্বে মিসরীয় লোক থাকিলেও মিসরীয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সে সমুদয় জলযান ফিনিশীয় অর্থাৎ মিসরীয় নাবিক ও বণিকগণই পরিচালনা করিত। এমনকি, মিসরের পিরামিডের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত জলযানের কাঠও ছিল ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয়, এই সত্য পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির নিম্নে উল্লেখিত ভাষ্যেও ব্যক্ত হইয়াছে।

"We know Phoenician expedition sailed on Egyptian request. There was Phoenician timber in the ships buried in the Egyptian pyramid."

উপরন্তু, প্রাচীন বাংলাদেশের সহিত প্রাচীন মিসরের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মিসরের পার্বত্য বৃষ দেবতা "আবিশ" ও বাংলাদেশের পার্বত্য দেবতা শিব যে হইতে পারিয়াছে তাহা "আবিশ" ও "শিব" শব্দ দুইটির ধ্বনিগত ঐক্য ও সাদৃশ্য হইতেও ধরা পড়ে।

মিসরের ভাষা যেহেতু আরবী সেহেতু আরবী ভাষার নিয়মে ডান দিক হইতে পড়িলে বা বলিলে যাহা হয় "আবিশ" তাহাই বাংলাভাষার নিয়মে বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়িলে বা বলিলে হয় "শিব"। যেমন—ডান দিক হইতে বামদিকে পড়িলে শ+ি+ব+আ (আবিশ); আর বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়িলে হয় শ+ি+ব+আ (শিবআ)> শিবা>শিব। এতদ্ব্যতীত, ইহাও লক্ষনীয় যে মিসরের বৃষ দেবতা আবিশ যেমন পার্বত্য দেবতা বাংলাদেশের শিবও পার্বত্য দেবতা এবং শিবের বাহনও বৃষ। সুতরাং মিসরের সহিত বাংলাদেশের প্রাচীন যোগসূত্রের কারণেই মিসরের দেবতা 'আবিশ" যে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বেদতা "শিব" হইতে পারিয়াছে তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়।

আর ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয়গণ যেহেতু কুশলী জাহাজ নির্মাতা, দক্ষ নাবিক ও বিচক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবণ ও উপনিবেশ স্থাপন প্রবণ জাতি ছিল সেহেতু ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া প্রাচীন বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রাচীন মিসরীয় জলযান পরিচালনা করিতে আসিয়া উক্ত ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরীয় নাবিক ও বণিকগণ যে বাংলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যও করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ মিলে এতদ্দেশে সিরিয়ার "আমরু" দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকার সত্যে। "বাবিরুষীয় দেবতা "আদাদ" ও সিরিয়ার আমরু একই দেবতা। তাহাদের দেবতা আমারা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বৌদ্ধযুগের পূর্বে নালন্দার বিশাল বাগানে। সেই বাগান পাঁচশত বণিক একত্রে দশ লক্ষ মুদ্রায় কিনিয়া বুদ্ধকে উপহার দেন।" (পৃষ্ঠা-৮১, বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান, দ্বিতীয় সংস্করণ)। উপরন্তু, সিরীয়গণ সূর্যের পূজারী ছিল বিধায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও যে সূর্যের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা ছাড়া, উক্ত সিরীয়গণ যে মথুরা জনপদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার নিকটবর্তী স্থানে অর্থাৎ বাংলাদেশেও তাহাদের অপর নাম "শৌরসেনই" (Saracenee) নামে বাস করিতেছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

শৌরসেনই অর্থাৎ (Saracenee) সেরাসেনী

"অন্যান্য প্রাকৃতের জন্মস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেও শৌরসেনী প্রাকৃতের আদি বা অন্ত বিশেষ সঠিকভাবে জানা যায় নাই।--- শৌরসেনী ভাষাই বা কোন স্থানের ভাষ্য তাহা বলিবার উপায় নাই।

একমাত্র গ্রীক লেখকই বহুকাল পরে শৌরসেনই এবং তাহাদের মথুরার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে শৌরসেনই—রাজাও নয়—রাজ্যও নয়—ভাষাও নয়—বিশেষ সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর মানুষ—যাহারা মথুরা জনপদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছিল। যে কালের কথা ইহাতে প্রকাশ তাহা নিশ্চিতরূপেই আলেকজাণ্ডারের গ্রীক আক্রমণের পরবর্তী যুগ। এই গ্রীক "শৌরসেনই"—দ্রাবিড় ভাষার "সেরিসাভুনী" অথবা শেরী সাভউনী শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া মনে হয়। দ্রাবিড় শেরী সাভুনী কথার অর্থ সম্প্রদায় বিশেষের মানুষ যাহারা বাহির হইতে আসিয়া—দেশের মানুষের

www.pathagar.com

সহিত মিলিত হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা-৯৩, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস। নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান)।

আরব উপদ্বীপের প্রাচীন সিরীয় ও আরব বেদুইনগণ ইতিহাসে সেরাসেন (Saracen) নামেও আখ্যায়িত হইয়াছে। সেই সেরাসেন (Saracen), গ্রীকদের উপরে উল্লেখিত শৌরসেনই, দ্রাবিড় ভাষার উপরিউক্ত শেরিসাভুনী ও এতদ্দেশে এ যাবৎকাল প্রচলিত শৌরসেনী শব্দগুলির মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সাদৃশ্য হেতু বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে উক্ত শব্দগুলি একই মূল সেরাসেন (Saracen) শব্দেরই এপিঠ ওপিঠ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ ব্যতীত ভিন্ন কিছু হইতে পারে না। কেননা, শৌরসেনী, শৌরসেনই বা শেরিসাভুনী নামে যেখানে কোন সম্প্রদায় বা ভাষার অস্তিত্বই কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে সেরাসেন (Saracen) নামে বাস্তবিক পক্ষেই একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, Saracen-n. a Syrian or Arab nomad. সিরিয়ার বা আরবের বেদুইন।"(Page-997. Samsad English-Bengali Dictionary compiled by Sailendra Biswas M. A.)

সুতরাং উক্ত শৌরসেনই, সেরিসাভুনী ও শৌরসেনী শব্দে সেরাসেন (saracen) আখ্যায়িত আরব উপদ্বীপের সিরীয় ও বেদুইন জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায়কে যেমন বুঝিতে হইবে তেমনি উক্ত মূল সেরাসেন (Saracen) শব্দ হইতেই সেরাসেনই> শৌরসেনই> শেরিসাভুনী> শৌরসেনী> শব্দগুলি যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাও বুঝিতে হইবে।

উক্ত শৌরসেনই বা শেরিসাভুনী সম্প্রদায় মথুরার নিকটবর্তী স্থানে বাস করিত বলিয়া যে কথা উপরের উদ্ধৃতির ভাষ্যে বলা হইয়াছে সে স্থান যে বাংলাদেশ তাহা মথুরার নিকটবর্তী স্থানে বাংলাদেশের অবস্থান হইতে সহজেই ধরিতে পারা যায়। মথুরার নিকটবর্তী বাংলাদেশে উক্ত সেরাসেনী সম্প্রদায় ও তাহাদের সহিত মিসরীয়রাও কিয়ৎপরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত বলিয়া উভয়ের বসবাসের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মিসর ও সিরিয়ার নৃপতিদ্বয় ২৯৮-২৭৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বিন্দুসারের রাজত্বকালে মগধের অর্থাৎ মথুরার রাজ দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়াও ইতিহাস পাঠে জানা যায়। "বিন্দুসারের রাজত্বকালে (২৯৮-২৩৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে) মিসর ও সিরিয়ার নৃপতিদ্বয় মগধের রাজ দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন।" (পৃষ্ঠা-৭, বাংলাদেশ ও ভারতের ইতিহাস, মুহম্মদ ইসহাক)। বাংলাদেশে দূত না পাঠাইয়া মগধের রাজ দরবারে দূত পাঠাইবার কারণও স্পষ্ট। ২৯৮-২৩৭ পূর্বাব্দে এবং তাহার পরেও বাংলাদেশে কোনও রাজা ছিল না। কিন্তু

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পাশ্ববর্তী দেশ মগধে যেহেতু রাজা ছিল, সেহেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য মগধের রাজদরবারে মিসর ও সিরিয়ার নৃপতিদ্বয় দূত পাঠাইয়া যে তাহাদের স্বজাতীয় ব্যবসায়ী ও অধিবাসীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও তাহার পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—

"Taranath remarks :-----In the five eastern provinces of Bhangala, odivisa and the rest, every-------merchant was king in his own house (with neighbourhood), but there was no king ruling the country" (Page-183, History of Bengal, Vol I. R. C. Mozumdar, 2nd Edition)

ইতিহাস পাঠে আরও জানা যায় যে, ২৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে শ্মশ্রু বিশিষ্ট একদল লোক চীনদেশে মসলা লইয়া গিয়াছিল। ধারণা করা হয় যে তাহারা বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরিয়াই তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমন করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল সম্ভবতঃ ফিনিশীয় অর্থাৎ সিরিয় বণিক ও নাবিক সম্প্রদায়।

উপরে বর্ণিত সত্য সমূহ হইতে অধিকতরভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত শৌরসেনই, শেরিসাভুনী ও শৌরসেনী আখ্যায়িত সম্প্রদায় ও তাহাদের ভাষা প্রকৃতপক্ষেই যথাক্রমে সেরাসেন (Saracen) দিগের অর্থাৎ সিরীয়দিগের আরবীয় সম্প্রদায় ও তাহাদের আরবী ভাষা ছিল। সেই সেরাসেনী আরবী ভাষা হইতেই কালক্রমে উপরিউক্ত শৌরসেনী ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সহজেই বোধগম্য হয়।

উক্ত সেরাসেনী (Saracen) অর্থাৎ সিরীয় আরবীয় সম্প্রদায় যে কালক্রমে বাংলাদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নিম্নবর্তী উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

"Sir R. C. Temples' assertion that at this period (600-650 A. D) Tibetan rule must have been spread southwards far in to Bengal. In 702, Nepal and Central India revolted against Tibet---- For during this period 713-14 an embassy from central India came to China to seek help against the Tibetans and the Arabs.

Central India, a term used by the Chinese to designate Bihar---- as distinguished from eastern India comprising

www.pathagar.com

Bengal and Assam." (Page-93, History of Bengal Vol. I. R. C. Mozumdar, 2nd Edition).

অর্থাৎ স্যার আর. সি. টেম্পলের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সময়ে (৬০০-৬৫০ খৃষ্টাব্দে) তিব্বতীয় শাসন দক্ষিণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও নিশ্চয়ই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭০২ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও কেন্দ্রীয় ভারত তিব্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল...............এই কারণে এই সময়ে ৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ও আরবীয়দের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিতে কেন্দ্রীয় ভারত হইতে এক দূত চীনদেশে আগমন করিয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ভারত একটি শব্দ, যাহা বাংলা ও আসাম লইয়া গঠিত পূর্ব ভারত হইতে বিহার নামের পার্থক্য বুঝাইতে চীনদেশবাসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত।

সে যাহা হউক, সিরীয় বণিক ও নাবিকগণ যে প্রাচীনকালে সত্যই এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে বঙ্গদেশ সংলগ্ন আসাম-এর আসাম নাম শব্দে। প্রাচীনকালে সিরিয়ার আর এক নাম ছিল, আল-সাম। [Syria-Siam) Arabic-ELSHAM;—Page 1274, Funk and wagnals, New International Dictionary of the English language]

উক্ত "আল সাম" শব্দ হইতেই আসাম নাম শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেমন—আল সাম>আসসাম>আসাম। আরবী ভাষার নিয়মে কোন কোনও শব্দের মধ্যস্থলে "স"-এর পূর্বে "ল" থাকিলে "ল" লোপ পাইয়া "ল"-এর পরবর্তী "স"-এর দ্বিত্ব হয়। আল সাম নাম শব্দটিতেও "ল"-এর পরবর্তী "স"-এর এই দ্বিত্ব আসাম নাম শব্দটির ইংরেজী লিখনেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—আলসাম/আসসাম (Assam)> আসাম। সুতরাং সিরিয়ার প্রাচীন নাম আলসাম হইতেই আসাম নাম শব্দটি যে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহা হইতে অতঃপর সহজেই ধারণা করিতে পারা যায় যে উপরে উল্লেখিত সিরীয় বণিক ও নাবিকগণ প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর জল পথে আসামে গিয়া এক সময়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা তাহাদের স্বদেশের "আল সাম" নামেই তাহাদের উক্ত উপনিবেশের নামকরণ করিয়াছিল, আলসাম। আর সেই আল সাম হইতেই অতঃপর আসাম নাম শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলিবে—"নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় আদি ভূমির দেশ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নামে নূতন দেশের নাম দেওয়ার রীতি বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

www.pathagar.com

এখনো অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।" (বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার, মাসিক নব্য ভারত, কার্তিক, ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৩২)।

পুরাতন পুথিপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে সমুদ্রে বাতিঘর (Light house) নির্মিত হইয়াছিলো। সেই সকল বাতিঘর সমুদ্র পথে অনেক দূরে বাণিজ্য করিতে যাওয়া সকল সমুদ্র পোতকে পথ দেখাইত। দূর সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত নাবিকদের মধ্যে আরবের সিরীয় ও কুশাইট (অর্থাৎ কুশাইরী> কুশাইর> কুশাইট) জাতীয় নাবিকরাই বাতিঘর বিষয়ে সর্বপেক্ষা বেশী চিন্তা ভাবনা করিত। এই কুরাশাইট জাতি একটি আরবীয় জাতি। আরবীতে ইহাদের নাম কুশাইর। এই কুশাইরী জাতি বর্তমানেও আরব দেশে রহিয়াছে বলিয়া ঢাকার লালবাগের ভাট মসজিদের পেশ ইমাম ও বড় কাটারা মাদ্রাসার মোদার্রেস আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ নুরুদ্দিন ফতেহপুরী সাহেব আমাকে জানাইয়াছেন। আরবের উক্ত কুশাইট অর্থাৎ কুশাইর জাতি যে প্রাচীনকালে সিরিয়ার নাবিকদের সহিত বঙ্গদেশেও আগমন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ মিলে ঢাকার জিনজিরার নিকটস্থ একটি গ্রামের কুশাইর নাম শব্দে এবং তথায় একটি কবরের শিলা লেখে মৃত ব্যক্তির নামের সহিত কুশাইরী নাম শব্দের অস্তিত্বে, যাহা উক্ত মাওলানা সাহেব আমাকে জানাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, প্রাচীনকালে আসামেও যে উক্ত কুশাইরীদের পদার্পণ ঘটিয়াছিল তাহারও প্রমাণ মিলে প্রাচীন আসামে একটি জাতির কুশারী নাম শব্দে। আসামের সেই কুশারী যে উপরিউক্ত কুশাইর শব্দেরই অভিন্ন রূপ তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও আরবের উক্ত কুশাইর ওরফে এদ্দেশের কুশারীদের আসামে অবস্থানের পরিপূরক সাক্ষ্য-প্রত্যক্ষগোচর হয়—

"Swurgee deo after consulting the council issued orders to the Gohaign to have a personal interview with two of the Kosaree nobles and to enquire minutely respecting the real motive of their visit" (Page-68, An Account of Assam, Dr. John Peter Wade, F. R. A. S-1800).

An extent of wilds divided the countries of Kossari and Zaintapoor" (Page-70, Ibid).

"His men had a skirmish with three hundred Cossarees at the foot of the hill,---- the Cossarees were regaling themselves on the cows and baffaloes which they killed, when they were surprised by the Brrowahs detachment. (Page-101, Ibid)

www.pathagar.com

"Four merchants from Cossarees were seized in their way to Dimmorooya. They declared their ignorance of the road by land, but offered to show the road by water to Tintillikora Sokey in the Cossaree country" (Page-107, Ibid)

উপরিউক্ত সিরীয় ও কুশাইট ওরফে কুশাইরী জাতিদ্বয়ের সহিত সিরিয়ার সংলগ্ন প্রাচীন ইসরাইলী বণিকরাও যে আসামে পদার্পণ করেছিল তাহারও পরিপূরক সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় আসামের প্রাচীন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ফোকানদের সহিত প্রাচীন ইসরাইলের বিচারকদের মিলে—

"The title of Fokun does not seem to have any connection with the language of Hindoostan----In the histories of the country the title does not appear to have existed---- but its probable---- origin may be deemed a proof of its antiquity.

In some respects the Fokuns resemble the Judges of Israel. They not only command the armies and minister justice of the kingdom, but have also a principal share in the public councils.

The title and office are not hereditary, but the Fokuns must be chosen from four noble families, the descendents of the companions and chiefs, who accompanied Sookapah in his conquest of Assam. (Military Fokuns, Page-XIV, An Account of Assam, Dr. John Peter Wade, F. R. A. S. 1800)

প্রাচীনকালে সিরীয়গণ যে প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন নদী বহুল প্রাচীন বাংলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করিয়াছিল তাহা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ভাষ্য হইতেও সহজেই ধারণা করিতে পারা যাইবে—The Phoenicians (i.e. Syrians) founded colonies. At many points---- these sea going Phoenician traders started fishing and trading settlements, ---- Although phoenicia (i. e. Syria) ceased to be an independent state its merchants contiuned their sea trade for centuries." (Page-74, The history of our world, Teachers Edition, Edited by Arthur E. R. Boak and others).

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত ফিনিশীয় শব্দটি সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য উল্লেখ্য যে, রোমক যুগের পূর্ববর্তী ভূমধ্যসাগরের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানের অর্থাৎ সিরিয়া ও তৎসংলগ্ন স্থানের অধিবাসীদিগকে বুঝাইতে রোমকগণ ফিনিশীয় শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত করে।

"Thanks to the Romans we have simply inherited the word" Phoenician as a convenient sack in to which we put anything sailing from the inner mediterranean before Roman times." (Page-244, The R. A. Expedition, Dr. Thor Heyerdahl)

সুতরাং ফিনিশিয়া বলিতে, সোজা কথায় সিরিয়া অর্থাৎ বৃহত্তর সিরিয়াকেই যে বুঝিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

সে যাহা হউক, বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল---- এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী।" আর্যোপনিবেশের পূর্বে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আরবের প্রাচীন সিরীয় জাতিই যে ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহা উপরে বর্ণিত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তারকারী আরবের উক্ত প্রাচীন সিরীয় জাতিই যে বঙ্গ মগধের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রাচীনতম আদিম অধিবাসী ছিল তাহা অতঃপর নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অধিকার বিস্তারকারী উপরে বর্ণিত সিরীয় নাবিক ও বণিকদিগকে প্রাচীন আরব জাতি বলিয়া উল্লেখ না করিয়া প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কেননা, প্রাচীন কোন দ্রাবিড় জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। এতদসত্ত্বেও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরব জাতির উল্লেখ না করিয়া তদস্থলে দ্রাবিড় জাতির উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অন্তর্নিহিত আরবীয় ইসলাম বিদ্বেষের কারণে ঘোরতর আরব বিদ্বেষেরই প্রকাশ ঘটাইয়া আরব জাতি হইতে ভিন্ন দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রকৃত ইতিহাসেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসকেই বিকৃত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

www.pathagar.com

প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠান ভূমিও ছিল আরবের দাহরান, বাহরাইন ও কুয়েত উপসাগরের ফাইলাকা দ্বীপে। এই দ্রাবিড় জাতি যে ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করে নাই এবং সমুদ্র পথেও ভারতে আগমন করে নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও স্পষ্ট হইবে—

"বর্তমানে ইহা এক প্রকার নির্ধারিত যে দ্রাবিড়গণ মাকরানের পথে স্থল পথেই সুমেরিয়া হইতে ভারতে আসেন। তাহারা, সিন্ধু হইতে ক্রমে ক্রমে সিন্ধুর অববাহিকা ধরিয়া কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়েন। কিন্তু ইহাই তাহাদের একমাত্র আবাস স্থান নয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন আর্য আক্রমণ সঙ্গীন হইয়া উঠিলে অনার্য দ্রাবিড়দিগকে ক্রমে ক্রমে সিন্ধুর অববাহিকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে ও পূর্বে বাস স্থাপন করিতে হয়।" (পৃষ্ঠা-২৪, ২৫, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান)। অতএব, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহারাই অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইতে পারে না। বরং প্রাচীন সিরীয় আরব জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী যাহা ইতঃপূর্বে বহু বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

জিগুরাত নামে প্রাচীন সুমেরীয় সিঁড়ি বিশিষ্ট মন্দির পিরামিড

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব বর্ণিত সিরীয়দের পরে (Sumerian ziggurat, a stepped temple Pyramid) জিগুরাত নামে প্রাচীন সুমেরীয় সিঁড়ি বিশিষ্ট মন্দির পিরামিড-এর বিষয়ও এতদস্থলে আলোচ্য। কেননা, ৮ই মার্চ, ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব, পত্রিকায় ছবিসহ 'নওদার শাহ বুরুজ' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে জনাব মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, "বলা বাহুল্য, স্থানীয় বাসিন্দারা একে নওদার শাহ বুরুজ বলে জানে। এবং বরুজ কোন সাধারণ ইমারত নয়—ইংরেজীতে একে বলে ওয়াচ টাওয়ার (Watch Tower)। এটি রাজকীয় ব্যাপার, স্থানীয় রোহনপুর রেল স্টেশনের মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে নওদা একটি পুরাতন স্থান। বহতা নদী মহানন্দা-পুনর্ভবার মিলন মোহনায় উচ্চতায় ৭৪ ফুট, পরিধি ৮০০ ফুট। নীচে ৫/৬ ফুট মাটির স্তর, পরে পাকা মজবুত ছাদ। অনুমিত হয়, অতীতে ২/৩ তলা ভারী ইমারত ছিল। ধ্বংস স্তুপ হলেও এখনও পিরামিডের মত দেখতে। উপরে ৩০ ফুট উঁচু সম্পূর্ণ খাঁড়া মন্দিরের মত স্থান রয়েছে।"

www.pathagar.com

জনাব আবু তালিব সাহেবের এই বিবরণ "জিগুরাত নামে প্রাচীন সুমেরীয় সিঁড়ি বিশিষ্ট মন্দির পিরামিডের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "---enclosing a rectangular temple court---- It was compact, stepped and sun oriented, with lateral stairways and a temple on top" (Page-196, 211, The Tigris Expedition, Thor Heyerdahl)

এমতাবস্থায়, নওদার উপরিউক্ত বুরুজ যদি প্রাচীন সুমেরীয় জিগুরাত অর্থাৎ সিঁড়ি বিশিষ্ট মন্দির পিরামিডই হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রাচীন সুমেরীয়গণ যে প্রাচীন বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিল এবং বসবাসও করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

উপরন্তু, এতদ্দেশে পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ বিহার বলিয়া এ যাবৎকাল পরিচিত নিদর্শনগুলিও দেখিতে যেহেতু অনেকটা উপরিউক্ত সুমেরীয় জিগুরাতের মত সেহেতু ঐ সমুদয় বিহার হয়ত প্রথমে উক্ত সুমেরীয় জিগুরাতই ছিল পরে বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয় বলিয়াও ধারণা করা যাইতে পারে। ১৯৭৩-এর ১২ মে হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস সম্মেলনে আগত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম বলিয়াছেন "পাহাড়পুর ময়নামতিতে বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এখানকার বৌদ্ধরা অন্যান্য অঞ্চল থেকে একটু আলাদা ছিল। বস্তুত এখানে এক পিকুলিয়ার ফর্ম অব বুড্ডিজম (Peculiar form of Buddhism) নজরে পড়ে। এই সব বৌদ্ধদের অনেকে আবার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।" (পৃষ্ঠা-১১, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৫শে মে. ১৯৭৩, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

অধ্যাপক ব্যাসাম-এর এই মন্তব্যে ধারণা করা যায় যে বাংলাদেশে যখন প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম হইতে আলাদা রকমের বৌদ্ধ ধর্ম ছিল তখন পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধবিহারগুলিও হয়ত প্রথমে বৌদ্ধ বিহার ছিল না, প্রাচীন সুমেরীয় জিগুরাতই হয়ত ছিল। বিশেষতঃ পাহাড়পুরের পূর্ববর্তী নাম সোমপুর-এর সহিত সুমেরীয় নামের ঐক্য ও সাদৃশ্যেও এমন ধারণা করা যায়। যেমন, সুমের+উর (সুমের-এর উর বন্দরের নামানুসারে)> সোমউর> সোমপুর। এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশের বহু স্থানের নামের সহিত 'পুর' শব্দের ব্যবহার সুমেরের 'উর' শব্দের কথা যেমন স্মরণ করাইয়া দেয় তেমনি এই দেশে প্রাচীন সুমেরীয়দের অবস্থিতিও নির্দেশ করে। সুতরাং উপরিউক্ত বৌদ্ধ বিহার বলিয়া পরিচিত নিদর্শন সমূহ প্রথমে হয়ত প্রাচীন সুমেরীয় জিগুরাতই ছিল পরে বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হইয়াছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশ ও ইহার নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত বৌদ্ধ জগতের আর কোথাও যখন উক্ত রূপ বিহার দৃষ্ট

www.pathagar.com

হয় না, তখন এমন ধারণা একেবারেই অমূলক বলিয়া বাতিল করা যায় কিনা, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সে যাহা হউক, সুমেরীয়দের প্রকৃত জাতিগত পরিচয় সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক Smith বলিয়াছেন—

Physical anthropologists seem united in treating the extant skulls of early Sumerians as beeing close to modern Arab type.

"অর্থাৎ শারীরিক নর-তত্ত্ববিদগণ প্রাচীন সুমেরীয়দের অদ্যাবধি বিদ্যমান মাথার খুলি আধুনিক আরব জাতির সহিত অত্যন্ত নিকটবর্তী অর্থাৎ এক জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে ঐক্যমত পোষণ করিঘা থাকেন।" সুতরাং প্রাচীন সুমেরীয়দিগকে প্রকৃতপক্ষে আরব জাতীয় মনুষ্য বলিয়াই সনাক্ত করিতে হইবে।

মহেঞ্জোদারো

তৃতীয়তঃ মহেঞ্জোদারো (২৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)

মহেঞ্জোদারো নাম শব্দটির মধ্যে আরবের কিন্দ সম্প্রদায়ের কিন্দ নাম শব্দটির অবস্থানই নির্দেশ করে যে উক্ত কিন্দ সম্প্রদায়ই সিন্ধুতে মহেঞ্জোদারোর পত্তন করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, যেমন—মা কিন্দ উরুক (আরবী শব্দ) (অর্থাৎ কিন্দদের উরুক নামের বন্দর)> মা কিন্দ উরু> মাখিন্দ উরু> মাহিন্দ আরু> মাহেন্দজারো (পৃষ্ঠা-৭৬, বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)> মহেঞ্জোদারু।

উক্ত কিন্দ সম্প্রদায় মূলতঃ সিরিয়া ও আরবের মধ্যস্থিত কিন্দ নামক একটি স্থানের অধিবাসী ছিল। তাহারা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হইয়া মেসোপটেমিয়ার সুমেরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাহাদের রাজা (Sargon, 2300 B.C.) সারগণের সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বপ্রথম মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করে তথা ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কিন্দ সম্প্রদায়ের নামে মা কিন্দ উরু অর্থাৎ মহেঞ্জোদারোরও পত্তন করে। সুতরাং মহেঞ্জোদারোর সময়কাল ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দই ধরিতে হইবে। ইহার পূর্বে হইতে পারে না। নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্যও এই সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—The early Sumerians who had trade and contacts with India, notably with Indus valley civilization which from second millenium B. C. flourished for several centuries along the Banks of the river Indus, (Page-364, 365,

www.pathagar.com

Early man and the ocean, Thor Heyerdahl). অর্থাৎ প্রাচীন সুমেরীয়দের ভারতের সহিত বাণিজ্যের, বিশেষ করিয়া দুই হাজার খৃষ্ট পূর্বকাল হইতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সিন্ধু নদীর তীর ভূমির সংযোগ ছিল। উপরের এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে দুই হাজার খৃষ্ট পূর্বকালে ভারতের সহিত বাণিজ্যের ও সিন্ধু নদীর তীরভূমির প্রাচীন সুমেরীয়দের যে সংযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা সুমেরীয়দের না হইয়া, হইবে আক্কাদীয়দের। কেননা, ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বকালে আক্কাদীয় অর্থাৎ কিন্দ সম্প্রদায়ের রাজা (Sargon 2300 B. C.) সারগণই প্রাচীন সুমেরীয়দের সুমারে অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় আক্কাদীয় অর্থাৎ কিন্দ সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার করিয়া সর্বপ্রথম যেমন মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তেমনি মেসোপটেমিয়ার বাহিরে সিন্দুতে মাকিন্দ উরু অর্থাৎ মহেঞ্জোদারোরও পত্তন করিয়া একদিকে তাহার নব প্রতিষ্ঠিত মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করিয়া অপরদিকে বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটাইয়াছিলেন। "Bibly had found reference to Makan in Mesopotamian inscriptions dating from the days of Sargon of Akkad, about 2300 B. C. when he boasted of ships from Makan tying up alongside his quay together with ships from Dilmun and Meluha." (Page-214, The Tigris expedition, Thor Heyerdahl)

আলোচ্য আক্কাদীয় (Akkadian) শব্দটির মূল শব্দ কিন্দ, সিরিয়া ও আরবের মধ্যস্থিত একটি স্থানের নাম, যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই কিন্দ শব্দ হইতেই আক্কাদীয় (Akkadian) নাম শব্দটি গঠিত হইয়াছে। যেমন—(আরবীতে) আলকিন্দ> আল কিন্দিয়া> আক্কীনদিয়া> আক্কীদিয়া> আক্কাদিয়া (Akkadian ইংরেজীতে) এই আক্কাদীয়দের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—

"Akkadians, Amorites, Assyrians and chaldeans all came from the Syrian Arabian desert." (Page-63, The history of our world, Teachers, Edition, Edited by Arthur E. R. Boak & others)

"..........The Akkadians reached the central part of the valley and established a strong dynasty at agade near Kish, whence they set out to conquer sumer----They spoke semitic dialect akin" (Page-25, The Legacy of Egypt, Editor, S. R. K. Glanville)

www.pathagar.com

উপরিউক্ত আক্কাদীয়দের মূল 'কিন্দ' গোত্রের প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বকালে আক্কাদীয় রাজা সারগনের (Sargon, 2300 B. C.) শাসনামলে যেমন দৃষ্ট হইয়াছিল তেমনি খৃষ্ট জন্মের পরে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল— In the second half of the fifth century the powerful tribe of Kinda—having its seat in central Arabia—succeded to a kind of overlordship over other tribes." (Page-10, The Arab civilization, translated in English by S Khuda Bakhsh, M. A. B. L. Bar-at law from Die Kultur der Araber (in German) by Prof. Goseph Hell)

অতএব, উক্ত আরবীয় কিন্দ সম্প্রদায়ের বংশধর আক্কদীয় রাজা সারগণ (Sargon) ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে নিজ কিন্দ সম্প্রদায়ের নামেই যে সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোর পত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, উল্লেখ্য যে মহেঞ্জোদারোর অবস্থান রহিয়াছে যে সিন্ধুতে সেই 'সিন্ধু' নাম শব্দটিও উক্ত 'কিন্দ' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেমন—কিন্দ> কিন্দু> সিন্ধু> হিন্দু। "মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার প্রাথমিক বিভাগ হল 'কেন্তম' ও 'শতম' বিভাগ, মূল ভাষার তালব্য 'ক' ধ্বনির উচ্চারণ পার্থক্য থেকেই এই বিভাগের সৃষ্টি।--- যেসব ভাষায় মূল ভাষার 'ক' ধ্বনি রক্ষিত সে সব ভাষাকে কেন্তম আর যে সব ভাষায় তা 'স' ধ্বনিতে পরিবর্তিত সেগুলোকে 'শতম' বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রভুক্ত আর্যভাষা সমূহ শতম শাখাভুক্ত।" (পৃষ্ঠা-৩২৩, ভাষা তত্ত্ব, রফিকুল ইসলাম)। সুতরাং মূল কিন্দ শব্দের 'ক' শব্দটি ভারতীয় ভাষার রীতিতে 'স'-তে রূপান্তরিত হইয়া যে 'সিন্দ' (সিন্ধু) শব্দে পরিণত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

উক্ত 'কিন্দ' শব্দের অস্তিত্ব বাংলাদেশের নেত্রকোণার একটি স্থানের 'কেন্দুয়া' নামেও পরিলক্ষিত হয় বিধায় উক্ত 'কিন্দ' সম্প্রদায় যে বাংলাদেশেও আগমন করিয়া উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল তাহাও ধারণা করা যায়। উক্ত 'কেন্দুয়া' নামক স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনেও এই সত্যের পরিপূরক সমর্থন মিলে "নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার রোয়াইল বাড়ীতে প্রাচীন কীর্তির নির্দশন পাওয়া গেছে। --- রয়েছে একটি মাটির দুর্গ। দুর্গ প্রাচীরের মাঝে মাঝে মাটির নীচে পাওয়া ইটের আকৃতি ও কাঁদার গাঁথুনি দেখে ইহাকে মুসলিম পূর্ববর্তী যুগের নিদর্শন বলে মনে হয়। --- দুর্গের যে ভবনটি পাওয়া গেছে, তা জঙ্গলাকীর্ণ বুরুজ ঢিবি নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। এ ছাড়াও পুরো জায়গাটিতে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে বহুবিধ প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ঃ এখানে

www.pathagar.com

ব্যাপক অনুসন্ধান ও খনন কাজ চালালে প্রাচীন ইতিহাসের আরো অনেক নির্দশন পাওয়া যাবে।" সংবাদদাতা (দৈনিক ইত্তেফাক)।

উপরন্তু "মহেঞ্জোদারোতে নরম কাদার উপরে সিলমোহর দেওয়া যেমন চাকতি পাওয়া গেছে তেমনি চাকতি পাহাড়পুর হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। (পৃষ্ঠা-৮২, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান)।

সঙ্গতকারণেই, মহেঞ্জোদারোর স্রষ্টা উক্ত কিন্দ সম্প্রদায় যে বাংলাদেশেও আগমন করিয়া বসবাস করিয়াছিল এবং তাহারা যে আরবী ভাষী ছিল তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়।

হারাপ্পা> হরপ্পা

চতুর্থতঃ হারাপ্পা (১৭৯১-১৭৪৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)

হারাপ্পা নাম শব্দটির মধ্যে বেবিলনের ১৭৯১-১৯৪৯ খৃষ্ট পূর্বকালের রাজা হাম্মুরাব্বির নাম শব্দটির অবস্থানই নির্দেশ করে যে রাজা হাম্মুরাব্বির ১৭৯১-১৭৪৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দের রাজত্বকালেই হারাপ্পার পত্তন হইয়াছিল তাহা না হইলে হারাপ্পা নামের সহিত হাম্মুরাব্বির নামের ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে কেন? হারাপ্পা নাম শব্দটির মধ্যে হাম্মুরাব্বির নাম শব্দটির অবস্থান যে রহিয়াছে তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই ধরা পড়িবে। যেমন—হাম্মুরাব্বি> হাম্মুরাপ্পি (Hamurapi, Page-67, The history of our world, Editor, Arthur E. R. Boak & others)> হাম্মুরাপ্পা> হামুরাপ্পা (হাম+উ+রাপ্পা)> হাউরাপ্পা (হামউরাপ্পা শব্দটির 'উ' শব্দের পূর্ববর্তী 'ম' শব্দটি লোপ পাইয়া। [উল্লেখ্য যে "অপভ্রংশের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যঃ (২) 'উ'-এর পূর্বে ম-এর লোপ, যথা—যমুনা (য+ম+উ+না) যউনা।" (পৃষ্ঠা-৩৫, প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য বীথিকা, শ্রী সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম সংস্করন)।> হারাপ্পা (হরপ্পা)।]

সুতরাং ১৭৯১-১৭৪৯ খৃষ্ট পূর্বকালে বেবিলনের রাজা হাম্মুরাপ্পি যে বেবিলনের বাহিরে এই উপমহাদেশে হারাপ্পা বন্দরটি পত্তন করিয়া তাহার রাজ্যের পরিধিবৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও স্পষ্ট হইবে—"Amorites form the Syrian desert gradually overran Babylon under King Hammurapi--- they made Babylon the capital of an empire stretching from the Persian Gulf to the mdediterranean." (Page- 36, The history of our world, Teachers, Edition, Editors—Arthur E. R. Boak & others)

www.pathagar.com

হারাপ্পার প্রতিষ্ঠাতা রাজা হাম্মুরাপ্পির নিম্নে উদ্ধৃত ঘোষণায়ও এই সত্য অধিকতরভাবে প্রতিপন্ন হয়—

"Hammurabi marched up stream and destroyed them one after the other, before turning west to march across subartu to the Amaanus mountains, proudly he claimed the title "King of the four quarters of the world." (Page-29, The Legacy of Egypt, Editor, S. R. K.-Glanville)

উপরের এই ইংরেজী উদ্ধৃতির ভাষ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে হাম্মুরাপ্পি গৌরবের সহিত পৃথিবীর চতুর্দিকের রাজা উপাধি দাবী করিতেন। হাম্মুরাপ্পির এই দাবীও নির্দেশ করে যে বেবিলনের বাহিরে হারাপ্পার পত্তন প্রকৃতপক্ষে হাম্মুরাপ্পিই করিয়াছিলেন যাহার প্রমাণ হারাপ্পা নাম শব্দেও রহিয়াছে বলিয়া ইতঃপূর্বেই দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ১৭৯১-১৭৪৯ খৃষ্টপূর্ব কালের মধ্যে বেবিলনের রাজা হাম্মুরাপ্পির শাসনামলেই হারাপ্পার পত্তন হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এতদ্ব্যতীত, হাম্মুরাপ্পা হইতে হাউরাপ্পা যেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে তেমনি উক্ত হাউরাপ্পা হইতে> হাউরা> হাওরা (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে) নাম শব্দও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে বিধায় বঙ্গদেশেও যে হারাপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯তে সাপ্তাহিক “ছুটি” পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠায় “হাওড়ায় হরপ্পা” শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও উক্ত সত্যের পরিপূরক নির্দশন মিলে। উপরন্তু হারাপ্পার সভ্যতা যে বঙ্গদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নিম্নবর্তী ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—

“বর্দ্ধমান জেলার রাজার ঢিবি অঞ্চলে সম্প্রতি হারাপ্পার অনুরূপ--- সভ্যতার নির্দশনও পাওয়া গিয়াছে।” (পৃষ্ঠা-৯৮, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান)।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর নিম্নোক্ত ভাষ্যেও উপরিউক্ত সত্যের সমর্থন মিলে—

“সিন্ধু প্রদেশের মোহেঞ্জোদারো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পাতে যে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে তাকেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম রূপ বলা যায়।--- এ সভ্যতা যে গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত ভুখণ্ডে বিস্তৃত ছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।” (পৃষ্ঠা-৬৮, ভারত সন্ধানে, ১ম সংস্করণ)।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার রূপ বলিয়া স্বীকৃত মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সভ্যতা তাই মেসোপটেমিয়ার পরবর্তী সভ্যতাই শুধু নয়,

www.pathagar.com

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারই দ্বিতীয় সংস্করণ। অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা হইতে ভিন্ন কোন সভ্যতা নয়। ইহাতে অগৌরবেরও কিছু নাই। কেননা, পৃথিবীর সকল দেশের সভ্যতা একই সময়ে একই সঙ্গে সৃষ্ট হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন—"ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানব জাতির পরিবর্তন আরব্ধ হইয়াছে; পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে যুগ বিপ্লব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানব এখনও সমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি জগতে এমন মনুষ্য আছে, যাহারা ধাতুর ব্যবহার জানে না।" (পৃষ্ঠা-৫, ৬, বাঙ্গালার ইতিহাস)। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্য বোধগম্য হইবে—"The two amazing civilizations (Mesopotamian and Egyptian civilizations) suddenly arose side by side in the middle East about 3000 B. C.--- we are on firm historic ground when we admit that it was from the vast grain fields of Egypt and sumer (i.c. Mesopotamia) that all the arts of civilization spread in antiquty." (Page-324, The Tigris Expedition, Thor Heyerdahl)

সে যাহা হউক, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছেন, "মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হইতে নৃ-তত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি---আর্য জাতি সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-১৩, ১৪) এই সত্যের কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। উপরে বর্ণিত আলোচনায় উল্লেখিত বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়াছিল যেহেতু প্রাচীনতম সভ্য জাতি সিরিয়া, মিসর, সুমের ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন বণিক ও নাবিকগণ সেহেতু বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসীগণও একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী হইতে পারিয়াছিল বলিয়া সহজেই বোধগম্য হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৭

উপজাতিরা বাংলাদেশের মূল অধিবাসী আদিবাসী নহে

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকগুলি উপজাতির বসতি রহিয়াছে ইহা আমরা সকলেই জানি। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে ইহারা হয়ত বাংলাদেশের মূল আদিম অধিবাসী। তাই ইহাদিগকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের আদিবাসী বলিয়াও ভুল করা হইয়া থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা যে বাংলাদেশের মূল আদিবাসী নহে তাহা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদিম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের সেন্দুজ উপজাতিদের নিম্ন বর্ণিত ঐতিহাসিক সত্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগুলির মধ্যে সেন্দুজরাই সর্বাপেক্ষা আদিম বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে। চীন দেশের ব্লু-মাউন্ট অঞ্চল ছিল সেন্দুজদিগের আদিবাস। প্রাচীন সুমের-এর কিউনিফর্ম (Cuneiform) এবং প্রাচীন মিসরের হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) লিপির মতই সেন্দুজদিগের চিত্র লিপি পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

আদিম অবস্থায় মানব গোষ্ঠী নির্দিষ্ট কোন এক স্থানে বাস করিত না। আদিম মানব গোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদের রক্তের ধারা বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর রক্তে কিভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, তাহাদের ভাষাগত পরিচয়ও অনুসন্ধানযোগ্য।"

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদিম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উপরিউক্ত সেন্দুজ উপজাতিরাই যেহেতু বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম অর্থাৎ মূল অধিবাসী নহে, চীনের ব্লু-মাউন্ট অঞ্চল হইতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়া কালক্রমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছে, সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল উপজাতিরাও যে অন্যান্য কোন কোন দেশ হইতে সেন্দুজদিগের পরে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া স্থায়ী হইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছে ইহা সহজেই ধারণা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মারমা ও রাখাইন সম্প্রদায়ের কথা বলা যাইতে পারে। ইংরেজ নৃ-তত্ত্ববিদ পিয়ারে ব্যাসেইনেইট (Prof. Pierre Bessaignet) তাঁহার "ট্রাইবস অব চিটাগং হিল ট্র্যাকটস" (Tribes of

www.pathagar.com

Chittagong Hill Tracts) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে মারমা ও রাখাইনরা বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছে। মারমারা বার্মার দক্ষিণ অঞ্চলের পেগু হইতে আসিয়াছে। আর রাখাইনরা আসিয়াছে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আরাকান হইতে।

এতদ্ব্যতীত, ১৭৩৭ সালে দলপতি শেরমস্ত খাঁর নেতৃত্বে চাকমাদের অল্প সংখ্যক লোক সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাঙ্গুনীয়ায় আসিয়া বসবাস শুরু করে। তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা পরে ইংরেজ শাসনামলে উত্তর আরাকান হইতে পলাইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। এতদঞ্চলের আদি বা মূল বাসিন্দা তাহারা কেহই নহে। তাই এতদঞ্চল এই বহিরাগত লোকদিগের কাহারও মূল জাতীয় আবাস ভূমি হইতে পারে না।

এই অঞ্চলে মূল নহে, তবে প্রাচীন বাসিন্দা বলিতে হইলে অল্প সংখ্যক কুকি, ত্রিপুরা, মগ ও বাঙালীদিগকেই বলিতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্য ও আরাকানের দখল অভিযানের সঙ্গী হইয়াই ত্রিপুরা ও মগ বাসিন্দারা এতদঞ্চলে আসিয়াছিল। বহিরাগমনের মাধ্যমে পরে ইংরেজ আমলে তাহাদের স্বজাতীয় লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চল ইংরেজ আমলে আরাকানী উদ্বাস্তুদের দ্বারা ঘনভাবে অধ্যুষিত হয়। কিন্তু তাহারা আর ফিরিয়া না গিয়া স্থায়ীভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকিয়া যায়।

অপর দিকে, বাংলাদেশের গারো উপজাতিদের কথায় বলিতে হয় যে, ভারতের গারো পাহাড় অঞ্চলেই রহিয়াছে গারোদের মূল জাতীয় অঞ্চল বা আবাস ভূমি। ভারতের গারো পাহাড়ের উক্ত গারোদেরই একটি সম্প্রসারিত অংশেরই বাস রহিয়াছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের এই গারোরা বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠীও বটে। তাহারা সংখ্যালঘু অবাঙালী একটি সম্প্রদায় মাত্র। রঙ ও গঠনের দিক দিয়া তাহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহা হইতেও সুস্পষ্টভাবে ধারণা করা যায় যে গারোরা একটি বহিরাগত জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশের মূল অধিবাসী নহে।

আরও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও যে সকল উপজাতি রহিয়াছে তাহারাও যে ভারতের মূল অর্থাৎ আদিম অধিবাসী নহে তাহা ভারতের এককালীন মন্ত্রী মরহুম হুমায়ূন কবীরের নিম্ন বর্ণিত উক্তিতেও প্রণিধানযোগ্য—"New Delhi, sept. 9, 1962-Prof. Humayun Kabir union minister for scientific Research and cultural affairs said in Hyderabad that------it was very difficult to say who were the indigeneous people of India. Even adibasis might not

www.pathagar.com

be the indigeneous people." (The Pakistan observer, Sept. 20, 1962, Dacca)

সে যাহা হউক, উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মুরং, মনীপুরী ইত্যাদি উপজাতিরা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়া পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশে বসবাস করিয়া বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছে, এই মাত্র বলিতে পারা যায়। এমতাবস্থায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদিগকে বাংলাদেশের মূল অর্থাৎ আদি অধিবাসী বা আদিবাসী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠীরা যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম মূল আদিবাসী না হইয়া বরং বাংলাদেশের বাহিরের কোন কোন দেশের বাসিন্দা ছিল এবং পরে সেই সকল দেশ হইতে উড়িয়া আসিয়া বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বুকে জুড়িয়া বসিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে সুনিশ্চিতভাবেই ধারণা করা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও এই সত্য প্রতিপন্ন হইবে—"The Hill Men—Nothing could be farther from the truth than to picture the inhabitants of the Chittagong Hill tracts as "primitives" if one means by that term survivors of some pre-historic age in their pristine purity. They have not remained altogether cut off from civilization. The very fact that most of them are Buddhists and have a family structure similar to the Hindu is enough prove that they have been for long under the influence of more advanced societies. The census of 1951 gives the following distribution of population :

1.	Tribal population	- 287,688
2.	Tribes	- 261,538
3.	Bengalis	- 26,150

The tribes include several groups of varying importance, as given bellow:

Bon	977
Chakma	124.762
Khyan	1.300
Komi	1.951

www.pathagar.com

Kuki	1.972
Lushai	1.369
Mogh	65.889
Morung (Mro)	16.121
Panku	672
Riang	1.011
Tanchangya	8.313
Tepra	37.246

As can be seen, out of the above (twelve) groups, five are of far greater numerical importance than others : the Chakma, the Magh (i) Tipra, the Murung—Mro and the Tanchangya--- The Hill tracts Tribes men are ethnically different from the settled populace in East Pakistan (i.e. Bangladesh). They have closer links with hilly peoples of the vast region that extends from Tibet to Indo-China. They are short in stature, have black hair, prominent cheek bones and narrow eyes—features that remind one of the "Mongoloid type." (Chapter-1, Page-5, Tribes men of the chittagong Hill tracts, Prof. Pierre Bessaignet, M. A. D. Litt, (Paris). Formerly head of the department of Sociology, Dacca University).

www.pathagar.com

অধ্যায়-৮

বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল

মুসলমান শাসন আমলে বাংলার অনেক পরিববার সোনার থালায় ভাত খাইত। বঙ্গদেশের নাম হইতেই বঙ্গোপসাগরের নামের কারণ।

বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে বাকী ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল অর্থাৎ পরের দিন। কথাটা বলিয়াছেন ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রয়াত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ১৯০৭ সালে ভারতীয় আইন সভায় দাঁড়াইয়া বাংলাদেশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মিন্টোকে বলিয়াছিলেন—"Conciliate Bengal my Lord, conciliate Bengal. A country which produces a poet like Rabindra Nath, a Scientist like Jagadish Chandra, a jurist like Dr. Rash Behari is not to be ignored. What Bengal thinks today, the rest of India thinks to-morrow." (পৃষ্ঠা-২৫, ৩২, ত্রৈমাসিক ল জার্নাল, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮২, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ হইতে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিরোধিতা ত্যাগ করুন প্রভু বাংলাদেশ বিরোধিতা ত্যাগ করুন। যে দেশ রবীন্দ্র নাথের মত কবি, জগদীশ চন্দ্রের মত বিজ্ঞানী, ডঃ রাসবিহারীর মত আইনজ্ঞ জন্ম দিতে পারে সে দেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিবার নহে। বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে, বাকী ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল অর্থাৎ পরের দিন।

এই উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে, বাকী ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল অর্থাৎ পরের দিন কথাটি একাধিক দিক হইতে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বাং-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে যেমন বহুতর ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এই উপমহাদেশের অন্য কোথাও তেমন ঘটে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে রবীন্দ্রণাথ, জগদীস চন্দ্র ও রাসবিহারী এই তিনজন ক্ষণজন্মা পুরুষের. নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া থাকিলেও ইঁহাদের সহিত বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণকারী নিম্নলিখিত ক্ষণজন্মা পুরুষদের নামও উল্লেখযোগ্য।

১। দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবুদ্দিন আইবেক (ওরফে কুমার) (টীকা 'খ' দ্রষ্টব্য)

২। ঈশা খাঁ মসনদে আলী পরাক্রমশালী মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যাঁহার তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে মানসিংহের

www.pathagar.com

তলবারি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং মানসিংহ ঈশা খাঁর কাছে পরাজয় মানিয়া লইয়াছিলেন।

৩। নবাব সিরাজুদ্দৌলা, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী
৪। ফকির মজনু শাহ ,,
৫। শহীদ তিতুমীর, ,,
৬। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ,,
৭। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা
৮। নবাব স্যার সুলিমুল্লাহ, রাজনীতিবিদ
৯। দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ,,
১০। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ,,
১১। সুভাস চন্দ্র বোস ,,
১২। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ,,
১৩। শেখ মুজিবুর রহমান ,,
১৪। আবুল মনসুর আহমদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ
১৫। অধ্যাপক আবুল কাসেম, বাংলা ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা
১৬। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বহু ভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ও বাংলা ভাষা আন্দোলনের সর্বপ্রথম উদ্দীপক
১৭। অতীশ দীপঙ্কর, জ্ঞান তাপস ও দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজিত
১৮। শ্রী চৈতন্য দেব, বৈষ্ণব ধর্মীয় জাগরণের স্রষ্টা
১৯। কৃত্তিবাস ওঝা, বাংলা রামায়ন রচয়িতা
২০। কাশী রাম দাস, বাংলা মহাভারত রচয়িতা
২১। মহাকবি আলাওল, পদ্মাবতী কাব্য রচয়িতা
২২। মহাকবি ভারত চন্দ্র, অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতা
২৩। বিপ্লবী কবি আবদুল হাকিম, নুর নামা কাব্য রচয়িতা, সপ্তদশ শতাব্দীতে
২৪। মহাকবি মাইকেল মধু সূদন দত্ত, মেঘনাদ বধ কাব্য রচয়িতা
২৫। মহাকবি কায়কোবাদ, মহাশ্মশান মহাকাব্য রচয়িতা
২৬। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্য ও সঙ্গীতে নব যুগ স্রষ্টা
২৭। পল্লী কবি জসীম উদ্দিন, নকসী কাঁথার মাঠ কাব্য রচয়িতা
২৮। কবি ফররুখ আহমদ, সাত সাগরের মাঝি কাব্য রচয়িতা
২৯। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক
৩০। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

www.pathagar.com

৩১। মীর মোশাররফ হোসেন, বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের রচয়িতা
৩২। সৈয়দ এমদাদ আলী, কবি, সাহিত্যিক ও "নব নুর" পত্রিকা সম্পাদক
৩৩। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
৩৪। মুন্সি মেহেরুল্লাহ
৩৫। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সাহিত্যিক, গবেষক ও আজাদ পত্রিকা সম্পাদক
৩৬। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যক্ষ
৩৭। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক।
৩৮। আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ, পুঁথি সংগ্রাহক ও গবেষক
৩৯। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লোক সাহিত্য গবেষক
৪০। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক ও লোক সাহিত্য গবেষক
৪১। ফকির লালন শাহ, প্রখ্যাত বাউল সঙ্গীত রচয়িতা
৪২। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী
৪৩। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী
৪৪। আব্বাস উদ্দিন আহমদ, প্রখ্যাত পল্লী সঙ্গীত শিল্পী
৪৫। আবদুল আলীম, প্রখ্যাত পল্লী সঙ্গীত শিল্পী
৪৬। কানাই লাল শীল, উপমহাদেশের প্রখ্যাত দোতারা বাদক ও পল্লী সঙ্গীত রচয়িতা

প্রমুখ বহুতর ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্মদান করিয়াছে যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ যে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার বস্তু নহে, এমন কথা বলিয়া ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নির্ভেজাল সত্য বাণীই প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লেখিত বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা পুরুষদের সংখ্যাধিক্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যে বলিয়াছেন, "বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে বাকী ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল" অর্থাৎ পরের দিন। গোখলের এই কথাও যে গোখলের কোন ভাবাবেগের ও অতিশয়োক্তির কথা নহে বরং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও তত্ত্বজ্ঞানেরই কথা তাহা নিম্নবর্ণিত কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

(ক) "আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবেই একটি স্বাভাবিক মানব বসতি হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রধান নিয়ামক ভূগোল নয়, ইতিহাস। ইতিহাসের প্রয়োজনেই ভূগোলকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের চৌহদ্দি অংকন করতে বাধ্য হতে হয়েছে। ঢাকা

www.pathagar.com

কেন্দ্রীক এই সার্বভৌম রাজনৈতিক অধিকারের কাছে একের পর এক বশ মানতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শক্তি ও ঔপনিবেশিক শক্তিকে। ইতিহাসে রাজধানী ঢাকার বীরোচিত ও গৌরবময় অবস্থানই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রধানতম কাঁচামাল। ত্রয়োদশ শতকে সেলজুক তুর্কী মুসলমানদের শাসনামল থেকেই 'মুলুক-ই-বাঙ্গালা'-এর রাজনৈতিক চৌহদ্দি বর্তমান। পরবর্তীকালে বিশাল মোগল বাদশাহী শাসনের অন্যতম প্রধান সুবাহ হিসাবে অভ্যুদয় ঘটে বাংলার। সুবাহ্ বাংলায় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ভূমি শাসন ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সাহিত্য সংস্কৃতির যুগপৎ বিকাশ ঘটার ফলেই গোটা ভারত, এমন কি এশীয় ভূ-খণ্ডে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম "রেনেসাঁ" বা নব জাগৃতির সূচনা ঘটেছিল। এই নব জাগরণের ধারা ফিরোজাবাদ থেকে সোনার গাঁ, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ সর্বত্রই অক্ষুণ্ন থাকে।

ধারা বিচ্যুতি প্রথম ঘটে জব চার্ণকের ফিরিঙ্গীপাড়া, সুতানটী ও পরবর্তীকালে বৃটিশ ক্যালকাটায়। সুবাহ বাংলায় ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ফিরিঙ্গী দখলদারির পরিণতিতে কেবল সার্বভৌমত্বের অবসানই (বৃটিশ বেঙ্গল) ঘটেনি, স্বাধীন হিন্দুস্থানেরও পরিণতি ঘটে বৃটিশ ইণ্ডিয়া নামক প্রাচ্য দেশীয় ইংলিশ কলোনী হিসাবে। যদিও ভারতের সার্বভৌমত্ব কেবল মাত্র ৩৬ বছর ভোগ করতে পারে ইংল্যাণ্ড-ঈশ্বরী মহারাজা বা রাণী। সুবাহ-ই-বাঙ্গালা ছিলো কুড়িটি সরকার বা প্রশাসনিক অংশে বিভক্ত।

সেই প্রাচুর্য ও গৌরবময় বাংলা সুবাহ্র পূর্বাঞ্চলের আমরা ভাগ্যবান অধিবাসী, যারা স্বাধীনতার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। বাদবাকী অংশ যেমন—পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের অংশ বিশেষ ভিন্ন সার্বভৌমত্বের অধীনস্থ, বেগানা জনপদ। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ঢাকাকে কেন্দ্র করেই পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাংলা সভ্যতার অভিব্যক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একবিংশ শতকাভিমুখী অভিযাত্রায় ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য সৃজনী কলা ও মহৎ মানব আকাঙ্খার কেন্দ্রীয় ভিত্তিভূমি।

বাংলাদেশ একটি গৌরবময় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। খলজির বঙ্গ বিজয়েরও বহু আগে দরিয়া পথে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের উপকূলীয় নিবাসের মধ্য দিয়ে এ দেশে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যশাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত পড়েছিল। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাই এ দেশের সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রচিত হয়েছিল সর্ববিধ সামাজিক তামুদ্দনিক স্বাতন্ত্র্য।---- এই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ কেবল

www.pathagar.com

যে জাতীয় গৌরবের জন্যই প্রয়োজন তাই-ই নয়, জাতির প্রতিদিনকার সংগ্রাম ও সৃষ্টিমূলক মেধা ও তাকত সঞ্চয়ের জন্যও এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন।" (পৃষ্ঠা-৫, মঞ্চে-ময়দানে, পথিক, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ই মার্চ, ১৯৯৪, ৪ঠা চৈত্র, ১৪০০ সন)।

(খ) জ্ঞান গরিমায়, সাহস ও বীর্য শক্তিতে বাংলাদেশ যে এই উপমহাদেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখিত ভাষ্য হইতেও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইবে।

"সাম্প্রতিক কালের একটি বিশেষ খবর ঃ জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্করের দেহ ভস্ম হাজার বৎসর পর তার নিজ দেশের মাটিতে আনয়ন। ---- এই খবরটির অবয়ব যতই ছোট হউক না কেন কিন্তু ইহার ব্যাপকতা ও গভীরতা অপরিসীম। ---- হাজার বৎসর পর দেশের ছেলে দেশের মাটিতে শেষ ক্রিয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিল।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুরে অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতীশ দীপঙ্করের জন্মের শত বর্ষ পূর্ব হইতেই এই দেশ, বঙ্গদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জ্ঞান-গরিমা, শৌর্য-বীর্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র ছিল। --- অতীশ দীপঙ্করের দেহ ভস্ম আনয়নের ঘটনা আমাদেরকে তড়িৎবেগে হাজার বৎসর পূর্বের ইতিহাসের দিকে বিস্ময়াবিষ্টের মত টানিয়া লইয়া যায়। ---

হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যে জ্ঞান সাধনায় উৎকর্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার স্ফুলিঙ্গ বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। তাপস অতীশ দীপঙ্কর সেই সাধনার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহাদের জ্ঞান সাধনার ভিত্তি মানব দেহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। দেহকেই তাঁহারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মনে করিতেন, দেহই সকল তত্ত্বের মূল, দেহই সকল সাধনার মন্দির। এই সাধনায় তাঁহারা নির্বাণ (ফানাফিল্লাহ) লাভের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। -----

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নেপালের মাটিতে ভারতীয় আর্যবাদীদের সামাজিক অত্যাচারের কবল হইতে মনুষ্যত্বের অধিকার আদায়ের বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলিয়া ধরেন মহামানব গৌতম বুদ্ধ----(বাংলাদেশেও) এই অত্যাচারের শিকার নিশ্চয়ই ছিলেন তাপস অতীশ দীপঙ্কর যাহার ফলে তাঁহার দেহ ভস্ম দেশের মাটির স্পর্শ পাইতে পারে নাই এতকাল।

সেই নিদারুণ নিষ্পেষণের যুগে আমাদের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কুমারের জীবনও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুমার ছিলেন একই মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রামপাল

www.pathagar.com

নগরের মহারাজ নামে রাজা বল্লভানন্দের সেনাপতির পুত্র। রাজা বল্লভানন্দের সঙ্গে সেনরাজ বল্লাল সেনের যুদ্ধে সেনাপতি মহারাজ প্রাণত্যাগ করেন। বল্লভানন্দের রাজ্য সেনদের কবলিত হয়। আর সেনাপতি (মহারাজ) পুত্র তরুণ 'কুমার' হন সেনদের হাতে বন্দী। নিষ্ঠুর সেনরাজ কুমারকে আরবীয় বণিকদের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া চিরতরে দেশান্তরিত করেন। গজনীভূমিতে ক্রীতদাস কুমার তুর্কী সুলতান মহম্মদ ঘোরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। ফলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি পদে উন্নতি লাভ করেন। তুর্কী সুলতান ভারতের সিংহাসন দখল করিয়া কুমারকেই ভারত শাসনের ভার দিয়া গজনী ফিরিয়া যান। কুমারের মুসলমান নাম কুতুবউদ্দীন আইবেক দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অমর কীর্তি দিল্লীর কুতুব মিনার। তাঁহারই স্বচোখে দেখা নিজ জন্মভূমির উপর বর্ণবাদীদের তাণ্ডব লীলার প্রতিকারার্থে স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীকে নির্দেশ দিয়া বঙ্গে সিংহাসন দখল করিয়া আমাদেরকে বর্ণবাদীদের অত্যাচার হতে মুক্ত করেন ১২০৪ খৃষ্টাব্দে।" (তাপস অতীশ দীপঙ্কর, লুৎফর রহমান খান, পৃষ্ঠা-১২, ১৩, মাসিক 'অনুসন্ধান' চৈত্র, ১৩৮৭, বিক্রমপুর ইতিহাস অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।

বাংলাদেশের বিক্রমপুরের সন্তান দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক ওরফে কুমার কর্তৃক এইরূপে বঙ্গদেশ বর্ণবাদীদের তাণ্ডব লীলা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হওয়ায় ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৫৩ বৎসর পর্যন্ত। মুসলমান শাসনামলে বাংলাদেশের জন জীবনে, বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে স্বস্তি ও শান্তি নামিয়া আসিয়াছিল নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও তাহার পরিপূরক স্বীকৃতি মিলে—

"তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, রমেশ চন্দ্র মজুমদার)।

বাংলাদেশের জন জীবনে এই রূপ স্বস্তি ও শান্তি বিরাজিত থাকার ফলেই উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বেরও বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছিল।

মুসলমান শাসনামলে বাংলার অনেক পরিবার সোনার থালায় ভাত খাইত।

(গ) "নবাবেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রভূত বিত্ত সঞ্চয়ও করিয়াছেন, কিন্তু উহা ব্যয় করিয়াছেন এ দেশেই।-----সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র শক্তি হস্তক্ষেপ

www.pathagar.com

করে নাই বলিয়া আপামর জনসাধারণের উৎপাদনের উৎস বন্ধ হয় নাই—কৃষি ও শিল্পে তাহার প্রেরণা ও উৎসাহ স্তব্ধ হয় নাই। মুসলমান আমলে শেষের দিকেও বাঙলায় এমন বহু পরিবার ছিল যাহারা সোনার থালায় ভাত খাইত—একথা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালীর ইতিহাস রচয়িতা গোলাম হোসেন তাঁহার 'রিয়াছল সালাতিন' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সোনার থালার ২টি নিদর্শন বাংলাদেশের সোনার গাঁও যাদু ঘরে এখনও পর্যন্ত রক্ষিত আছে। -- ইংরেজ আসিয়া থালাও লইয়াছে, বিলাতী পণ্য আমদানী করিয়া এবং তরবারির জোরে উহা দেশে ঢুকাইয়া (এ দেশবাসীর) আয়ের পথটাও শেষ করিয়াছে। ইংরেজ আমলেই ভারতবর্ষে শোষণ নীতির সূত্রপাত হয়। সোনার বাংলার মাটিতে শত শত বৎসরের মুসলমান শাসন ভারতবাসীর যে ক্ষতি করিতে পারে নাই, ইংরেজ তাহাই সাধন করিয়াছে। ইহার জের আজও দেশে রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজ গিয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে এমন একদল আত্মকেন্দ্রিক লোক, যাহারা এ দেশের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মনে প্রাণে বিদেশী।............ইহাদের হাতে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সংস্থানের ভার পড়িয়া দেশের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তৎপূর্বে যে কি ছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে।" (পৃষ্ঠা-১৮৮, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, শ্রী সুধীর কুমার মিত্র)।

(ঘ) শ্রী প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করিয়াছেন—

"বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না; বাংলাই দিল্লী সাম্রাজ্যের খাদ্য ও বস্ত্রের উৎস ছিল।" (পৃষ্ঠা-২৬, বাঙালী)। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এই সত্যের প্রমাণ মিলে—

"১৪০৬ খৃষ্টাব্দে চীনা পর্যটক মা-হুয়ান বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলার রাজধানী তখন ফিরোজাবাদ। বাংলাদেশের শাসক তখন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। মা-হুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের অংশ বিশেষ তৎকালীন বাংলার যে চিত্রটি তুলে ধরে, তা নিম্নরূপ ঃ

সুমাত্রা রাজ্য থেকে আমরা জাহাজ যোগে বাংলায় এসে পৌছুলাম। সমুদ্রে আমাদের সময় লাগল একুশ দিন। প্রথমে আমরা স্পর্শ করলাম চট্টগ্রাম। সেখান থেকে ছোট নৌকায় চড়ে ৫শত "লী" দূরবর্তী সোনার গাঁ রাজ্যে। রাজধানী সোনার গাঁ শহরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। রাজা এবং তার মন্ত্রীবর্গের নিজ নিজ প্রাসাদ রয়েছে। বাংলা খুব বড় রাজ্য। প্রচুর পণ্য এই রাজ্যে। যেমন তার সম্পদ, ততবেশী তার জনসংখ্যা। তারা ধর্মে মুসলমান এবং তাদের ব্যবহার আচরণ খুবই উন্মুক্ত এবং সহজ সরল। ধনী ব্যবসায়ীরা নিজেরাই

www.pathagar.com

জাহাজ বানায় এবং দূর দেশ-দেশান্তরে বাংলার পণ্য নিয়ে যায়। বেশীর ভাগ ব্যবসায়ীই কৃষি পণ্যের কারবারী। তাদের রঙ কালো। অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু কিছু ফর্সা বা ধলা বর্ণের লোকও চোখে পড়ে। পুরুষদের সাধারণতঃ দেখা যায় মাথা মোড়ানো, তাদের পরণে থাকে সাদা আলখেল্লা এবং মাথায় বেনী পাকানো পাগড়ী। কোমরে একটা বড় রুমাল জাতীয় পাট্টা বাঁধা থাকে। তাদের পায়ে সুচাগ্র চর্ম নির্মিত পাদুকা। রাজা ও পারিষদ বর্গের পরণে ধোপদুরস্ত সৌখিন বস্ত্র। লোকদের ভাষা বাংলা। এ দেশে ফার্সী ভাষাতেও কথা বলা হয়। বছরে এদের দুইটি প্রধান ফসল ফলে।.........রাস্তাগুলো চওড়া ও ঋজু। চায়ের কোনো প্রচলন না থাকায় তারা পান সুপারি দিয়ে মেহমান আপ্যায়ন করে। রাস্তার পাশে সুন্দর সুন্দর দোকান, তাতে মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী। রাস্তার পাশে খাবার দোকান ও হাম্মাম (স্নানাগার) দেখা যায়।

বাংলায় মলমল কাপড় পাওয়া যায়, যার দৈর্ঘ্য ২০ এবং প্রস্থ ৪ ফুট। এখানে মার্লবেরী ও গুটি পোকার চাষ হয়। রেশমী রুমাল ও টুপি স্বর্ণখচিত এবং নানা বর্ণে রঞ্জিত। ছুরি, বন্দুক ও কাঁচির হাতলাদিও স্বর্ণ খচিত। এখানে গাছের বাকল থেকে এক ধরনের কাগজ তৈরী হয়। কাগজে দু'নো দিকই হরিণ চামড়ার ন্যায় উজ্জল।"----এ দেশে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যদল আছে, যাদেরকে দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পারিতোষিক প্রদান করা হয়। বাদ্যযন্ত্রী বা গাইয়েদের একটি দল আছে,.........তারা যখন বাদন ধরে তখন শুরুতে খুব হালকা মেজাজে বাজায়। উত্তরোত্তর রাগ উঁচুতে চড়তে থাকে। ....অগণিত পর্যটকের বিবরণীতে বাংলার স্বর্ণ রৌপ্যের অঢেল প্রাচুর্য ও কৃষি সম্পদের সুমারহীন স্তুপের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই সম্পদ লুট করতে এসেই ইউরোপীয়রা স্বর্ণবেষ্টিত এই দেশটিকে করদ করেছিলো, যে কাজে তারা সহায়তা পেয়েছিলো এই সম্পদেরই স্বাভাবিক হকদার শত শতাব্দীর পড়শী উচ্চবর্ণ হিন্দু রাজকর্মচারী ও কুসীদজীবীদের।

যে বিশাল ধাতব ভাণ্ডারের কথা আমরা ইতিহাসে দেখি, আজ অনেকের কাছেই তা মনে হতে পারে বিলাপ বা প্রলাপ। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ যে যাই করুক না কেন, বাংলার সম্পদ ও প্রাচুর্যের হদিস না জানলে বাংলার ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। কেননা, এই সম্পদই এই প্রাচুর্যই হয়েছিলো একদিন তার কাল। সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনী (বাবর নামায়) লিখেছেন, "বাংলা মুলুকে অঢেল প্রাচুর্য। বাংলার অধিবাসীদের প্রিয় খেয়াল হচ্ছে স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করা আর মৃত্যুকালে তা সন্তান সন্ততিদেরকে দিয়ে যাওয়া।"

প্রাচুর্য আর সততার বিস্ময়কর মানসিকতার সাক্ষ্য দিয়েছেন চীনা পরিব্রাজকেরা। "বাংলা মুলুকে দৈনন্দিন বাণিজ্যিক লেন-দেনে স্বর্ণ মুদ্রা

www.pathagar.com

'মোহর' ব্যবহার করা হতো। এখানকার মুসলমান সওদাগররা এতই সৎ যে ১০ হাজার মোহর ক্ষতি হয়ে গেলেও তারা ওয়াদা খেলাপ করে না।" অথচ একই দেশে একই সময়ে অন্য সওদাগরী কওম কি করতো, 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে তার প্রমাণ পাই ঃ "বেনিয়া বর্ণ হিন্দু সওদাগররা বিদেশী ক্রেতাদেরকে নানাভাবে ওজনে, মানে ও পরিবেশনে প্রতারণা করতো" (বংশী দাস 'মনসা মঙ্গল' কাব্য, পৃঃ ৩৮০-৯০ এবং মুকুন্দ রামের 'চণ্ডি মঙ্গল' কাব্য, পৃঃ ১৯১ দৃষ্টব্য)।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় শিল্প-বাণিজ্যের অভাবিত অগ্রগতির ফলেই স্বর্ণ রৌপ্যের এত চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আমলে (১৩৯০-১৪১০) এ দেশে কেবল টাকশালই ছিলো ২৫টি (এখন মাত্র একটি)। সুলতানী আমল থেকে ঢাকার খাজা নবাব বাহাদুরগণ পর্যন্ত যত অর্থ হাজী সাহেবানদের মাধ্যমে পবিত্র মক্কা-মদিনার তীর্থস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও এতিম মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে পাঠানো হতো, সকল অর্থই দেওয়া হতো স্বর্ণ মুদ্রায়।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আগত পর্যটক সিবাস্তিয়ান মানরিক লিখেছেন ঃ বাংলায় তৎকালীন সময়ে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার এত ছড়াছড়ি ছিল যে, বিত্তবান ব্যবসায়ীদের অনেকে ধামা বা ঝুড়ি ভর্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা মেপে হিসাব করতেন। ঢাকার কয়েকটি গৃহে তিনি স্বচক্ষে এভাবে মুদ্রা পরিমাপ করতে দেখেছেন। মানরিকের লেখায় ঃ শাহজাদা সুজার সুবাদারী আমলে গৌড়ের একজন কৃষক মাটির তলা থেকে তৎকালীন ৩ কোটি টাকা মূল্যের মোহর ও মূল্যবান পাথর উদ্ধার করেন। পর্যটক আলেকজাণ্ডার ডাও-এর লেখায় দেখা যায় ঃ ইংরেজ আসার আগে বাংলা মুলুক ছিলো এমন একটি বদ্ধ ডোবা যেখানে সারাবিশ্বের রাশি রাশি স্বর্ণ এসে তলিয়ে যায়, যা আর কোন দিনই ফিরে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না।" (আলেকজাণ্ডার ডাও, ইন্দোস্তান, পৃষ্ঠা-১১২)। (বারোয়ারী যোগানদার, পৃষ্ঠা-৫, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ই মার্চ, ১৯৯৪; ৫ই চৈত্র, ১৪০০ সন)।

(ঙ) "ঢাকার বস্ত্র শিল্প। প্রাচীনত্ব—ঢাকার বস্ত্র শিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীনত্বে জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চীনের মৃন্ময় বাসন এবং দামাস্কাসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতে অন্য কোন শিল্পই ঢাকার মসলিন অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে বেবিলন এবং আসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকট সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ

www.pathagar.com

হইয়াছিল। এ কথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনীষীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তৎকালে শত শত বাণিজ্য-তরণী বঙ্গদেশ হইতে প্যালেস্টাইন বন্দরে উপনীত হইয়া পণ্য সম্ভারে বৈদেশিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত।.... মিঃ ইয়েটস বলেন, "খৃষ্ট পূর্ব দ্বিশতাব্দীতে ভারতীয় (অর্থাৎ বঙ্গীয়) কার্পাস বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রিত হইত। (Testrenum antiquerum, I. C. Page-341).

প্রাচীনকালে ঢাকায় এরূপ সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হইত যে, বিংশতি হস্ত দৈর্ঘ বিশিষ্ট একখানা বস্ত্র পক্ষী পালকের ন্যায় ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলিত। (Ref. History of cotton manufacture).১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্‌ফ ফিচ লিখিয়াছেন, 'সোনার গাঁ পরগণাতে ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে.........সোনার গাঁয়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মলমল (অর্থাৎ মসলিন) প্রস্তুত হয়, উহার ওজন হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা। মসলিনের সূতা—'ঢাকার বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস' প্রণেতা অজ্ঞাত নামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এক পাউণ্ড ওজনের এক দেটী সূতা তাহার সমক্ষে পরিমাপ করা হইলে উহা ২৫০ মাইল লম্বা প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কলের সূতা অপেক্ষা এই সূতা নরম, কিন্তু কলের তন্তু মসলিন অপেক্ষা হস্ত নির্মিত মসলিন শক্ত। একজন তন্তুবায় প্রাতঃকালে চরকায় সূতা কাটিয়া একমাস সময় মধ্যে মাত্র অর্দ্ধতোলা সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লিখিত Trigonometrical Survey গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদী ত্রয়ের সঙ্গম স্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপী প্রায় সমস্ত স্থানেই মসলিন প্রস্তুত হইত। (Vide-Trigonometrical Survey of India, Printed by order of the House of commons, 15th April, 1951.)" (শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা, মাসিক সবুজ বাংলা, নারায়ণগঞ্জ, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬)।

"মুসলমান রাজত্বের পূর্ব হইতেই সোনার গাঁও, ডুমরোর, তীতবাদী, জঙ্গলবাড়ী, কাপাসিয়া প্রভৃতি কার্পাস শিল্পের প্রধান আড়ং ছিল। মুসলমান আমলে এই শিল্পের অবনতি হয় নাই, তবে হিন্দুদের আমলে এই শিল্পের সম্বন্ধে অবনতি হইয়াছিল।............

সোনার গাঁও সূক্ষ্ম মসলিন ও ফুলদার কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।......... পূর্বে ঢাকা অঞ্চলে যে তুলা উৎপন্ন হইত, তাহার আঁশ ছিল দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও

www.pathagar.com

কোমল। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তাহার শাখা নদীগুলির ধারে ধারে তুলা উৎপন্ন হইত। ঢাকার বর্তমান ফিরিঙ্গীবাজার হইতে ইদিলপুর পর্যন্ত ৪০ মাইল ভূ-ভাগে যে রূপ তুলা উৎপন্ন হইত, জগতে সেরূপ তুলা কোথাও হইত না। বৎসরে চৈত্র, বৈশাখ ও আশ্বিন, কার্তিক মাসে দুইবার তুলা চাষ হইত। ধান কাটিয়া বিচালীতে আগুন লাগাইয়া সেই ছাই সার প্রাপ্ত জমি চষিয়া তাহাতেই তুলার বীজ বপন করিত। গ্রীষ্মের তুলা অপেক্ষা শারদীয় তুলা নিকৃষ্ট হইত। গারো পাহাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ভোগা নামে মোটা তুলা উৎপন্ন হইত।" (পৃষ্ঠা-৪৪, গৌড়ের ইতিহাস, শ্রী রজনী কান্ত চক্রবর্তী)।

"মসলিন শব্দটির মূল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এটা ফার্সী শব্দ নয়, বাংলা ও সংস্কৃত তো নয়ই। হেনরি ইউল ও এ, সি, বার্নেল মনে করেন যে, মসলিন শব্দটি বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র মসুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এক সময়ে মসুল এলাকায় উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী হতো। --- মসলিনের বুনন প্রণালী ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করে ১৮০০ সালে ঢাকার জনৈক ইংরেজ বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারী জেমস টেলর কলকাতার বোর্ড অব ট্রেডের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। মসলিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এটি একটি প্রামাণ্য দলিল ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। ঢাকা জেলার তাঁত শিল্প উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ঢাকা জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কম বেশী তাঁতের কাজ হতো। কিন্তু উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরী হতো ঢাকা, সোনার গাঁও, ধামরাই, তিতাবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর। শেষোক্ত দু'টো এলাকা বর্তমানে ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত।..........

মসলিন বুননের উপযোগী ফুটী ও বয়রাতি জাতের কার্পাস ঢাকা জেলা ও আশে পাশে জন্মাতো। এর মধ্যে ফুটী কার্পাস মসলিন বুননের জন্য উৎকৃষ্টতর ছিলো, যা প্রধানতঃ মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে দৈর্ঘে ৪০ মাইল ও প্রস্থে ৩ মাইল ভূভাগে জন্মাতো। ঢাকার তাঁতীরা শুধু চোখে দেখেই সূতার সূক্ষ্মতা পরিমাপ করতেন।.........জেমস টেলর এক পাউণ্ড ওজনের এক নাল সূতা দেখেছিলেন, যার দৈর্ঘ ছিলো ২৫০ মাইল..........

১৮১১ সালে ঢাকার ইংরেজ বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারী কিছু কার্পাস আমেরিকা থেকে আমদানী করে ঢাকার তাঁতীদের কাছে পাঠান। অনেক চেষ্টা করেও তাঁতীরা তা থেকে সূতা কাটতে পারেনি এবং তারা একযোগে রায় দেয় যে, আমেরিকান কার্পাস ঢাকার তাঁতে ব্যবহারের অনুপযোগী। তা ছাড়াও ফুটী কার্পাসের সূতা ধোয়ার ফলে ফুলে উঠতো না। বরং সংকুচিত হতো। তাতীদের মতে, ধোয়ার ফলে যে সূতা কম ফুলে ও বেশি সংকুচিত হয়, তা

www.pathagar.com

উত্তম। এ সূতায় কাপড়ের বুননি অধিকতর ঘন সন্নিবদ্ধ হয় ও কাপড় টেকসই হয়। কিন্তু বিদেশী কার্পাস কিংবা কলে তৈরী আমদানীকৃত সূতা ধোয়ার সময় ফুলে উঠতো এবং কম টেকসই ছিলো। দ্বিতীয়তঃ সূতার সূক্ষ্মতা নির্ভর করে সূতা কাটার সময় হাতের টিপের ওপর, সূতা যত বেশি টিপে মোড় বা টুইষ্ট করা হতো, সূতা তত সূক্ষ্ম ও টেকসই হতো।" (ঢাকাই জামদানী, দিলারা জলি, পৃষ্ঠা-৪৫, ৪৬, ঈদুল আজহা সংখ্যা সাপ্তাহিক 'রোববার' ২রা আগষ্ট, ১৯৮৭; ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৪)।

(চ) এই উপমহাদেশের শিল্প সংস্কৃতিতেও ভারতের অপেক্ষা বাংলাদেশ যে অগ্রগামী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"পশ্চিম দেশেও একটা প্রবাদ শুনিয়াছি—

'সাজা বাজা কেশ
তিনো বাংলাদেশ'।

অর্থাৎ অঙ্গ সজ্জায়, বাদ্য যন্ত্রের নির্মাণে ও কবরী রচনায় বাংলাদেশই সকলের বড়ো।........লোক সঙ্গীতে নানা রকমের বাদ্য যন্ত্র ছিল এবং এখনও আছে, এমন কি হাড়ি বাজনা পর্যন্ত।...........সকলের চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য একটি আমার মনে জেগে উঠে, যদিও সেটা লোক সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। কত প্রাচীন ধারা বলতে পারিনে—আজো দেখি---------ডান হাতে একতারা, আর কোমরে কায়দা করে বাঁধা একটা বায়া, তার মুখে গান চলেছে-------বাউল সম্প্রদায়ের গান; একতারা ও বায়াতে চমৎকার সঙ্গীত চলেছে, আর তাল রেখে সুছন্দে ঘুরে ঘুরে নেচেও চলেছেন আবেশ ভরে। এক সঙ্গে এক মূর্তিতে সঙ্গীতের ত্রিধারা অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য বয়ে যাচ্ছে। ভারতের আর কোথাও এমনটি আছে কিনা সন্দেহ।" (অমিয় নাথ সান্যাল, 'চতুরঙ্গ' মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬০)।

এতদ্ব্যতীত, ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সৃষ্টির পশ্চাতেও বাংলাদেশের সঙ্গীত যে সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে তাহা বোধগম্য হইবে।

"বাংলার লোক গীতি অন্যান্য যাবতীয় লোক সঙ্গীত থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপ ভঙ্গীতে নয়, সাত স্বরের বিশেষ ঐশ্বর্য নিয়েও। আর কেবল সুরের দিক দিয়ে নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে রাগ সঙ্গীত বা শিল্প সঙ্গীত

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে বলেই হয়ত সুরে ও তালে এই বৈচিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ---- রাগ সঙ্গীতের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করেছেন---- তারই দু'একটাকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এই লোক সঙ্গীতে অনুসৃত হতে দেখে এ কথাই মনে হয়, রাগ সঙ্গীতের জন্ম ইতিহাসের পেছনে আছে যে এই লোক সঙ্গীতই তা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাই লোক সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলো অন্ততঃ রাগ সঙ্গীতের প্রথমাবস্থায় বিদ্যমান ছিল ধরে নিতে পারি। পরে অবশ্য ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে হতে সে পুরানো নিয়মকে বর্জন করে নূতন নিয়ম গড়ে তুলেছে। তবু রাগ সঙ্গীতের সেই প্রাচীন পদ্ধতিগুলো এখনও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়াযায়।...........

বাংলাদেশের ....বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করে আমরা বলতে পারি ভাটিয়ালীর সৃষ্টি বাউলের আগেই হয়েছে।...... ভাটিয়ালী....... সকল বাংলা লোক গীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।................ভাটিয়ালীতে সাত স্বরের প্রয়োগ তো হয়ই, অনেক সময় এর গানের গতি দুই সপ্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

ভাটিয়ালীকে যদি রাগ সঙ্গীতের ধীর গম্ভীর আলাপের চালের সঙ্গে তুলনা করি তবে সারিগানে রয়েছে যেন দ্রুত গতির চাল।" (পরিশিষ্ট, বাংলার লোক সাহিত্য, ডঃ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

বঙ্গদেশের নাম হইতে বঙ্গোপসাগর নামের কারণ

(ছ) অতঃপর বঙ্গদেশের নামানুসারে বঙ্গোপসাগরের নাম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দৃষ্ট হয় যে বঙ্গদেশের নাবিকদের তথা তাঁহাদের আরবীয় নাবিক পূর্ব পুরুষদের সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় বঙ্গোপসাগরে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করিবার কারণেই অন্য কোন দেশের নামে না হইয়া বঙ্গদেশের নামেই বঙ্গোপসাগরের নাম হইয়াছে। নিম্নবর্তী আলোচনা হইতে ইহা বোধগম্য হইবে।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপসাগর বঙ্গোপসাগরের সীমানা-শ্রীলংকা হইতে মায়ানমারের প্যাগোডা পয়েন্ট পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তটরেখা ২২৫০ মাইল ও ইহার মোহনা পাশাপাশি অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত ১০৭৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

"Largest Bay—The largest bay in the world is the Bay of Bengal, with a shoreline of 2250 miles from the south eastern

www.pathagar.com

Srilanka to Pagoda point, Burma. Its mouth measures 1.075 miles accross. (Page-130, Guinness Book of world Records by Norris M. C whirter and Ross MC whirtier-1977 Edition).

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এই বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দেশ, শ্রীলংকা, ভারত, বার্মা ও বঙ্গদেশ। ইহাদের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গদেশের নাম অনুসারেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপসাগরের নাম বঙ্গ+উপসাগর=বঙ্গোপসাগর হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাবিদ শ্রী অন্নদা শঙ্কর রায় "মোদের গরব মোদের আশা" শিরোনামে প্রকাশিত তাঁহার রচিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। শ্রী রায় উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে "বাংলাদেশ কেবল মাত্র নদী মাতৃক নয় সমুদ্র তীরবর্তী দেশ। বঙ্গোপসাগর নাম যার নাম অনুসারে হয়েছে সে দেশ (অর্থাৎ বঙ্গদেশ) একদা সমুদ্র যাত্রায় অগ্রণী ছিল। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর—এসব নাম অকারণে রাখা হয়নি। যারা রেখেছিল তারা পৃথিবীর নাবিক সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে বাঙালী নাবিকরা গণ্যমান্য ছিল। সেসব নাবিকদের বংশধর এখন লস্কর নামে বিদিত। বিশ্বের সবদেশ এদের চেনে। এদেরও সব দেশ চেনা। কিন্তু এদের নিজেদের কোনো জাহাজ নেই। পরের জাহাজেই এদের জীবন কেটে যায়। এদের দুঃখের কাহিনী আমার জানা। একদা এদের কারো কারো প্রাণ হানির বা অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছিল আমার বিচার্য বিষয়। সবাই এরা পূর্ব বাংলার লোক। সাধারণতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট জেলার।......... এই একটা ক্ষেত্র যেখানে বাঙালী নাবিকরা ও বণিকরা অল্প দিনের মধ্যেই গ্রীকদের মতো কুশলী হতে পারে।

যে যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই বড়ো হয়। বাংলাদেশের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলুম। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা সকলেই জানেন।" (পৃষ্ঠা-১২৭৮, সাপ্তাহিক দেশ, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭২; ১৫ই মাঘ, ১৩৭৮, কলিকাতা)।

উপরের উদ্ধৃতির ভাষ্যে শ্রী অন্নদা শঙ্কর রায় যে বলিয়াছেন, "বঙ্গোপসাগর নাম যার নাম অনুসারে হয়েছে সে দেশ (অর্থাৎ বঙ্গদেশ) একদা সমুদ্র যাত্রায় অগ্রণী ছিল। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এসব নাম অকারণে হয়নি। যারা রেখেছিল তারা পৃথিবীর নাবিক সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে বাঙালী নাবিকরা গণ্যমান্য ছিল। সেসব নাবিকদের বংশধর এখন লস্কর নামে বিদিত।" এই কথার অর্থ দাঁড়াইতেছে যে, বঙ্গদেশের চট্টগ্রামের সামুদ্রিক জাহাজের নাবিকদের নামডাক ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণেই বঙ্গদেশের নাম

www.pathagar.com

অনুসারেই "বঙ্গোপসাগর" নাম হইয়াছে। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সম্পূর্ণ সত্য হইতেছে এই যে, বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেটের নাবিকদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষ প্রাচীন ইজিপ্ট, সিরিয়া ও প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সামুদ্রিক জাহাজের নাবিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্য উপলক্ষে প্রাচীন বঙ্গদেশে উপনিবেশ ও বসতি স্থাপনের ফলে প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ একসময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে বিধায় বঙ্গদেশ সংলগ্ন উপসাগর ও বঙ্গদেশের নাম অনুসারেই বঙ্গোসাগর নাম পায়।

প্রাচীন ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার সামুদ্রিক জাহাজের নাবিকগণ যে বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উপনিবেশ ও বসতি স্থান করিয়াছিল তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে চট্টগ্রামের ও নোয়াখালীর মধ্যবর্তী একটি স্থানের সাগর নাইয়া নামে। (বাংলাদেশের কিংবদন্তী, শামসুল ইসলাম প্রণীত)। এই সাগর নাইয়া নামটিই বিকৃত হইয়া স্থানীয় সাধারণ লোকের ভাষায় ছাগল নাইয়া নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার সামুদ্রিক জাহাজের নাবিকদের উপনিবেশ ও বসতি ছিল বলিয়াই যে উক্ত স্থানের নাম সাগর নাইয়া হইয়াছিল তাহা নিম্ন উদ্ধৃত ঐতিহাসিক সত্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে।

"Eratosthenes---- reported that papyrus ships, with the same sails and rigging as on the Nile, required twenty days to sail from the mouth of the river Ganges to the island of Ceylon, we could have no better source for the information that Egyption papyrus ships by-passed all of India and navigated in the distant Bay of Bengal." (Page-365, Early man and the ocean, Dr. Thor Heyerdahl).

"In view of written records from Alexandria and Nineveh, India had contact with both Egypt and Sumer in the early days of reed boat navigation and if we want to be cautions in our approaches to the problem no part of coastal Asia can be considered out of reach for relaying cultural impulses in the second millenium B. C. when so many hitherto modest culture took an aspect of full civilization is coastal Asian water." (Page-366, 367, Ibid).

www.pathagar.com

প্রাচীন ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার সুমারের নাবিক ও বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গোপসাগরের পথ ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গদেশে আগমন করিবার কারণও এই সত্য হইতেই ধরা পড়ে যে, সমগ্র বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গদেশই ছিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী দেশ। প্রাচীন বঙ্গদেশ যে এই উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে।

"বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না; বাংলাই দিল্লী সাম্রাজ্যের খাদ্য ও বস্ত্রের উৎস ছিল।" (পৃষ্ঠা-২৬, বাঙালী, শ্রী প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ)। "বাংলার দুর্ভিক্ষ, বাংলার দাঙ্গা, বাংলা বিভাগ—বাঙালীর জীবনে ইংরেজদের শেষ কীর্তি।" (পৃষ্ঠা-৩৩, ঐ)।

"১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ পর্যটনকালে ফ্র্যান্সিস বার্নিয়ার লিখেন,........ এক কথায় বাংলা প্রাচুর্যের দেশ—সেখানে সব কিছুরই প্রাচুর্য। সে-যুগে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে এরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বঙ্গদেশে প্রবেশের শত পথ খোলা আছে; কিন্তু একবার প্রবেশ করে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি পথও নাই। বার্নিয়ার বলেন, 'আমি এমন কোন দেশের কথা জানি না-যেখানে এখানকার মত এত বিচিত্র শ্রেণীর মূল্যবান পণ্য পাওয়া যেতে পারে। এই সব মূল্যবান পণ্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের এখানে আকৃষ্ট করে। ....এখানে এত বিপুল পরিমাণে রেশমী ও সূতী বস্ত্র পাওয়া যায় যে, বাংলাকে এ-দু'টি পণ্যের ক্ষেত্রে মহামোগল সাম্রাজ্য, পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহ এবং সমগ্র ইউরোপের মহাভাণ্ডার অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার রকমারী সূতী বস্ত্রের পরিমাণের বিপুলতার কথা চিন্তা করে আমি সময় সময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি।..........প্রতি বৎসর যে কি বিপুল পরিমাণে এই সব পণ্য বিদেশে চালান যেত তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।.........এ দেশের সৌন্দর্য ও উর্বরতার তুলনা হয় না। ফল-ভারাবনত বৃক্ষরাজি আর শ্যাম সম্পদে ভরা এ দেশ।" (পৃষ্ঠা-১২৪, ১২৫, প্রাচ্যের রহস্য নগরী, বঙ্গানুবাদ-রহিমুদ্দিন সিদ্দিকী; মূল- Romance of an eastern capital, F. B. Bradely Burt)।.........বার্নিয়ার লিপিবদ্ধ করে যান, 'যুগ যুগ ধরে এ কথা বলা হয়ে এসেছে যে, মিসর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম অংশ; কিন্তু দু'-দু'বার বঙ্গরাজ্য পর্যটন করে আমি এই অভিমতে এসেছি যে, এ কথা মিসর অপেক্ষা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য।' হ্যামিলটন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে এত পর্যাপ্ত জিনিস পাওয়া যায় এবং সেগুলো এত

www.pathagar.com

সুলভ যে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এ এক আশ্চর্যজনক দেশ। এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, মন্বন্তর-মহামারী, অত্যাচার-অরাজকতায়ও এর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য হ্রাস পায় নাই।" (পৃষ্ঠা-৬৫, ৬৬, ঐ)।

উপরে উদ্ধৃত ভাষ্যের অতি বাস্তব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য হইতে অতঃপর নির্দ্বিধায় ধরিতে পারা যায় যে, শুধু মাত্র এই উপমহাদেশের মধ্যেই নহে বরং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেই প্রাচীন বঙ্গদেশ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচুর্যময় ও সমৃদ্ধশালী দেশ। সঙ্গতকারণেই প্রাচীন ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার নাবিক ও বণিকগণ যে প্রাচীন বঙ্গদেশকে তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করিয়া উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়া সর্বদা বঙ্গোপসাগরের পথে চলাচল করিত তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ফলে, সেই প্রাচীন বঙ্গদেশের নাম হইতেই বঙ্গদেশ সংলগ্ন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপসাগরের নামকরণও বঙ্গদেশের নাম অনুসারেই বঙ্গোপসাগর হইতে পারিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে একমাত্র আরব জাতির লোকেরাই কেন এবং কেমন করিয়া সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের জল পথে গমন করিয়া এমন কি প্রাচীন বঙ্গদেশেও আগমন করিয়া তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়াছিল তথা সভ্যতার আলো ছড়াইয়া ছিল তাহা ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন (Elpheinston)-এর নিম্ন লিখিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"To begin with, a land of deserts, rugged and barren—the peninsula of Arabia lies in the midst of fertile lands of the globe, the soil of which yields gold, the water, pearl and forests, odoriferous trees. Taking Egypt, Syria and Iraq on the one hand and India (i.e. Indian sub continent) on the other, the Arabs find around themselves rich and extensive tracts of the two great continents, mainly Asia and Africa whose material resources are thrown open to the traders. Urged by circumstances, having no or little means of sustenance, the Arabs struggled hard for existence, and take recourses to trading undertakings and shepharding. In fact, they are tradesmen as old as the world.

------Bounded west, south and east by sea, they were accustomed to navigation and plied at the fathomless oceans by

www.pathagar.com

means of sailing ships. Indeed, "Arabia is described as a country filled with pilots, sailors, and persons concerned in commercial business. (Page-183, History of India)----- The chief route they followed in their commerce with India (i.e. Indian sub-continent) and hither Asia was through the Arabian sea, and touching probably at every coastal town of India (i.e. Indian sub-continent) and Indian Isles. Not frequently did their vessels reach the interior parts of Assam sailing through the Bay of Bengal and the Brahmaputra (i.e. Brahmaputra of Bangladesh). (Page-186, Ibid)

অর্থাৎ সর্বাগ্রে অনাবাদী ও কর্কশ মরুভূমির আরব উপদ্বীপ ভূ-মণ্ডলের যে মাটি সোনা, পানি, মুক্তা, অরণ্য ও সুগন্ধি বৃক্ষরাজি উৎপাদন করে উহারই মধ্যস্থলে অবস্থিত। একদিকে মিসর, সিরিয়া ও ইরাক, অপরদিকে ভারত (অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত ধনসম্পদে প্রাচুর্যশালী বাংলাদেশ), এশিয়া ও আফ্রিকা নামের দুইটি মহাদেশের উর্বর ও বিস্তৃত ভূ-ভাগ আরবগণ তাহাদের চতুর্দিকে খুঁজিয়া পায় যাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বণিকদের নিকট উন্মুক্ত থাকে। জীবন ধারণের সামান্য কোন উপায় না থাকায় অবস্থানগত কারণে বাধ্য হইয়া আরবগণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রামে রত থাকিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও মেষ পালনের জীবিকা অবলম্বন করিত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পৃথিবীর মতই প্রাচীন ব্যবসায়ী। পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্বে সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাহারা নৌ-চালনায় অভ্যস্ত ছিল এবং সমুদ্রগামী নৌযানের সাহায্যে অতলস্পর্শ সমুদ্রে যাত্রা করিত। প্রকৃতপক্ষে আরবকে জাহাজ পরিচালক, নাবিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ একটি দেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ভারতের এবং নিকটবর্তী এশিয়ার সহিত তাহাদের বাণিজ্য চলাচলের প্রধান রাস্তা তাহারা আরব সাগরের মধ্যদিয়া সম্ভবতঃ ভারতের উপকূলবর্তী প্রতিটি শহর ও ভারতীয় দ্বীপ সমূহ স্পর্শ করিয়া অনুসরণ করিত। তাহাদের নৌযান সমূহ প্রায়শঃ বঙ্গোপসাগর ও বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিয়া আসামের অভ্যন্তর ভাগেও পৌঁছিত।

বোম্বে গেজেটিয়ারে উল্লেখিত নিম্নবর্ণিত ভাষ্য হইতেও উপরে বর্ণিত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে।

"As a matter of fact Arab settlements were established in India (i.e. Indian sub-continent) even during the pre-Islamic days." [Gazetteer of Bombay Presidency, IX, (11) 1.]

www.pathagar.com

আরব দেশীয় নাবিক ও বণিকগণ যে সমুদ্রের জল-পথে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল তাহা নিম্নবর্ণিত ভাষ্য হইতেও দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইবে।

"পর্যটক বারবোসা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দান করিয়াছেন, 'গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা বঙ্গ রাজ্যে উপনীত হই। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং উপকূলে অনেক নগর আছে। বন্দরে মুসলমান ও হিন্দু বাস করে। ইহারা নানারূপ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। প্রান্তদেশে "বেঙ্গল" বলিয়া একটি নগর আছে। ইহার অধিবাসীরা শ্বেতকায় এবং বলশালী। নানাদেশীয় বৈদেশিকগণ এই নগরে বাস করে। এই দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও দেশ উর্বর বলিয়া আরব, পারস্য, আবিসিনিয়ার বণিকগণও এই স্থানে সমবেত হয়। ইহারা সমৃদ্ধশালী এবং মক্কা দেশীয় নৌকার ন্যায় অনেক গুলি নৌকার অধিকারী। এই সকল নৌকায় করিয়া বণিকগণ করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, সুমাত্রা, সিংহল ও মালাক্কায় গমনাগমন করে।" (পৃষ্ঠা-১৬১, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, শ্রী সুধীর কুমার মিত্র, ২য় সংস্করণ, ১৯৬২, কলিকাতা)।

সে যাহা হউক, এতদ্দেশে মুসলমান শাসনের অবসানের পরে ইংরেজ শাসনামলে এ দেশের ভাগ্যে যে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"বলা বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না, ইংল্যাণ্ডের বিগত ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শটনঃ শটনঃ অগ্রগতি ও ধন সম্পদ প্রাচুর্যের অভিলাষ পূরণ করেছে বাংলারই লুণ্ঠিত সৌভাগ্য। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ৬০ বছরে স্টার্লিং পাউণ্ডের সবচেয়ে বড় নোটটি ছিলো ২০ পাউণ্ডের।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ গোটা ইংল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের শাখা ছিল ১২টি মাত্র। ১৭৯০-তে অর্থাৎ ৪০ বছরের ব্যবধানে ইংল্যাণ্ডের ট্রেজারী অধিপতি কি এমন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য চেরাগ পেলেন যে, দেশের অলিতে-গলিতে ব্যাংকের শাখা গজালো এবং নিত্য নতুন কারেন্সী নোট বাজারে ছাড়া হতে লাগলো ? ১৭৬০ সালের বস্ত্র নগরী ল্যাংকাশায়ারের তাঁত-টাকুর অবস্থা ছিলো টাঙ্গাইলের তাঁতীদের চেয়েও নিম্নমানের। তারা বলেন, "শিল্প বিপ্লব" ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ শিল্প বিপ্লব চাকা ঘুরিয়েছে এ কথা সত্য। তবে ভাগ্যের চাকা গড়েই উঠেছিল বাংলা ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য ভাগ্যাহত জনপদ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ও প্রাচুর্যে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত মিহি মসলিন ও রেশম বস্ত্রের যোগানদার বাংলাদেশ ১৮৩৫ সাল নাগাদ ইংলিশ কলের বিশাল বাজারে পরিণত হয়ে

www.pathagar.com

গেলো। ইতিহাস বেত্তা Brooks Adams তাঁর বিখ্যাত "The law of civilization and Decay" গ্রন্থে দেখিয়েছেন "১৬৬৪ সাল থেকে ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি মন্থর। কিন্তু ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সে গতি হইয়াছিল বিস্ময়করভাবে বেগবান।" (সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের জন্য অনুশোচনা, পৃষ্ঠা-৫, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই মার্চ, ১৯৯৪)। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্যেও এ সত্যের পরিপূরক তথ্য মিলে—"বাংলার দুর্ভিক্ষ, বাংলার দাঙ্গা,.......বাঙালীর জীবনে ইংরেজের শেষ কীর্তি।". (পৃষ্ঠা-৩৩, বাঙালী, শ্রী প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ)।

অফুরন্ত ধন সম্পদের ভাণ্ডার বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের কথায় উল্লেখ্য যে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পরে মীর জাফর ও মীর কাসেমকে অল্প দিনের জন্য নামে মাত্র নবাব করিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার রবার্ট ক্লাইভ বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া এ দেশে ইংরেজ শাসনের গোড়া পত্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের নির্দয় নির্যাতনের নিষ্পেষণে ও শোষণে এ দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়। নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দিবালোকের মতই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে—

"Experience (of the famine) of one reported in H. W. Hunters "The Annals of Rural Bengal."

"Still fresh in memories eye the scene I view:
The shrivelled limbs, sunken eyes and lifeless hue;
Still hear the mothers shricks and infants moans.
Cries of despair and agonizing moans,
In wild confusion dead and dying lie;
Hark of the jackals yell and vultures cry,
The dogs feel howl, as midst the glare of day.
They rest unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface"

ইংরেজের উপরিউক্ত অমানুষিক নিষ্ঠুর নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও শোষণে বাংলার বুকে যে দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল, ইংরেজকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া সেই দুর্যোগ হইতে বাংলার মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ কালমধ্যে বঙ্গবীর ফকির

www.pathagar.com

মজনু শাহ-র নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সমস্ত বঙ্গবাসীর সম্মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রাম এই উপমহাদেশের মধ্যে বঙ্গদেশেই সর্বপ্রথম শুরু হয়। ইংরেজকে এ দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত বঙ্গবাসী যে বঙ্গবীর ফকির মজনু শাহ-র নেতৃত্বে সসস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা নিম্নবর্ণিত তথ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—

১। ফকির	৪০০	জন
২। সন্যাসী	১০০	জন
৩। সিপাহী	৪০০	জন
৪। বৈরাগী	২০	জন
৫। অন্যান্য সম্প্রদায়	১০০০	জন
	মোট ১৯২০	জন

(vide-Sannyasi-Fakir Raiders of Bengal, I. M. Ghose)

অতঃপর,

১৮১৮	খৃষ্টাব্দে	- হাজী শরিয়তুল্লাহ, ফরাজী আন্দোলনের
১৮৩১	”	- সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর, বাঁশের কেল্লার
ও ১৮৫৭	”	- বাংলার ব্যারাকপুরে ও ঢাকায় সূচিত সিপাহী

বিদ্রোহের মাধ্যমে এ দেশবাসী এ দেশ হইতে ইংরেজকে তাড়াইয়া স্বাধীনতা উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের সহযোগিতায় ইংরেজ উহা দমন করিয়া এ দেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। উক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমানরাই যেহেতু নেতৃত্ব দান করিয়াছিল সেহেতু অতঃপর ইংরেজের সহযোগিতায় বর্ণহিন্দুগণ বাংলার মুসলমানদের জীবন সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। এমতাবস্থায়, বাংলার মুসলমানদের অনুপ্রেরণায়ই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ বর্ণহিন্দুদের সহিত একত্রে বসবাস অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ভারতের বুকে স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবীতে ভারত বিভাগের আন্দোলন করিয়া শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের পশ্চিমাংশে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্বাংশে তাই পূর্ব পাকিস্তান নামে দুইটি ভাগে একই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে পূর্ববঙ্গ হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও পূর্ব পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায় শাসন ও শোষণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার আকাঙ্খা পূরণ না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ১৯৭১ ইংরেজী সালে

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলাদা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এইরূপে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাদেশই সর্বকাজে সর্বদা অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। উপরে উল্লেখিত এই সমুদয় দৃষ্টান্তের সত্য হইতে অতঃপর নির্দ্বিধায় ও সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনিত হইতে হয় যে, "বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে বাকী ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল অর্থাৎ পরের দিন" বলিয়া ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির যেমন প্রমাণ মিলে, তেমনি দিবালোকের মত সুস্পষ্ট সত্যও ধরা পড়ে। সুতরাং প্রয়াত প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলের উপরিউক্ত উক্তি যে কোনও অতিশয়োক্তি বা অমূলক ভাবাবেগের কথামাত্র নহে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিবেন।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৯

লৌহিত্য সভ্যতা

"লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর"। (পৃষ্ঠা-৬৭২, বঙ্গবাণী, মাঘ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ১৩৩১-৩২, ষষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, কলিকাতা।) ব্রহ্মপুত্রকে এই লোহিত্য নাম কে দিল? কোথা হইতে কেমন করিয়া ব্রহ্মপুত্র এই লৌহিত্য নাম পাইল? দেশে বা বিদেশে এই নামে কোনও নদী আছে কিনা, তাহা সন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত দেশে বা বিদেশে এই লৌহিত্য নামে আর কোন নদী নাই।

তুরস্কের আঙ্কারা হইতে ১২০ মাইল উত্তর; উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হিট্টিদের রাজধানী হট্টুসাস। সেই হট্টুসাস শহরের পার্শ্বেই কিজিল-ইরমাক নামে একটি নদী রহিয়াছে। প্রাচীনকালে ইহার নাম ছিল হেলিস নদী। নদীটির পানির রঙ দেখিতে শুকনা রক্তের মত। তুর্কীরা তাই ইহাকে লোহিত নদী বলিয়া থাকে। মধ্য আনাতোলিয়াকে কাস্তের মত বেষ্টন করিয়া এই নদী কৃষ্ণ সাগরে পড়িয়াছে। খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে হিট্টি জাতি এমন একটি পরাক্রমশালী জাতি ছিল যাহার শাসন ক্ষমতা সমস্ত এশিয়া মাইনর ছাড়াইয়া সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে বেবিলন অধিকার করিয়াছিল এবং মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু ১১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে এই হিট্টিগণ কেমন করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাহা জানা যায় না। হয়ত তাহারা বৃহত্তর তুর্কী সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে হিট্টিগণ তুরস্কেরই একটি সংমিশ্রিত তুর্কী জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায়।

"The Hati who thus made their first appearance on the stage of international politics were not the same as those inhabitants of Cappadocia often called Proto-Hittites, among whom the traders from Ashur had their homes two centuries before. The immigration of new peoples from Europe may even then have been taking place. The new-comers at first barbarians, gradually adopted much of the civilization that they found in the regions in which they settled. An amalgamation of their Indo-European speech with the Asianic of the earlier inhabitants of Anatolia resulted in a mixed language which we call Hittite." (Page-31, The Legacy of Egypt, Editor, S.R.K. Glanville.)। এই তুরস্ক জাতীয় তুর্কী মনুষ্য সম্প্রদায় যে বাংলাদেশেও

www.pathagar.com

আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"জয় চন্দ্রের পিতামহ গাহড়বাল রাজ গোবিন্দ চন্দ্রের লিপিতে তুরস্ক দণ্ড নামে এক প্রকার করের উল্লেখ আছে; এইসব কর বোধ হয় আদায় করা হইত গাহড়বাল রাজ্যান্তর্গত তুরস্ক বাসিন্দাদের নিকট হইতে। মুহম্মদ বখতইয়ারের আক্রমণের আগেই উত্তর ভারতের বিহার পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরস্ক কেন্দ্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল তারনাথের বিবরণ হইতেও তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা-৫২৯, অধ্যায় রাজবৃত্ত, বাঙ্গালীর ইতহাস, নীহার রঞ্জন রায়।)

এতদ্ব্যতীত, তুরস্ক জাতীয় তুর্কী মনুষ্য সম্প্রদায়ের সহিত আরব জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন বাংলাদেশে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত ভাষ্যেও সুস্পষ্ট—"The only exception in an inscription of Ratna Pala which refers to Tajikas, identified with Arabs." (Social History of Muslims of Bengal, Dr. A. Karim)

"বাংলাদেশের সঙ্গে তুর্কী জাতির সংস্পর্শ ঘটে বহু আগে থেকেই।....প্রাচীন সংস্কৃত শিলা লেখেও তুরস্ক জাতীয়ের উল্লেখ আছে বলে ডক্টর এইচ, সি, রায় তাঁর Dynastic History of Northern India গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা রত্নপালের সংস্কৃত শিলা লেখে Bahikas and Yahikas নামে যে দু'টি জাতির উল্লেখ আছে, তার একটি তুর্কী, অপরটি আরব। এ থেকে আরব ও তুরস্ক জাতীয়দের আগমনের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়।...............প্রাচীনকালে সাংস্কৃতিক জগতের দু'টি শাখা ছিল—একটি ইরানী আরেকটি তুরানী। তুরানীদের সঙ্গেই তুরস্ক তথা আরবদের সম্পর্ক ছিল। আমাদের দেশে তুরানীদের (অর্থাৎ তুর্কী ও আরবদের) মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক লেনদেন ঘটেছিল" (আবু তালেব, 'গোরকোই শিলা লেখ', রবি বাসরীয় ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই, ১৯৭৩; ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৮০।)।

এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে যে প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কামরূপ রাজ্যের পৌরাণিক নাম। "কামরূপ রাজ্যের পৌরাণিক নাম প্রাগজ্যোতিষপুর।" (পৃষ্ঠা-১৮০, বগুড়ার ইতিহাস প্রভাসচন্দ্র সেন, ২য় সংস্করণ)। প্রাগজ্যোতিষপুর নামে আখ্যায়িত তথা ইতিহাস খ্যাত কামরূপ রাজ্যের সীমানা যে বাংলাদেশ পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক সম্রাট আকবরের সভাসদ

www.pathagar.com

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ রচয়িতা আবুল ফজলের ভাষ্য হইতেও জানিতে পারা যায়—

"Abul Fazal (author of Aiyeen Akbari) mentions that Camroop originally extended down to when the Luccke branches off from the Berhampooter,........this kingdom reached as far south and west as the Boorigonga, Dullesary, and Jenai, which no doubt constituted the Kingdom of Bongor, of which Bikrampore was the metropolis." (Page-64, 65, Topography and Statistics of Dacca, James Taylor, 1840)

উপরন্তু, ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

"The boundaries of Kamroop are very indefinitely described. The name is applied by Mohammedan writers to all countries between Bengal and Thibet, from the river Gunduck on the west to the Brahampooter on the east......From Dr. Wade (author of 'An Account of Assam') we learn that Kamroop was formerly a very extensive Kingdom, and that its capital was the present town of Rangamutty, in the N. E. corner of Bengal—See Asiatic Annual Register, 1805," (Page-67, History of Bengal, Stewart, 2nd Edition)

উপরিউক্ত গাহড়বাল রাজ্যের ও পৌরাণিক প্রাগজ্যোতিষপুর নামে আখ্যায়িত কামরূপের সীমানা যেহেতু বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদী তথা বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উক্ত স্থানে যেহেতু তুরানী জাতি অর্থাৎ তুরস্ক ও আরব জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু উক্ত স্থানের ব্রহ্মপুত্র নদীর "লোহিত্য" অর্থাৎ লোহিত নাম যে উক্ত তুরস্ক জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায়ই তাহাদের স্বদেশ তুরস্কের হট্রুসাসের পূর্বে উল্লেখিত লোহিত নদীর নাম হইতেই দিয়াছিল তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। কেননা, "নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় আদি ভূমির দেশ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নামে নূতন দেশের নদী প্রভৃতির নাম দেওয়ার রীতি (বা স্বাভাবিক প্রকৃতি) এখনো অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।" (বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-৪৩১, নব্য ভারত, কার্তিক, ১৩১৭ কলিকাতা।)।

www.pathagar.com

এতদ্দেশে বসতি স্থাপনকারী উপরিউক্ত তুরস্ক জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায় এইরূপে ব্রহ্মপুত্র নদীর যে লোহিত নদী নাম দেয় তাহা ব্রহ্মপুত্র নামের অনেক পূর্ববর্তী অতি প্রাচীন নাম। সেই প্রাচীনকালে বাংলাদেশে "পদ্মার তখন অভিস্তত্ব ছিল কিনা সন্দেহ, থাকিলেও ক্ষুদ্র নদী।.....ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ তখন বর্তমান যমুনা দিয়া বহিত না, ঢাকা জেলার পূর্বদিক দিয়া আসিত। ....তখনকার নিম্ন বঙ্গের বড় নদী খুব বড় হইবারই কথা, মোহনার কাছে বোধ হয় উপসাগরের ন্যায় দেখাইত। সাধারণ নৌকায় সর্বত্র যাতায়াত সম্ভবতঃ নিরাপদ ছিল না, সমুদ্র পোতের ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল।" (ফরিদপুরের প্রাচীন তাম্রলিপি, শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৬৬৭, ৬৭০, বঙ্গবাণী, মাঘ দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ১৩৩১-৩২ ষষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ।)। এমতাবস্থায়, ব্রহ্মপুত্র নদী ইহার পূর্ববর্তী "লোহিত নদী" নামে যে খুব বড় নদী ছিল তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়। এই লোহিত নদী ওরফে ব্রহ্মপুত্র নদী অতি প্রাচীন কালে তিব্বতের মধ্যদিয়া চীনদেশের বর্তমানে হোয়াং হো নামে পরিচিত পীত নদীর সহিত যুক্ত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক টয়েনবি ও প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ এইচ. জি. ই. পিলগ্রিম অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিব্বতে এই লোহিত নদী ওরফে ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম "সান পো"। আরবের মেসোপটেমিয়া ৯৬০ হইতে ১১২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দের যে রঙ্গীন নক্ষত্র মানচিত্র চীনদেশের হোপি প্রদেশের সুয়ান হুয়াগণ কমিউনের উপকণ্ঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (পৃষ্ঠা-৩, দৈনিক সংবাদ, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫) উহা যে আরবের মেসোপটেমিয়ার অর্থাৎ বর্তমান ইরাকের বণিক ও নাবিকগণই সমুদ্রপথে বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া বঙ্গদেশের উক্ত লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) পথ ধরিয়া তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীনদেশে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল তাহা ইতঃপূর্বেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রমাণাদি সহকারে উল্লেখিত হইয়াছে।

সমুদ্রপথে চীন দেশে যাওয়ার পথিমধ্যে উক্ত মেসোপটেমিয়ার বণিক ও নাবিকগণ যে বাংলাদেশের উক্ত লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) তীরবর্তী স্থান রায়পুরা, মনোহরদি, শিবপুর, উয়ারী-বটেশ্বর-সোনারগাঁও প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ ও বসতি স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের বর্তমানে অবলুপ্ত লৌহিত্য সভ্যতারও সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। এই ধারণা করা যায় এই সত্য হইতেই যে ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার সঙ্গম স্থল হইতে উত্তরে লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) কাছাকাছি এলাকা জুড়িয়াই জগতের বিস্ময় জগৎ বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল। আর মেসোপটেমিয়ার অর্থাৎ ইরাকের 'মুসল' নামক স্থানের নাম হইতে মসলিন শব্দের উৎপত্তিতেও ধরা পড়ে যে উক্ত মসুলের কারিগররাই

www.pathagar.com

এতদ্দেশে আসিয়া এতদ্দেশে মসলিনের উপযোগী তুলা আবিষ্কার করিয়া সেই তুলার সূতায় মসলিন বস্ত্র তৈয়ার করিয়াছিল। উক্ত মসলিন তাই বাংলাদেশের লোহিত্য সভ্যতার যেমন দান, তেমনি লৌহিত্য সভ্যতার চরম উৎকর্ষতারও প্রমাণ। সুতরাং উক্ত লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) তীর সংলগ্ন ও কাছাকাছি সমস্ত এলাকা জুড়িয়া অনুসন্ধান চালাইলে অবলুপ্ত লোহিত্য সভ্যতার অনেক মূল্যবান নির্দশন যে আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) সংলগ্ন রায়পুরা, মনোহরদি, শিবপুর, উয়ারী ও বটেশ্বর, সোনারগাঁও প্রভৃতি স্থানের মাটিও অনেক প্রাচীন প্লেইসটোসিন যুগের অর্থাৎ দশ লক্ষ বছরের প্রাচীন লালমাটি। "যেখানে যেখানে লালমাটি দেখা যায় সেগুলো উচ্চ ভূমি, আর যেখানে পলি মাটি দেখা যায় সেগুলো নিম্নভূমি।....প্রত্ন তাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষ লাল মাটি এলাকায় বাস করে আসছে। লাল মাটি এলাকার সভ্যতা যে বহু প্রাচীন, তা নিয়ে বাংলাদেশের লোক গর্ববোধ করতে পারে।" (পৃষ্ঠা ৮১, ৮২, ডঃ অতুল সুর, দুই বাংলা কি এক হবে)

বাংলাদেশের সিলেট ব্যতীত আর কোথাও পাহাড় নেই। কিন্তু উক্ত লোহিত নদীর (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর) সংলগ্ন উক্ত রায়পুরা, মনোহরদি ও শিবপুরের লালমাটি এলাকায় ছোট বড় অনেক টিলা রহিয়াছে। এই সমস্ত টিলার মধ্যে খনন কাজ চালাইলে বাংলাদেশের অবলুপ্ত লৌহিত্য সভ্যতার অতি মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। উলেখ্য যে সোমপুর বিহার যাহা বর্তমানে পাহাড়পুর বিহার নামে পরিচিত তাহা পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ একটি টিলা ছিল এবং পরে উহা খননের ফলেই সোমপুর বিহার আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু Who will bell the cat? অর্থাৎ উক্ত খনন কাজ চালাইতে হইলে অনেক অর্থের যে প্রয়োজন হইবে, সে অর্থ যোগাইবে কে? সরকারী আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এইরূপ খনন কাজ চলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সরকার এ বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার, চিন্তা-ভাবনা হীন। আর তাইত আমাদের অতীত গৌরবের লোহিত্য সভ্যতার ইতিহাস থাকিতেও উহা আবিষ্কারের চেষ্টার অভাবে তথা উহার লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অবর্তমানে আমরা ইতিহাস বিহীন একটি অজ্ঞাত পরিচয় জাতিয়রূপে মৃত প্রায় বাঁচিয়া থাকিয়া আজ পর্যন্তও 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় সকলেরই নিন্দার ও করুণার পাত্র হইয়া রহিয়াছি।

একটি দেশের ও একটি জাতির নিজস্ব প্রকৃত ইতিহাসের প্রয়োজন যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা উপলব্ধি করিয়া তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের প্রত্নতাত্ত্বিক

www.pathagar.com

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

"Kamal Ataturk died in 1938. In his will he had bequeathed to the Turqish Historical Society a Trust fund which provided 1,25000 Turkish pounds annually for a systematic program of research in Anatolia. Ataturk may well be considered not only the 'Father of the Turks', but also the Father of a new generation of Turkish scholars." (Page-253, 254, The Secret of the Hittites, C.W. Ceram.)।

তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মত সুবিজ্ঞ দেশ-দরদী নেতা আমাদের দেশে কবে জন্মলাভ করিবেন, যিনি আমাদের অবলুপ্ত লৌহিত্য সভ্যতার আবিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমাদের বাংলাদেশী জাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন। আমাদের যে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন সভ্যতা আছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথিরিয়ান সী-তে উল্লেখিত লৌহিত্য নদীর তীরবর্তী অবলুপ্ত লৌহিত্য সভ্যতার কথায়। বাংলাদেশে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র যেখানে রহিয়াছে সেখানেই তো রহিয়াছে লৌহিত্য নদী অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীই প্রাচীন লৌহিত্য নদী। আর এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ লৌহিত্য নদীর সংলগ্ন রায়পুরা, মনোহরদি, শিবপুর, উয়ারী বটেশ্বর সোনারগাঁও প্রভৃতি স্থানে এ যাবৎকাল অল্প যাহা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই ধারণা করা যায় এতদাঞ্চলে খনন কার্য চালাইলে অবলুপ্ত লৌহিত্য সভ্যতার অতি মূল্যবান প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কৃত হইতে পারে। উপরিউক্ত স্থান সমূহে কিছু কিছু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন যে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সংবাদ ভাষ্য হইতে প্রতিপন্ন হইবে—

"ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার রাজবাড়ী গ্রামের জনৈক ডঃ খালেকুজ্জামানের বাড়ীর কাছে গর্ত খোঁড়ার সময় কয়েক ফুট মাটির নিচে প্রাচীনকালের একটি কুড়াল পাওয়া গেছে। কুড়ালটি ঢাকা যাদু ঘরে রক্ষিত ছাগল নাইয়া থেকে পাওয়া নব্য প্রস্তর যুগের পাথুরে কুড়ালটির সমসাময়িক বলে অনুমান করা যায়। রাজবাড়ী গ্রামটি আদি যুগের প্রত্ন সম্পদে সমৃদ্ধ উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কয়েক বছর আগে উয়ারী বটেশ্বর থেকে প্রচুর লৌহ কুঠার, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, পাথুরে ছুরি, নকশী পাথরের গুটিকা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ও ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮০-তে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় দু'টি প্রবন্ধও ছাপা হয়। আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে এ অঞ্চলে কোন অনুসন্ধান চালানো হয়নি। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে উদ্যোগী হলে উল্লেখিত স্থানগুলো থেকে প্রাচীন যুগের অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে অনেকের ধারণা। (পৃষ্ঠা-১২, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৪ শে জুন, ১৯৮৩; ৯ই আষাঢ়, ১৩৯০)। এতদসম্পর্কে আমাদের সরকার যতশীঘ্র সম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন দেশের জন্য তাহা হইবে ততই মঙ্গল। তাহা না হইলে একটা অজ্ঞাত পরিচয় জাতি হিসাবে মৃতপ্রায় বাঁচিয়া থাকিয়া আমরা সারা বিশ্বের নিন্দাই কুড়াইব এবং সকলেরই করুণার পাত্র হইয়া থাকিব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে স্যার মর্টিমার হুইলার সরকারী সাহায্যে সিন্ধুতে সেখানে এক হাজার মাইল ব্যাপী ষাটটিরও বেশি জায়গা খুঁড়িয়া মহেঞ্জোদারোর ও অন্যান্য স্থানের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেখানে বাংলাদেশেও ব্রহ্মপুত্র নামের লৌহিত নদী বরাবর মাত্র কয়েক শত মাইল ব্যাপী অনুসন্ধান চালাইয়া সম্ভাব্য স্থানে প্রয়োজনীয় খনন কাজ চালাইয়া উপরিউক্ত লৌহিত্য সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য আমাদের বাংলাদেশ সরকার কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন না? আশা করি বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

www.pathagar.com

অধ্যায়-১০
পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনার কালপঞ্জী

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত,—"জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার।........জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ.........." (পৃষ্ঠা-২০, বাংলা ভাষা পরিচয়)। এই স্পষ্ট অর্থের জন্যই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশেরও অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনার একটি কালপঞ্জী এতদস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলিয়া আর্যগণ যে দাবী করিয়া থাকে তাহার মূলে যে কোনও সত্য নাই তাহা নিম্নলিখিত কালপঞ্জী হইতে এবং নিম্ন উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইবে—

"The Indo Aryans claim that they are the most ancient in India, but that claim is false. India has no ancient monuments or relics like Egypt, Babylonia or Assyria......The ancient monuments hitherto discovered in India, do not go beyond the Baddhist era, i.e. the 6th century B.C. (i.e. 500 B.C.) which compared with Babylonian, Assyrian and Egyptian monuments, are but products of yesterday. And yet strange and absurd as it could seem, the Hindus claim to be the most ancient civilized people of the world, more ancient than even the pre-dynestic races of Egypt.......such claim, based as it on mere tradition, and probably kept alive by sentimental vanity and not founded on any tangible proves is rightly dismissed by historians as unworthy of any credence or serious consideration." (Abinash Chandra Das, M.A.B.L.)

অর্থাৎ 'ইন্দো আর্যগণ দাবি করে যে ভারতবর্ষে তাহারাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু সেই দাবি মিথ্যা। মিসর, বেবিলন বা এ্যাসিরিয়ার মত প্রাচীন কীর্তি স্তম্ভ বা ধ্বংসাবশেষ ভারতবর্ষে নাই। এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে সমুদয় কীর্তি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ যুগ ছাড়াইয়া যায় না, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী

www.pathagar.com

(অর্থাৎ ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী হয় না), বেবিলনীয়, এ্যাসিবীয় ও মিসরীয়দের তুলনায় যাহা গতকালের উৎপন্ন মাত্র এবং তবুও যত অদ্ভুত ও অসম্ভবই বোধ হউক না কেন হিন্দুগণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি বলিয়া দাবি করে, এমন কি প্রাক রাজবংশীয় মিসরীয় জাতি অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। এইরূপ দাবী, পরম্পরাগত কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া এবং সম্ভবতঃ ভাবাবেগের অহংকারের দ্বারা লালিত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে বিধায় ঐতিহাসিকদের দ্বারা বিশ্বাসের বা গভীরভাবে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া ন্যায়ত বাতিলকৃত হইয়া থাকে।"

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশের, বাংলাদেশের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনার কালপঞ্জী।

১। ৫০,০০০-১৫,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ—পুরাতন (প্রত্ন) প্রস্তর যুগ (পরে টীকা দ্রষ্টব্য)

২। ১৫,০০০-১০,০০০ ,, — ,, (,,)

৩। ১০,০০০-৮,০০০ ,, — নব্য প্রস্তর যুগ (,,)

৪। ৬,০০০- ,, প্রতিরক্ষার জন্য পাথরের বাঁধ বা টিবি (,,)

৫। ৬,০০০- ,, — কৃষি কার্যের সূচনা (মেসোপটেমিয়া)

৬। ৫,০০০- ,, — কৃষি ভিত্তিক গ্রামের সূচনা (মেসোপটেমিয়া ও মিসরে)

৭। ৪,০০০-৩,৫০০ ,, — সুমেরীয় সভ্যতা (মেসোপটেমিয়া)

৮। ৩,২৫০- ,, — ব্রোঞ্জ সভ্যতা (ঐ)

৯। ৩,০০০- ,, — দিলমুন (অর্থাৎ দ্রাবিড়) সভ্যতা

১০। ৩,০০০- ,, — মিসরীয় সভ্যতা ও লিপিবদ্ধ ইতিহাসের সূচনা (মিসরে)

১১। ২,৫০০- ,, — মিসরীয় পিরামিডের সূচনা

(Page-27, The history of our world, Teachers, Edition, Arthur E. R. Boak)

১২। ২,৪০০ - - মিসর কর্তৃক বাংলাদেশের পুন্ড্র নগরে অভিযান প্রেরণ।

(Page-11, The Periplus of the Erythraean Sea, Translated by Lionel Casson).

১৩। ২,৩০০- ,, — আক্কাদীয় সভ্যতা (মেসোপটেমিয়ায়)

www.pathagar.com

১৪। ২,৩০০- „ — মহেঞ্জোদারো সভ্যতা (সিন্ধুতে)

(---dating from the days of sargon of Akkad about 2300 B. C. Page-214, The Tigris Expedition, Dr. Thor Heyerdahl)

১৫। ২,০০০-১,১০০ „ — হিট্টি সভ্যতা (তুরস্কের বোগোজ কোই)

(The land and People of Turkey, william spencar)

১৬। ২,০০০- „ „ — চীনদেশে ব্রোঞ্জ সভ্যতা

১৭। ১,৮৮৪,- „ „ ,—ইব্রাহিমের দেশ (ইরাক) ত্যাগ

(Sidney Smithi's Hebrew Chronology)

১৮। ১৭৯১-১৫৯১ „ „ ,— বেবিলনীয় সভ্যতা (মেসোপটেমিয়ায়)

১৯। ১৭৯১-১৭৪৯ „ „ - বেবিলনের রাজা হাম্মুরাপ্পা

(Hammurapi,—Page- 67, The history of our world, Teachers, Edition, Arthur E.R. Boak)

২০। ১৭৯১-১৭৪৯ „ „ — হারাপ্পা সভ্যতা (পাঞ্জাবে)

২১। ১৭০০ „ „ — মোজেস (Moses)

২২। ১৫৯১-১০০০ „ „ —ক্যাসাইট সভ্যতা (ইরানে)

২৩। ১৫৭৩ „ „ —মিসরের ফেরাঁও রানী হাৎসেপসুৎ কর্তৃক বঙ্গদেশের কাণ্ডাই ও পুন্ড্র নগরে অভিযান প্রেরণ।

("Keftiu"-"Punt—Pages, 34, 35, The Legacy of Egypt, S. R. K Glanville). "Punt"—Page-323, The Tigris Expedition, Dr. Thor Heyerdahl)

২৪। ১২০০-৭০০ „ „ —এসিরীয় সভ্যতা (মেসোপটেমিয়ায়)

২৫। ১০০০-৫০০ „ „ —পারসিক সভ্যতা (ইরানে)

২৬। ৫০০- „ „ —জরদস্থ্র (Zoroaster) ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব

২৭। ৪৯৯- „ „ — গ্রীক সভ্যতা

২৮। ৪৯০- „ „ — রোমক সভ্যতা

২৯। ৩২৬- „ „ — আলেকজাণ্ডারের ভারতে অভিযান

৩০। ২৬৯-২৩৭ „ „ —অশোকের মৌর্য যুগ

www.pathagar.com

৩১। — যীশু খৃষ্টের জন্ম

৩২। ৫৫০-৬০২- খৃষ্টাব্দে—বাংলাদেশের কৌটালী পাড়ায় আরব বসতি

৩৩। ৫৭০ —" হজরত মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম

৩৪। ৬২২ ,,—হজরত মুহাম্মদের (দঃ) মদিনায় গমন (হিজরত)

৩৫। ৬৩২ ,, —হজরত মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যু

৩৬। ৭১৩-৭১৪ ,, — বাংলাদেশে আরব বসতি

(Page-93, History of Bengal, Vol. I. R. C. Mozumder, 2nd Edn.).

৩৭। ১১৭১-৭২ ,, — বাংলাদেশের পাণ্ডুয়ায় মুসলমান বসতি

৩৮। ১২০৪- ,,— দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীনের নির্দেশে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়।

৩৯। ১৩৩৮-১৫৭৬ ,, —বাংলাদেশে সুলতানী আমল।

৪০। ১৫৭৬-১৭১৭ ,, —বাংলায় মোগল শাসনামল।

৪১। ১৭১৭-১৭৫৭ ,, —বাংলায় নবাবী আমল।

৪২। ১৭৫৭- ,, —পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু

৪৩। ১৭৬৫- ,,— বঙ্গদেশে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ (১২ই আগস্ট)।

৪৪। ১৭৬৫-১৭৮৭ ,,— ফকির মজনু শাহের ইংরেজ বিরোধী ফকির সন্যাসী আন্দোলন।

(Vide-Sannyasi-Fakir Raiders of Bengal, J. M. Ghose)

৪৫। ১৭৭০- ,, — ইংরেজের শোষণে সৃষ্ট বাংলার দুর্ভিক্ষ।

৪৬। ১৮১৮- ,, — হাজি শরিয়তুল্লাহর ইংরেজ বিরোধী ফরাজী আন্দোলন।

৪৭। ১৮৩০-১৮৩১ ,, — সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীরের ইংরেজ বিরোধী বাঁশের কেল্লা

৪৮। ১৮৫৮- ,, — সিপাহী বিদ্রোহ,

৪৯। ১৮৬১- ,, — সিপাহী বিদ্রোহের মত ঘটনা রোধ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট। ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব সৃষ্টি।

www.pathagar.com

৫০। ১৮৬৩- ,, — নবাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠিত।

৫১। ১৮৭১- ,, — আব্দুল্লাহ নামে একজন ওহাবী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নরম্যানকে হত্যা করে (২০ সেপ্টেম্বর)।

৫২। ১৮৭২- ,, —শের আলী খান নামে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত অপর একজন ওহাবী আন্দামান দ্বীপে বড় লাট লর্ড মেয়োকে হত্যা করে (৮ ফেব্রুয়ারি) এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

৫৩। ১৮৮৫- ,, —ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় কংগ্রেস গঠন।

৫৪। ১৮৮৬- ,, —স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স গঠন।

৫৫। ১৮৮৮- ,, —স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন।

৫৬। ১৯০৫- ,, - শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ও পূর্ববঙ্গের অবনতি ও অনগ্রসরতা দৃঢ় করিবার জন্য লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ ভঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন।

"নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠার কারণে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে বিধায় বর্ণবাদী হিন্দু সম্প্রদায় পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা বশতঃ বঙ্গ ভঙ্গ রদ করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলন নামের ছদ্মাবরণে এক সন্ত্রাসী আন্দোলনের সূচনা করে। আর ইহাতেই বর্ণবাদী হিন্দুদের ঘোরতর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুস্পষ্ট বহিঃ প্রকাশ ঘটে। পশ্চিম বাংলা বিধান সভার সদস্য সাংসদ অশোক মিত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত স্বাধীন বাংলা পত্রিকায় একান্ত সাক্ষাৎকারে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেও উপরিউক্ত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মত সর্বনাশ বাঙালীর জাতীয় জীবনে কখনই ঘটেনি। কার্জনের মনে যে

www.pathagar.com

ইচ্ছাই তখন থাকুক না কেন তার সিদ্ধান্ত বাঙালীদের কাছে একটা সুযোগ পৌছে দিয়েছিল। আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বাঙালী মুসলমান সমাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ। তাদের অর্থনৈতিক ভিত এবং শিক্ষার মানকে মজবুত করার সুযোগ। পূর্ববাংলা এবং আসাম আলাদা প্রদেশ হলে বর্ণ হিন্দু জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যাবে। মুসলমানরাও সামাজিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাবে। এই আশংকা হিন্দু সামন্ত প্রভুদের আতঙ্কিত করলো। কার্জনের বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এরাই। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ স্বদেশী আন্দোলনের ফেরে পড়ে বাঙালীর পক্ষে সর্বনাশা ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে অংশ নিলেন। যদি কার্জনের প্রস্তাব কার্যকর হত তবে যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর উদ্ভব হত, এরাই শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসে আবুল হাসেম, শরৎ বোসদের প্রচেষ্টাকে সফল সার্থক করতে পারতেন। কিন্তু সে সম্ভাবনার বীজকে বঙ্গ বিভাগ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।

প্রশ্ন ঃ যদি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে, ৪৭-এ এক অখন্ড সার্বভৌম বাংলা গঠিত হতো (যে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন শরৎ বোস, আবুল হাশেম)—তবে তার চেহারা কেমন হতো বলে আপনার ধারণা?

অশোক মিত্র ঃ আমি ১৯৪৭-এর স্বপ্ন না দেখে ১৯০৫-এর স্বপ্নটাই দেখবো। ১৯০৫-এ যে ভুল করা হয়েছিল ১৯৪৭ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ততদিনে বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে। শেষ অবস্থায় মোড় ফেরানোর চেষ্টাকে আমরা তারিফ করতে পারি অবশ্যই।"

(পৃষ্ঠা-৭, দৈনিক ইনকিলাব. ৩০ শে জুন, ১৯৯৪)।

৫৭। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে—বর্ণ হিন্দুদের উপরিউক্ত স্বদেশী তথা সন্ত্রাসী আন্দোলনের মোকাবেলায় ঢাকায় স্যার সুলিমুল্লাহর

www.pathagar.com

উদ্যোগে গঠিত হয় মুসলিম লীগ। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাও বাঁধে।

৫৮। ১৯০৯- „ —নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

৫৯। ১৯১০- „ —হিন্দু সভা (পরে হিন্দু মহাসভা নামে) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬০। ১৯১১- „—দিল্লী দরবার ও বঙ্গ ভঙ্গ রদ। চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত যুক্তবঙ্গের সীমানা নির্ধারিত হয় এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

৬১। ১৯১৪-১৯১৮ „ —প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ

৬২। ১৯২১- „ —ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- প্রতিষ্ঠা

৬৩। ১৯২৪- „ —বাংলাদেশে প্রথম হিন্দু মহাসভা গঠন

৬৪। ১৯২৬- „ —কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা

৬৫। ১৯৩৭- „ — সাধারণ নির্বাচনে শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির জয়লাভ ও মন্ত্রিসভা গঠন।

৬৬। ১৯৩৯- „ —দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

৬৭। ১৯৪০- „ —মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ

৬৮। ১৯৪৬- „ — সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় ও মন্ত্রিসভা গঠন

৬৯। ১৯৪৬- „ —মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের মিছিলে বর্ণবাদী হিন্দুদের অতর্কিত হামলায় যে দাঙ্গা বাধিয়া যায় তাহাতে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের মৃত্যু হয় অনেক বেশী। (১৬ই আগস্ট)।

৭০। ১৯৪৭- „ —"স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ দুই ভাগ হয়। এক ভাগ হয় হিন্দু প্রধান ভারত রাষ্ট্র আর এক ভাগ হয় মুসলমান প্রধান পাকিস্তান রাষ্ট্র। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশও দুইভাগ হয় হিন্দুদের ইচ্ছায়। এক ভাগ হয় হিন্দু প্রধান ভারতের অংশ পশ্চিম বঙ্গ। আর দ্বিতীয় ভাগ হয় মুসলমান প্রধান পাকিস্তানের অংশ পূর্ব বঙ্গ। এইরূপে দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ, বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ এক প্রকার দল

www.pathagar.com

বাঁধিয়া পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া যায়। অনেকে দেশ ভাগকেই হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগের জন্য দায়ী করিলেও দেশ ভাগ যে এই জন্য দায়ী নহে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

"মাইগ্রেসনের কথা আমরা এখানে জোর গলায় বলে থাকি বটে, কিন্তু সেটাও প্রধানতঃ রাজনৈতিক ঝাঁঝ আর ঝোঁক থেকে। আসলে অলক্ষ্যে একটা স্রোত ওই বাংলা (অর্থাৎ পূর্ব বাংলা) থেকে এই দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে) দীর্ঘ কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে কলকাতার যবে পত্তন হল তবে থেকে। উচ্চ বিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের একটি ভাগ এদিকে (অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে) আসতে শুরু করেছিলেন বাস্তু ত্যাগ করে যেন কোনও মাধ্যাকর্ষণের (অর্থাৎ কলকাতায় ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার) টানে জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতির প্রয়োজনে। পার্টিশন সে প্রবাহকে আরও খরস্রোত করেছিল, এই মাত্র।" (বাংলাদেশ থেকে ফিরে, সন্তোষ কুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা-১১৭৩, সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা, ২২ শে জানুয়ারী, ১৯৭২)।

৭১। ১৯৪৮- ,, —বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা (১১ই মার্চ)

৭২। ১৯৫২- ,, —বাংলা ভাষাকেও উর্দ্দুর পাশাপাশি স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান, পাকিস্তানে।

৭৩। ১৯৭১- ,, —পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জয় লাভ

৭৪। ১৯৭১- ,, —স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় (১৬ই ডিসেম্বর)।

৭৫। ১৯৭৫- ,,— সিপাহী জনতার বিপ্লব ও স্বাধীনতা-সংহতি দিবস (৭ই নভেম্বর)।

উপরের কালপঞ্জীতে উল্লেখিত কিছু কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত টীকাঃ-

১। ৫০,০০০-১৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ—পুরাতন (প্রত্ন) প্রস্তর যুগ। আরবে ৫০,০০০ বৎসরের প্রাচীন হস্ত কুঠার প্রাপ্তি—

www.pathagar.com

(The earliest phase of the old stone age, the lower palaeolithic, extends from well before 2,000,000 years to about 80,000 years ago---the middle palaeolithic 80,000 -30,000 years ago----the upper palaeothic. 30,000-12,000 years ago) (Page-21, The Archaeology of Mesopotamia, From the old stone age, Thomas and Hudson, 1978).

Extending south east from the Syrian desert, the worlds largest peninsula (about one million square miles) is surrounded by the Red Sea on the south east, the Gulf of Aden and the Arabian Sea on the south, and by the Gulf of Oman and the Persian Gulf on the north east. The peninsula has easy excess to Africa and Asia along coasts where communities have been estalished since pre historic times, cut off from the sea by mountains on three sides, the interior of the great plateau is remarkable for its aridity and barrenness. Archaeologists have not had an easy task in the Arabian peninsula, specially since local rulers until recently have seldom been interested in digging up pre-Islamic sites. In the south and east however, excavators have been able to reveal evidence of palaeolithic or old stone hunters. Flint tools and hard axes have been found in central Arabia, and desert travelers have reported seeing Neolithic and Bronze Age artifacts. The range of time indicated by these finds is highly speculative. A hand axe of Acheulean style may be 50,000 years old, while the early Bronze Age on Bahrain in the Persian Gulf can be dated from around 3000 B. C. (Page-19, The Arabs, People and Power, Prepared by the Editors of Encyclopedia Britanica, Editor-Frank Gibney andex-Editor—Richard Pope, 1978)

২। ১৫,০০০-১০,০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ—পুরাতন (প্রত্ন) প্রস্তর যুগ B. C. 15000—First immigrants from Asia (i.e. Arbia of Asia) to cross Behring straits.
(Pears cyclopaedea, Editor—L. Mary Barker and others.

৩। ১০,০০০-৮০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ—নব্য প্রস্তর যুগ By 10,000 B. C. villages and farms had begun to appear to the north of the barrens, stretching in the famous Fertile crescent from the Euphrates valley to Syria and Jerusalem and beyand. (Page-20, The Arabs, People and Power, Editor—Frank Gibney).

B. C. 8000- Neolithic revolution in Middle East. Agricultural settlements (in Jericho of Palestine). Settled way of life leading eventually to such skills as weaving, metallurgy, invention as ox drawn plough, wheeled cart. (Pears cyclopaedea, Ibid)

৪। ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ—প্রতিরক্ষার জন্য নির্মিত পাথরের বাঁধ বা ঢিবি

Cairn like mounds—stones losely piled over a crude oblong burial space—have been reported from all over the mainland (Arabia), but only a

www.pathagar.com

few have been investigated. Some of these mounds can be dated to 6000 B. C. (Page-19, 20, The Arabs, People and Power, Editor—Frunk Gibney.

৭। ৪০০০-৩৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ—সুমেরীয় সভ্যতা (মেসোপটেমিয়ায়)

Sumerians in sumar (lower Mesopotamia) were the pioneers in developing. Mesopotamian civilization. This way of life was adopted by the Akkadians----- of upper Mesopotamia who became their political rivals. (Page-36, The history of our world, Teachers, Edition, Edited by Arthur E. R. Boak and others).

অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার ক্রম উন্নয়নে সুমেরীয়গণই ছিল অগ্রদূত। আক্কাদীয়গণ ছিল তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। সুমেরীয়গণ কোথা হইতে কেমন করিয়া মেসোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায়—

"The Sumerians do not have to come back to witness to their origins. Their words are still with us. They left their written testimony. Their tablets record how they came and from where--- They came by ship. They came sailing in through the gulf and in their earliest works of art they illustrated the kind of water craft that brought them. They came as mariners to the coast of the twin-rivers valley where they founded the civilization which during the ensuing millennia was to affect in one way or another every corner of our world. o

Their written testimony seems at first to open the door to another mystery. Where is the eastern land of Dilmun from which the sea faring Sumerians said they came? (Page-4, 5, The Tigris Expedition, Dr. Thor Heyerdahl.) অর্থাৎ সুমেরীয়দিগকে তাহাদের মূল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। তাহাদের উক্তি সমূহ এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে। তাহারা তাহাদের প্রামাণিক সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। তাহাদের ফলকগুলিতে নথিভুক্ত রহিয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়াছিল।

.........তাহারা সমুদ্রগামী জল-যান যোগে আসিয়াছিল। তাহারা উপসাগর দিয়া পাল তুলিয়া বা পালবিহীন জল-যান যোগে আসিয়াছিল এবং যে প্রকার জল-যান যোগে তাহারা আসিয়াছিল তাহাদের প্রাচীনতম চিত্র-কর্মে তাহারা তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সমুদ্রগামী নাবিকরূপে তাহারা দুই নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় আসিয়াছিল যেখানে তাহারা সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল যাহা পরবর্তী হাজার বৎসরের মধ্যে একভাবে না একভাবে আমাদের পৃথিবীর প্রত্যেক দিককে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাহাদের লিখিত প্রামাণিক সাক্ষ্য মনে হয় প্রথমেই অপর একটি রহস্যের দরজা খুলিয়া দেয়। দিলমুনের পূর্ব দেশ কোথায় যে স্থান হইতে সমুদ্রগামী সুমেরীয়গণ আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা বলে।

উপরের এই উদ্ধৃতির ভাষ্যে সুমেরীয়দের জল-যানের ব্যাখ্যার যে চিত্র-কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই জল-যানের চিত্র-কর্ম কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও জানিতে পারা যায়—"Reed ships with the sun god, bird men and other dities

www.pathagar.com

on board and sometimes with deck structures, horned cattle, and other evidence of major dimensions are extremely common on the oldest sumerian seals and occasionally occur as far up the twin rivers (Euphrates and Tigris rivers) as the Hittite territory of southern Turkey.(Page-10, Early man And The Occan, Dr. Thor Heyerdahl). অর্থাৎ জল-যানের উপরে সূর্য দেবতা, পক্ষী মানব এবং অন্যান্য দেবতাসহ এবং কখনও পাটাতনের গঠন প্রণালী, শিংযুক্ত গবাদি পশু তথা অন্যান্য বড় মাপের নিদর্শনসহ নল খাগড়ার জল-যান প্রাচীনতম সুমেরীয় সীলমোহরে খুবই সহজলভ্য এবং এমনকি (ইউফ্রেডিস ও তাইগ্রিস) দুই নদীর উপরের দিকে তুরস্কের হিট্টিদের সীমানা পর্যন্তও সাময়িকভাবে দৃষ্ট হয়।

এই উদ্ধৃতির পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির ভাষ্যে আরও যে উল্লেখিত হইয়াছে যে সুমেরীয়দের "লিখিত প্রামাণিক সাক্ষ্য মনে হয় প্রথমেই অপর একটি রহস্যের দরজা খুলিয়া দেয়। দিলমুনের পূর্বদেশ কোথায় যে স্থান হইতে সমুদ্রগামী সুমেরীয়গণ আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা বলে। সুমেরীয়দের উল্লেখিত দিলমুন যে কোথায় তাহা নিম্নে বর্ণিত ভাষ্য হইতে সহজেই ধরিতে পারা যায়—

"ডক্টর আব্বাস ফারুকীর The Bahrain Islands" পুস্তকে দেখা যায় আরব ইতিহাস অনুসারে দিলমুনরা খামুদ গোত্রের মানুষ। বাবিলনীয় উৎকীর্ণ লিপিতে তাহাদের তিলমুন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিলমুনদের সুমেরীয় নাম নিতুক-কি তবে নিতুক-কির সহিত সুমেরীয়ায় বাহরাইনের অধিবাসীরা দিলমুন নামেও অভিহিত হইত। তখনকার দিনে বাহরাইনের রাজধানী ছিল তিলমুন।" (পৃষ্ঠা-২৩, বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান)।

এই উদ্ধৃতির ভাষ্য হইতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানা যাইতেছে, সুমেরীয়রা উপরে উল্লেখিত যে দিলমুনের কথা বলিয়াছে সেই দিলমুন ছিল বাহরাইনের রাজধানী, বাবিলনীয় উৎকীর্ণ লিপিতে যাহাকে তিলমুন বলা হইয়াছে। আরও জানা যাইতেছে যে সুমেরীয়ায় বাহরাইনের অধিবাসীরাও বাহরাইনের রাজধানী তিলমুন বা দিলমুন-এর নামানুসারে দিলমুন বলিয়াও অভিহিত হইত। অর্থাৎ সুমেরীয়রা দিলমুন হইতেই প্রথমে মেসোপটেমিয়ায় আগমন করিয়া থাকিলেও দিলমুনের অধিবাসীদের সহিত তাহারা একই গোত্রের মানুষ ছিল না বলিয়াই দিলমুনের সহিত সুমেরীয়দের পার্থক্য অর্থাৎ ভিন্নতা বুঝাইবার জন্যই বাহরাইনের অধিবাসীদিগকে দিলমুন নামে অভিহিত করিত। তাহা না হইলে বাহরাইনের দিলমুনদের পূর্বেকার অধিবাসী হিসাবে সুমেরীয়রা নিজদিগকেও দিলমুন নামে অভিহিত না করিয়া শুধুমাত্র বাহরাইনের দিলমুনের স্থায়ী অধিবাসীদিগকেই দিলমুন নামে অভিহিত করিবে কেন। ইহা ব্যতীত আরব ইতিহাসেও দিলমুনদিগকে যে খামুদ গোত্রের মানুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহাতেও সুমেরীয়দের সহিত দিলমুনদের পার্থক্য সূচিত হয়। উপরন্তু বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুন নামের সহিত দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তামিল নাম শব্দের যে ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহাতে সহজেই ধরা পড়ে যে দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তামিলগণ বাহরাইনের দিলমুন ও তিলমুনদেরই অধস্তন বংশধর। আর দামিল বা তামিলদের ভাষাও যেহেতু মূলতঃ সেমিটিক বলিয়া The Indian History congress ও ভারতীয় ইতিহাস কর্তৃক প্রকাশিত এবং কে, এ, নীলকান্ত শাস্ত্রীয় সম্পাদিত "Comprehensive History of India, Vol. II (325 B. C.—A. D. 300)" গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭১ পৃষ্ঠায় Frederick Bodomer-এর Loon of Languages গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

বরাত দিয়াও বলা হইয়াছে আর বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনরাও যেহেতু সেমিটিক জাতিরই একটি গোত্র সেহেতু দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তামিলরা যে বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনের অধিবাসীদেরই অধস্তন পুরুষ তাহা অধিকতরভাবেই প্রতিপন্ন হয়। আর দাক্ষিণাত্যের দামিল বা তামিলদের নাসিকার প্রশস্থ অগ্রভাগ দৃষ্টে ধারণা হয় যে তাহাদের মূল পূর্ব পুরুষ বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনদের নাসিকার অগ্রভাগও প্রশস্ত ছিল। তাই আরও ধারণা হয় যে বাহরাইনের দিলমুন বা তিলমুনরা হয়ত আদিতে আরব ও আফ্রিকার একটি সংমিশ্রিত জনগোষ্ঠী বা গোত্র ছিল।

পক্ষান্তরে, সুমেরীয়রা যে সম্পূর্ণরূপেই একটি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আরব জনগোষ্ঠী বা গোত্রের মানুষ ছিল তাহা ঐতিহাসিক Smith-এর নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে—

"Physical anthropologists seem united in treating the extant skulls of early Sumerians as being close to modern Arab type." অর্থাৎ শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানীগণ প্রাচীন সুমেরীয়দের অদ্যাপি বর্তমান মাথার খুলি, আধুনিক আরব জাতির নিকটবর্তী বিবেচনা করিতে ঐকমত্য পোষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রাচীন সুমেরীয়রা যে প্রকৃতপক্ষেই নির্ভেজাল বিশুদ্ধ আরব জাতীয় মনুষ্য সম্প্রদায় ছিল তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারা যায়। নিম্নবর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে— "More Sumerian blood probably runs in the veins of these marsh dwellers than any other Arab tribe." (Page-3, The Tigris Expedition, Dr. Thor Heyerdahl).

(৮) ৩২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ- ব্রোঞ্জ সভ্যতা।

৩২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ৯ ভাগ তাম্র ও ১ ভাগ টিনের মিশ্রণে সুমেরীয়গণ ব্রোঞ্জ ধাতু আবিস্কার করে বলিয়া অনেকের ধারণা। তাহাদের তৈয়ারী বাসনপত্র ও ভাস্কর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের সময়ে ধাতু বিদ্যায় তাহারা যেমন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল তেমনি শিল্প কলার ক্ষেত্রেও উচ্চ স্তরের দক্ষতা সম্পন্ন ছিল। কারিগর হিসাবে তাহারা এতই দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল যে সেই দক্ষতার গুনে তাহারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারিয়াছিল। ফলে, "উর" এবং "উরুক" নামে তাহাদের দুইটি সুমেরীয় বন্দর তৎকালীন পৃথিবীর বিখ্যাত ও সর্বপেক্ষা বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রেও পরিণত হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে কি পদ্ধতিতে ব্রোঞ্জ গলাইতে পারা যায়, বিশুদ্ধ করা যায় ও শক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিগুলিতে তাহারা অত্যন্ত কৃতিত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল বিধায় সমগ্র পৃথিবীতেই প্রচুর ধাতুর প্রচলন হইতে পারিয়াছিল। ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে মিসরে যে ব্রোঞ্জ ধাতুর প্রচলন হইয়াছিল তাহা প্রস্তুত করিবার জ্ঞান মিসরীয়গণ সুমেরীয়দের নিকট হইতেই অর্জন করিয়াছিল। ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে চীন দেশে যে ব্রোঞ্জের প্রচলন হইয়াছিল তাহার জ্ঞান ও চীন সুমেরীয়দের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশেও প্রত্ন তাত্ত্বিক খননের ফলে যে সমস্ত ব্রোঞ্জের বাসনপত্র ও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যেমন করিয়াই হউক বাংলাদেশের সহিত ও সুমেরীয়দের সংযোগ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যায়।

(৯) ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ-দিলমুন (দ্রাবিড় সভ্যতা)।

এতদ্বিষয়ে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে "দ্রাবিড় জাতির রহস্য" শিরোনামে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

(৯২ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ গান ও দোহার আলোচনায় উল্লেখিত)

পরিশিষ্ট

(বঙ্গবাণী, ৪র্থ বর্ষ, পৌষ ১৩৩২, পৃষ্ঠা-৬২২)

১। বৌদ্ধগান ও দোহা

আলোচনার ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কয়েক বৎসর হইল নেপাল হইতে খানকতক পুঁথি আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; উহার প্রথম খানার নাম চর্য্যাচর্ষ বিনিশ্চয়, দ্বিতীয়ের নাম দোহাকোষ ও তৃতীয়ের নাম ডাকার্ণব। শাস্ত্রী মহাশয় ডাকার্ণব খানির ভাষা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ও অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; কাজেই ঐ বই সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি চর্য্যাপদগুলির নাম দিয়াছেন বৌদ্ধগান, আর ঐ বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ বই দুইখানির শিরোনামের উপরে মলাটের বাহিরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, ঐ দুইখানি বই "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষায়" লিখিত। চর্য্যাপদ ও দোহা বৌদ্ধদের রচনা কি না, উহা হাজার বছরের পুরান কিনা, আর উহার ভাষা বাঙ্গলা কিনা, এ কয়েকটি কথাই নিপুণ বিচারে স্থির করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হইয়াছে শাস্ত্রী মহাশয় সেইরূপ নিপুণ বিচার করেন নাই। ভাষাতত্ত্বের ও এক সময়ের সমাজের সামাজিক অবস্থার বিচারের জন্য ঐ রচনাগুলোর আলোচনার প্রয়োজন আছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনই এই আলোচনার লক্ষ্য।

রচনাগুলির বিশ্লেষণের ও বিচারের আগে দেখা উচিত যে "পাঠ" ঠিক আছে কিনা। ছাপার অক্ষরে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই; পণ্ডিত হর প্রসাদ মূল পুঁথিগুলি নিজের কাছে রাখিয়া অন্যের বিনা সাহায্যে উহাদের সম্পাদন ও ছাপা শেষ করিবার পর পুঁথিগুলি নেপালে ফেরৎ দিয়াছেন। সম্পাদক নিজে যত বড় পণ্ডিত হইলেও এই সকল পুঁথি অন্য জন কতক পণ্ডিতের পরীক্ষা ও বিচারের অধীন করা উচিত ছিল ; অন্য কোন উপায়ে পাঠের বিশুদ্ধি ও গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্থির হয় না। পণ্ডিত মহাশয় যে অভ্রান্ত সম্পাদক নন, তাহার পরিচয় তাহার এই গ্রন্থেই অনেক পাওয়া যায়, ঐ ত্রুটির অল্প একটু পরিচয় দিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, অবিচলিত বিশ্বাসে রচনাগুলির পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া ধরা অসম্ভব।

রচনাগুলির ছন্দ, রাগ বা সুর ও টীকায় অবলম্বিত পাঠ ধরিয়া কেমন করিয়া অনেক স্থলে ছাপা পাঠের ভুল ধরিতে পারা যায়, তাহা দেখাইবার আগে একটা

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি যে, যেখানে হয়ত মূল পাঠ ছাপিতে ভুল হয় নাই, সেখানেও কিভাবে পণ্ডিত মহাশয় এক শব্দের অক্ষর অন্য শব্দের গায়ে জুড়িয়া পাঠের ও অর্থের গোল ঘটাইয়াছেন। যে প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে (বাঙ্গলা বলিলাম না) দোহাকোষ রচিত, উহাতে খাঁটি সংস্কৃতের অনুরূপ তৃতীয়া বিভক্তিতে করণ কারকের পদ আছে মনে করিয়া পণ্ডিত মহাশয় যেখানে 'যেন' পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন অতি বিস্ময়ে সে স্থানটি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, তিনি অপভ্রংশের 'যে' শব্দটির গায়ে পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষর 'ন'টি জুড়িয়া 'যেন' সৃষ্টি করিয়াছেন, ও 'নভজ্জলু' শব্দটিকে 'তজ্জলু' করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় টীকায় পাইয়াছেন যে সেখানে 'বৃষ্টি'র কথা আছে ; তাই তাহার করণ কারকের 'যেন' বজায় রাখিয়া পরিশিষ্টের দুরূহ শব্দের মধ্যে 'বৃষ্টি' অর্থে 'ভজ্জলু' লিখিয়াছেন; 'নভের জল' বুঝিলে শব্দটা কঠিন মনে হইত না। সম্পাদক একদিকে পুঁথি পড়িয়াছেন অসাবধানে ভুল করিয়া, আর অন্য দিকে সেই ভুল পাঠের ভিত্তিতে প্রাচীন প্রাকৃতের ব্যাকরণ সম্বন্ধে সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অন্যের দৃষ্টির অগোচরে রাখিবার আগ্রহে সম্পাদক যে কত গোল করিয়াছেন, তাহার অনেক পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে।

এক শ্রেণীর সহজিয়ারা তাহাদের গুপ্ত সাধনের যে পদ্ধতি বা আচরণের রীতি চর্য্যাপদ নাম দিয়া রচিয়াছিল, সেই রচিত পদগুলি এক একটি রাগিনীর সুরে, হিন্দীতে পরিচিত চতুস্পদী বা চৌপাই বৃত্তে পাওয়া যায়। টীকাতে অতি স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, চর্য্যার গানগুলি চতুস্পদী বা চৌপাই ; বিশুদ্ধ হিন্দী চৌপাই রচনার অনুরূপে যে, পদ্যটির প্রথম চারি ছত্র হইয়াছে প্রথম ধুয়ার পদ, ও পরবর্তী অংশের প্রতি দুই ছত্রে এক একটি পদ হইয়া মোট দশ ছত্রে পদ্যটি রচিত হইয়াছে, তাহা টীকাকার স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতে ভুলেন নাই। চর্য্যা সংগ্রহের মধ্যে দশম গানটিতে আছে ১৪ ছত্র ও বাইশের গানটিতে আছে ১২ ছত্র ; উহাতে পদ সংখ্যা হইয়াছে—যথাক্রমে ৭ ও ৬। চৌপাই যখন হিন্দী রচনাতে একটা বাঁধা কাঠামে দাঁড়াইয়া ছিল, তখন চৌপাই ধরন বজায় রাখিয়া চারিটি পদের অধিক পদ বসাইবার পক্ষে বাধা ছিল না। এই চৌপাই, বাঙ্গলা রচনার আমূল ইতিহাসে একেবারে অজ্ঞাত। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা নামে পরিচিত কোন প্রাচীন বা আধুনিক রচনায় ঐ চৌপাই ধরন পাওয়া যায় নাই।

সে যাহাই হউক, উক্ত চৌপাই ধরন ও বৃত্ত, ও তাহাদের সঙ্গে গানে গানে নির্দিষ্ট রাগিনী বা সুর ধরিলে ছন্দের হিসাবে সহজে পাঠ বিশুদ্ধ রাখা যায়। হয়ত গানে যে সকল সুর নির্দিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কি ধরনে চৌপাই পড়িতে হয়, তাহা পণ্ডিত সম্পাদক মহাশয়ের জানা নাই ; তিনি যদি খাঁটি হিন্দীওয়ালাদের কাছে ঐ সকল সুরে পদ্যের আবৃত্তি শুনিতেন, তবে পাঠ

www.pathagar.com

মিলাইবার সময় অনেক ভুলের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু তিনি বিনা বিচারে জিনিষটি মনে কিরয়াছিলেন খাঁটি বাঙ্গলা, তাই বাঙ্গলা ছন্দের বাহিরের কিছু চর্য্যাপদগুলিতে আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। এ সঙ্গে একথাটাও বলিয়া রাখি যে, চৌপাই এর মত দোহাও বাঙ্গলার বাহিরের হিন্দি সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রচনার কাঠাম।

গ্রন্থে প্রকাশিত প্রথম গানটি (কায়া তরুবর ইত্যাদি) রচনার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়িলে যে উহা একালের খাঁটি হিন্দি ছন্দে ও ধরণে দাঁড়ায়, তাহা আমরাও আবৃত্তি করিয়া দেখাইতে পারি। ছন্দের দিকে অতি অল্প মাত্র দৃষ্টি দিলেও সম্পাদক দেখিতে পাইতেন যে, প্রথম গানটির সপ্তম ছত্রকে তিনি যত দীর্ঘ করিয়াছেন, তাহা করা একেবারে অসম্ভব। তিনি যদি ঐ বেখাপ্পা দীর্ঘ চরণটির শুদ্ধতা রাখিবার জন্য টীকার দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি দিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন, “পাটের” শব্দটি কিছুতেই ঐ চরণে স্থান পায় না। “পাটের” উঠিয়া গেলে সারা গানটির মধ্যে এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় না, এমন একটি বিভক্তি পাওয়া যায় না, যাহাকে বাঙ্গলা বলিয়া দাবি করা চলে। যদি কেহ বলেন যে, এখনকার বাঙ্গলার সঙ্গে না মিলিলেও হয়ত বা এক সময়ে ঐরূপ শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতি বাঙ্গলায় ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে এখানে তর্ক করা চলে না ; তবে এইটুকু এখানে বলিয়া রাখি,—যদি একজন হিন্দিওয়ালা ও বাঙ্গলাওয়ালার সঙ্গে এই গানটির দাবি লইয়া মোকদ্দমা ওঠে তবে বিচারক কাহার পক্ষে ডিক্রি দিবেন? একজন দেখাইবেন যে, উচ্চারণের ধরণে, ছন্দে ও ভাষায় একালের হিন্দির সঙ্গে মিল অত্যন্ত অধিক, আর অন্য ব্যক্তি দুই একটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিবেন যে, হয়ত বা এক সময়ে তাহার ভাষায় ঐ ধরনের প্রাচীন রূপ ছিল। বইখানি যদি বাঙ্গালী পণ্ডিত আনিয়া না ছাপিতেন, তবে হয়ত এই মোকদ্দমাই দায়ের হইত না।

এ সকল কথা ভাষার বিচারের সময় হইবে ; এখানে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কেবল এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা করা গেল যে, সম্পাদক মহাশয় নিপুণভাবে রচনার পাঠ ঠিক করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যেরূপ অসাবধানে পুঁথি পড়িয়াছেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে একথাও বলা শক্ত যে, তিনি মূলের অনেক অক্ষর যথার্থভাবে পড়িয়া ছাপাইয়াছেন কিনা। মূল পুঁথি মিলাইয়া পাঠ ঠিক করিবার পথে সম্পাদক মহাশয় কঠিন বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাঁহার পাঠও পুরা বিশ্বাসে অবলম্বন করা আশঙ্কাজনক। কাজেই প্রত্যেকটি গান সযত্নে বিশ্লেষণ করিয়া টীকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব পাঠ ঠিক করিতে হইবে।

www.pathagar.com

পণ্ডিত হরপ্রসাদের ত্রুটি ধরিয়া সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আমাদের উদ্দেশ্য তাঁহার সংগৃহীত রচনাগুলির যথার্থ পরিচয় দেওয়া। তবে তিনি রচনাগুলির সম্বন্ধে যে ভুল মন্তব্য ও ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অল্পের মধ্যে দেখাইয়া দেওয়া উচিত ; সম্পাদকের উক্তির দিকে অধিক দৃষ্টি দিলে একদিকে বৃথা বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতে পারে, আর অন্যদিকে কোলাহলের চাপে আসল কাজটা ঢাকা পড়িতে পারে।

একদিকে পাঠ ঠিক না করিলে খাঁটি অর্থ বোঝা যায় না, আবার অন্যদিকে এই রচনায় যে শ্রেণীর সাধনার পদ্ধতি আছে, সেই শ্রেণীর ধর্ম্মমত জানা না থাকিলে অর্থ-বোধ হওয়া অসম্ভব। উদ্দিষ্ট ধর্ম্মমতের সহিত পণ্ডিত সম্পাদকের পরিচয় থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; এই জন্য অনেক ব্যাখ্যা দূষিত হইয়াছে। অতি স্পষ্টভাবে এই ধর্ম্মমতের পরিচয় দেওয়াও বড় সম্ভব নয় ; কেন, তাহা বলিতেছি। এই সাহিত্যে আছে একশ্রেণীর অবধূত-অবধূতিকাদের গুপ্ত সাধনের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া ; এ যুগের বিচারে সে সকল কথা অতিশয় অশ্লীল, জঘন্য ও কুৎসিৎ ; সেকালের ভদ্র বিচারেও সেইরূপই ছিল। পাঠকেরা যদি কেবল প্রকাশিত টীকাখানির দিকে মনোযোগ দেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, আসল কথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য রচনায় অনেক চেষ্টা হইয়াছে ও সেই জন্য টীকাকার ভাষাকে বলিয়াছেন সন্ধ্যাভাষা। টীকায় (মূল পদেও বটে) বলিয়া দেওয়া আছে যে, খাঁটি পদ্ধতি গুরুর কাছে শিখিতে হইবে ও ঐ পদ্ধতির কথা সহজিয়া সম্প্রদায়ের অমুক অমুক গ্রন্থে আছে। এমন জিনিসের খোলা ব্যাখ্যা এ পত্রিকায় বা কোন পত্রিকায় ছাপা চলে না; তবুও ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের খাতিরে পদগুলোর অর্থের কিছু কিছু আভাষ দিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে পণ্ডিত হরপ্রসাদের সমালোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়, আর এই জন্য তাঁহার ত্রুটি দেখাইবার প্রয়োজন যে, পাঠকেরা তাঁহার মন্তব্য ও ব্যাখ্যার দিকে একেবারে দৃষ্টি না দিয়া সংগৃহীত সাহিত্যটি বুঝিতে চেষ্টা করেন। রচনাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের সময়ে উহাদের রচনা-কাল ও ভাষার প্রকৃতি কি, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ যে বিনা বিচারে চর্য্যাপদগুলিকে ও দোহা-কোষ দুইখানিকে একই হাজার বছরের আগেকার বাঙ্গলা ভাষা বলিয়াছেন, সেই উক্তিটি ধরিলেই সম্পাদকের বিচার-ক্ষমতার অভাব স্পষ্ট দেখা যাইবে। উদ্দিষ্ট সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গলাই হউক আর যাহাই হউক, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে যে দোহা কোষের ভাষা বহু পরিমাণে ভিন্ন, ইহা একজন সাধারণ প্রাকৃতজ্ঞ পাঠকও দেখিতে পাইবেন ; যে দুইখানি দোহাকোষ

www.pathagar.com

সংগৃহীত আছে উহারও একখানি যে অপরখানি হইতে ভাষার হিসাবে কিছু ভিন্ন, তাহাও সহজে অনুমেয়। হইতে পারে প্রাচীন পূর্ব্বমাগধী ভিন্ন ভিন্ন যুগে যেরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা দোহাকোষ দুইখানিতে ও চর্য্যাপদগুলিতে ধরিতে পারা যাইবে ; সে বিচার পরে হইবে। এখানে কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, দোহাকোষের ভাষা ও চর্য্যাপদগুলির ভাষা কিছুতেই এক যুগের এক সময়ের একটি ভাষা নয়, সে যুগ হাজার বৎসরেরই হউক আর যাহাই হউক। পণ্ডিত হরপ্রসাদ রচনাগুলির ভাষা ধরিবার জন্য প্রাচীন প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশের বিচার করেন নাই; শুধু তাহাই নহে, ঐ রচনার মধ্যে নেপালী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কোন প্রাদুর্ভাব আছে কিনা, তাহাও ব্যাকরণের পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। এক স্থানে "গাইড়" ও "শুনাইড়" শব্দ ধরিয়া বলিয়াছেন যে হয়ত উহা ওড়িয়া ; তাহা আদপে সত্য নয়। ওড়িয়ার ঐ শ্রেণীর ক্রিয়া পদের "ল" কখনও "ড" উচ্চারিত হয় না। যেখানে যথার্থই ওড়িয়া প্রভৃতির প্রাধান্য আছে, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই ; হয়ত ওড়িয়ার মত অন্য প্রাদেশিক ভাষা না জানার দরুন তুলনা করিয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। পাঠকেরা দেখিতেছেন যে, নানাদিকের নানা বিচারে রচনাগুলোর বয়স, ভাষা ও রচনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিপুণ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

www.pathagar.com

২। চর্য্যার ও দোঁহার রচয়িতাদের পরিচয়

[শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই প্রবন্ধগুলির রচনায় যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন,—তিনি যে পদ্ধতিতে বৌদ্ধগান ও দোঁহা বইখানির সকল রচনার বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব ; আমি এ বিষয়ে সুধী শীল মহাশয়ের নিকটে ঋণী, কেবল তাহাই জানাইতেছি।]

দোঁহাগুলির এক ভাগের নাম সরহ বা সরোজবজ্র, আর অন্য ভাগের লেখকের নাম কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু। চর্য্যা অংশের ৫০টি কবিতার মধ্যে ২২, ৩০, ৩৮ ও ৩৯ এই চারিটি কবিতার লেখকের নাম সরহ, আর ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫ এই বারটি কবিতার লেখকের নাম কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্য। দোঁহার সরহ ও কাহ্নু চ[illegible]পদের সরহ ও কাহ্নু হইতে অভিন্ন কিনা, তাহার বিচার হইবে পরে ; [illegible] বলিয়া রাখি যে, প্রাচীন টীকাকারের মতে তাঁহারা এক ও অভিন্ন। একই সরহ ও কাহ্নু কি করিয়া বিভিন্ন যুগের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে কবিতা লিখিলেন সে সমস্যার বিচার হইবে ভাষার বিচারের সময়ে। দোঁহার ভাষা ও চর্য্যাগুলির ভাষা যে আলাদা, অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে লেখা, তাহা সাধারণ পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইলে ঐ ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া বুঝাইতে হয়; এ সমালোচনায় তাহা অসম্ভব। যাহারা প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা জানেন, তাহারা একটু চোখ বুলাইয়া পড়িলেই ধরিতে পারিবেন যে চর্য্যা ও দোঁহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষায় লেখা। কাহ্নুর ভাষা যে আবার সরহের ভাষা হইতে ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত।

চর্য্যা রচনায় কাহ্নু ও সরহের কবিতাগুলির সংখ্যা বলা হইয়াছে। ঐ দুইজন ছাড়া আরও ১৯ জনকে চর্য্যালেখকরূপে পাই; তাহাদের নাম ও তাহাদের কবিতার সংখ্যার একটি তালিকা দিতেছি; এই তালিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (১) লুই (১ ও ২৯), (২) কুক্কুরীপাদ (২ ও ২০), (৩) বিরুআ বা বিরূপ (৩), (৪) গুণ্ডরী পাদ (৪ ও ৪৭), (৫) চাটিল্ল (৫), (৬) ভুসুকু (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ ও ৪৯), (৭) কম্বলাম্বর (৮), (৮) ডোম্বীপাদ (১৪), (৯) শান্তিপাদ (১৫ ও ২৬), (১০) মহীধর (১৬), (১১) বীণাপাদ (১৭), (১২) শবরপাদ (২৮ ও ৫০), (১৩) আর্য্যদেব (৩১), (১৪) ঢেন্ঢন্ (৩৩), (১৫) দারিক (৩৪), (১৬) ভাদে (৩৫), (১৭) তাড়কপাদ (৩৭), (১৮) কৌঙ্কন (৪৪) ও (১৯) জয়নন্দী (৪৬)।

www.pathagar.com

এই যে কয়েকজন গুহ্য সাধনের সাধক বা অবধূত বা পদকর্ত্তা বা কবির নাম পাওয়া গেল, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার বিষয় আছে অনেক। অন্য সাহিত্য ও রচনাগুলির টীকার সাহায্যে যথাসাধ্য স্থির করিতে হইবে—(১) ইহারা এক দেশের এক সময়ের লোক, না, নানা দেশের বিভিন্ন সময়ের লোক; (২) ইহাদের নামে কেবল এক একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম সূচিত হয়, না ঐ সকল একই নামে একই গুহ্য সাধনার অনেক পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়; (৩) রাম শ্যাম যদু প্রভৃতির মত সকলগুলি নামেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় অথবা ঐনামগুলি কেবল পদকর্ত্তাদের অবলম্বিত সাধন প্রণালী বুঝায় ; অর্থাৎ যে নামগুলিতে সাধনা বিশেষের সূচনা হয়, সেনাম ধরিয়া এক সময়ের একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি স্থির করা সম্ভব কিনা; (৪) যাঁহারা টীকা লিখিয়াছেন তাহারা কবে ও কোথায় ঐ টীকা লিখিয়াছিলেন; (৫) যিনি বা যাঁহারা চর্য্যাপদ ও দোহাকোষ প্রভৃতি এক সঙ্গে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারাই বা কবে ও কি অবস্থায় ও কোথায় বসিয়া পদগুলি জড় করিতে পারিয়াছিলেন। একে একে এই প্রশ্ন কয়েকটির আলোচনা করা যাইবে।

এক সময়ে আমাদের উদ্দিষ্ট সাধকশ্রেণীর লেখকদের অনেক রচনা তিব্বতের ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল, তবে ঠিক কবে কাহার কোন রচনাটি কিরূপ তর্জ্জমা হইয়াছিল, তাহা ধরা কঠিন; Tengyur নামে পরিচিত তিব্বতী Encyclopaedia গ্রন্থে এ বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, কেবল সেইটুকু ধরিয়াই সকল কথার বিচার করিতে হয়। তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের বিবরণে এই অবধূত শ্রেণীর সাধকদের সম্বন্ধে জানা যায় যে, যাঁহারা চর্য্যা ও দোঁহা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন বা তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, অথবা রচনাগুলির টীকা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ বা বঙ্গজ, কেহ বা ওড়িয়া, কেহ বা নেপালী, কেহ বা বেহারী, কেহ বা কাশ্মীরী, কেহ বা সমরকন্দবাসী; হেরুকোদয় প্রভৃতি। যে সকল গ্রন্থে এই বিশেষ শ্রেণীর অবধূতদের সাধনা পদ্ধতি স্পষ্টভাবে লেখা আছে, সে সকল গ্রন্থের অনুবাদক ও টীকাকারকদের মধ্যে মালববাসী, দানশ্রীজ্ঞানের, রত্নদ্বীপবাসী বরবোধির ও সমরকন্দবাসী বজ্রগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্ত্তি নামে এক ব্যক্তি কোন অনির্দিষ্ট সময়ে চর্য্যাগীতি-কোষবৃত্তি নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে; তবে সে কাহার রচনা ও কোথাকার লোকদের রচনা, তাহা সম্পূর্ণ ধরা যায় না। তেঙ্গ্যুর গ্রন্থ হইতে অন্য বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে পণ্ডিত হরপ্রসাদ এই তেঙ্গ্যুর অবলম্বনে যে কয়েকটি অদ্ভুত কথা লিখিয়াছেন তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

www.pathagar.com

দোহা ও চর্য্যাপদগুলির সময় ঠিক করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় যে তর্কের শিকলগাছি গাঁথিয়াছেন তাহার গ্রন্থি ৩টির পরীক্ষা করিতেছি। মুখবন্ধের ৬-এর পৃষ্ঠায় আছে ঃ (১) "ইংরেজী ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত [যে সময়ে "খুব তর্জ্জমা করিত" তাহার পূর্বে ও পরে যে কোন তর্জ্জমা করে নাই, একথা পণ্ডিত মহাশয় বলেন নাই, ও বলিতে পারেন না] (২) তাহা হইলে এই বাঙ্গলা বইগুলো ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল [এখনকার "তাহা হইলে" শিকলটির গ্রন্থিতে একটি বিচিত্র যোজনা; বইগুলি বাঙ্গলা কিনা, সে কথা পরে হইবে], (৩) খৃষ্টিয় ৮/৯/১০/১১/১২ শতে এই সকল বইগুলো লেখা হইয়াছিল বলা যায়। এখানে আবার শিকলগাছির নেজামুড়া উড়িয়া গেল কেন, অর্থাৎ শিকলগাছি হইতে সপ্তম ও ত্রয়োদশ শতাব্দী খসিয়া পড়িল কেন, তাহা দুর্বোধ্য]। পণ্ডিত মহাশয়ের তর্ক-পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া বিচার করা যাউক যে, তিনি বহুদেশের অবধূত লেখকদের উল্লেখ পাইয়াও সকলগুলি পদকর্ত্তাকেই কি উপায়ে বাঙ্গলার লোক বলিয়া ধরিলেন। বাঙ্গলার লোক বলিয়া প্রমাণিত হইলেও (যাহা হয় নাই) তাহাদের রচনা বাঙ্গলা বলিয়া প্রমাণিত হয় কি না, সে কথা অল্প পরেই দেখা যাইবে; এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের বাঙ্গালী ধরিবার একটি যুক্তির নমুনা দিতেছি।

৪৯ সংখ্যক চর্য্যাগানের রচয়িতা ভুসুকু যে শ্রেণীর সাধনার কথা লিখিয়াছেন সেই সাধনার নাম "বঙ্গাল" সাধনা; অবধূতদের অন্যান্য পদ্ধতির সাধনার মধ্যে (যথা, ডোম্বী-সাধনা, শবর-সাধনা, কুক্কুরী-সাধনা ইত্যাদি)। এই সাধনাটি যে কোন দেশের যে কোন সাধক অবলম্বন করিতে পারিত, ও যথার্থই করিত। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি বঙ্গাল সাধনায় দীক্ষিত হইয়া লিখিল যে, সে সেই সাধনার দরুন বঙ্গালী হইল, তাহাকে বাঙ্গালী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। একজন যদি ইংরেজের ধরনে পোশাক পরিয়া বলে যে 'আমি আজ ইংরেজ হইলাম', তবে বরং বুঝিতে হয় যে সে যাহা ছিল না, তাহাই হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ভুসুকুকে বাঙ্গালী বলা চলে কিনা, তাহা পদকর্ত্তাদের নামের বিচারে শীঘ্রই বলিব ; যদি ধরিয়া লওয়া যায় তিনি বাঙ্গালী, তবুও কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তিটি ভুসুকুর জাতির পরিচয়ের অনুকূল নয়। অন্যান্য সাধনায় যেমন ডোমের ব্যবহারের বা শবরের ব্যবহারের বা কুকুরের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে, সেইরূপ ৪৯ সংখ্যক গানে নানা ছলে গুপ্ত সাধনার কথা বলিতে গিয়া নদীর খালে নৌকা বাহিবার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, ও উক্ত সাধনায় যে নিজের স্ত্রীকে 'চন্ডালী' রূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার ধ্বনি আছে। শবর-সাধনার

www.pathagar.com

কথা যাঁহার লেখা, তাহাকে কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ওড়িষার সীমান্তের শবর জাতির লোক বলেন নাই, বরং তাঁহাকে বাঙ্গালীই বলিয়াছেন।

অবধূতদের গোটাকতক নাম খাঁটি ডাক নাম বটে, যেমন কৃষ্ণনামের অপভ্রংশ কাহ্নু, মহীধর, জয়নন্দী ও ভাদে; ভাদ্রমাসে জন্ম ধরিয়া পশ্চিম ওড়িষায় অনেক লোকের এখনও ভাদো বা ভাদে নাম পাওয়া যায়, আর বাঙ্গলাদেশে যেমন কৃষ্ণ নামের অপভ্রংশে পাই, কানাই ও কানু, তেমনই ওড়িষা প্রভৃতি অঞ্চলে কাহ্নু নাম অত্যন্ত অধিক প্রচলিত। অন্য নামগুলি যে সাধনের অনুরূপ নাম, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, বিভিন্ন সময়ে ও নানা দেশে সাধনের পন্থা ধরিয়া বিভিন্ন লোকের একই নাম হইতে পারে ও হইয়া থাকে, আর কাজেই নামের সমতা ধরিয়া একটি সাধন পন্থার কবিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের লোক বলিয়া ধরা কঠিন। অন্য নামেও নামের সমতা ধরিয়া কিছু ঠিক করা শক্ত বটে, তবে সেখানে রচনার বিষয় ধরিয়া লোক নির্দিষ্ট করা কতকটা সহজ হয়। কিন্তু নাম যেখানে সাধন পন্থার অনুরূপ, সেখানে নানা সময়ের ও নানা দেশের লোক একইভাবে নির্দিষ্ট একটি সাধনের কথা তাহাদের রচনায় লিখিতে পারে। যাহাই হউক পদের অর্থ ও টীকা ধরিয়া কয়েকটি নামের আলোচনা করিতেছি।

চর্য্যাপদের যে গানে (২৮ ও ৫০) শবর ভাবের সাধনা আছে,—ওড়িষার সীমান্তের শবরদের পার্বত্য বাসস্থান ও রীতি-নীতির দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনের কথা বর্ণিত আছে, সে গান ২টির লেখকের নাম ভণিতায় নাই, কিন্তু সাধন প্রণালী দেখিয়া টীকাকার তাহার নাম দিয়াছেন শবরীপাদ। ঠিক সেই রকম ডোম জাতীয়দের কথার দৃষ্টান্ত দিয়া যে গানটি (১৪) আছে, তাহার পদকর্ত্তার নাম ডোম্বীপাদ। এই গানটির ভণিতায় "ডোম্বীপাদ" বলিয়া উল্লেখ নাই, তবুও সাধনের পদ্ধতি ধরিয়া টীকাকার ঐ গানের কর্ত্তার নাম দিয়াছেন ডোম্বীপাদ। কুক্কুরীপাদ যে ২টি গানের রচয়িতা (২ ও ২০), তাহাতে কুকুরের মত ব্যবহারের কথা আছে, যাহার সকল কথা খুলিয়া লেখা চলে না; দ্বিতীয় সংখ্যক গানটিতে রাত্রিকালের চুরির ও তাহার সঙ্গে পাহারার ধ্বনি আছে, আর বিশ সংখ্যার গানটিতে কুকুরের ব্যবহারের "নখলি বাল সংঘারা" etc. লেখা আছে। ৪৮ নম্বরের গানটি লুপ্ত বলিয়া বৌদ্ধগান ও দোঁহায় ছাপা নাই, কিন্তু উহার টীকার যে অল্পকয়েক ছত্র রহিয়া গিয়াছে তাহাতে সেই গানের কর্ত্তাকে কুক্কুরীপাদ বলা হইয়াছে ও কোন একটি পদের ব্যাখ্যায় "অঙ্গুলীমূর্দ্ধীকৃত্য" কথাটি হইতে কুকুরের ব্যবহারের বিষয় ধ্বনিত হইয়াছে। চুয়াল্লিশ সংখ্যার

www.pathagar.com

গানটিতে কঙ্কণের ধ্বনি বা "নাদ" (তথতানাদ) সাধনের কথা আছে ও সেই গানের ভণিতায় কঙ্কণপাদ নাম পাই। সতর সংখ্যক গানের ভণিতা নাই, কিন্তু ঐ গানটিতে সাধনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে বীণা ও টীকাকার লেখকের নাম দিয়াছেন বীণাপাদ। পঁচিশ নম্বরের গানটি লুপ্ত, কিন্তু উহার খানিকটা টীকা রহিয়া গিয়াছে ও সেই গানের লেখককে তন্ত্রীপাদ বলা হইয়াছে; আর গানের ব্যাখ্যায় "বেম প্রতিমান (পোড়েন) সূত্র বাতদ্বয় (বাণা ও তান)" পড়িতে পাই।

গানের আংশিক ব্যাখ্যার সময় পরে দেখাইব যে, শান্তিপাদের নামের গান ২টিতে শান্তিভাব সাধনের কথা আছে, আর ভুসুকুর নামের গানে "সহজানন্দের" জন্য বুভুক্ষার কথা আছে; হরিণী মাংসের জন্য বুভুক্ষার কথা যে গানটিতে আছে, তাহাতেও সহজিয়াদের আনন্দ বিশেষের কথাই ধ্বনিত। ভুসুকু=ভুক্ষুসু=ভুক্ষু=(ভুখা সাধনে সিদ্ধ)। খুব সম্ভব যে লুই নামটিও লুবই সাধন হইতে; যাহারা পাখীর শিকারী ছিল, তাহাদের নাম হইত "লুব" আর লুই রচিত ২৯ সংখ্যার গানটিতে জাল, বাণ-চিহ্ন প্রভৃতি কথার শ্লেষজনিত ধ্বনি আছে। তবে হইতে পারে (খুব সম্ভব সেইরূপ হইয়াছিল) যে, বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া একজন লুই, একজন শান্তি ও একজন ভুসুকু ঐ ঐ নামে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ও চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

নামের প্রসঙ্গে এখানে আর কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। পূর্বেই বলিয়াছি যে কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্য একজন সাধকের খাঁটি নাম; এই নামেও আর কয়েকজন অবধূত পাওয়া যায়, তাহা পরে দেখাইব। সকল অবধূতেরাই সকল রকমের সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধন পন্থায় চলিত, কারণ ৬৪ রকমের সাধন-বিধি grade বা ধাপ অনুসারে অবধূতদের গ্রন্থে পরে পরে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই নির্দিষ্ট নামের কাহ্নুকে নানা রকমের সাধন পন্থার গানের কর্ত্তারূপে পাই; কাহ্নু রচিত ১৮ নম্বর গানটিতে ডোম্বী সাধনা বর্ণিত আছে। একথাটা এই জন্য বুঝাইবার প্রয়োজন যে, বঙ্গাল সাধনাটি যে কোন দেশের যে কোন সাধক অবলম্বন করিত অথবা করিয়াছিল। আর একটি কথা এই,—মনে হয় যে একজন লুই এক সময়ে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; পরে দেখাইব যে, চর্য্যাগানগুলি সাধনের হিসাবে দুইটি বড় ভাগে বিভাগ করিয়া চর্য্যা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ও ঐ বিভাগের প্রথম অংশ হইল প্রথম হইতে আটাশ সংখ্যার গান পর্য্যন্ত, আর দ্বিতীয় অংশ হইল ২৯ হইতে শেষ পর্য্যন্ত; এই দুই অংশের আরম্ভসূচক প্রথম গান লুই রচিত। এ

www.pathagar.com

বিচারেও একজন নির্দ্দিষ্ট লুইকে আদি সিদ্ধাচার্য্য বলা যায় কি না সন্দেহ। একটি টীকার একটি স্থান ছাড়া অন্যত্র সকল স্থানেই অন্যান্য অবধূতদিগকে যেভাবে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইয়াছে, লুইকেও সেইভাবে কেবল সিদ্ধাচার্য্য বলা হইয়াছে। যেখানে আদি সিদ্ধাচার্য্য কথাটি আছে, সে স্থানটি একটুখানি সন্দিগ্ধ; মূল বই এখন নেপালে, কাজেই সন্দেহের কথাটা ছাপা টীকা ধরিয়াই বলিতেছি। টীকায় আছে (কেবল এক স্থানে)—ইত্যাদি আদি সিদ্ধাচার্য্য; ইত্যাদি সিদ্ধাচার্য্য লিখিতে আর একটা "আদি" ভুলক্রমে বসিয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়; কারণ, এই বিশিষ্ট শ্রেণীর অবধূতদের অন্যকোন গ্রন্থে লুইকে সিদ্ধাচার্য্য ও সুন্দরানন্দ নামে ভিন্ন আদি সিদ্ধাচার্য্য নামে আমরা পাই নাই।

এবারে টীকাগুলি আলোচনা করিয়া লেখকদের নাম ও সময় নিরূপণের জন্য একটু চেষ্টা করিব। তেঙ্গ্যূরে লিখিত আছে যে একজন চন্দ্রকীর্ত্তি "চর্য্যাগীতি কোষবৃত্তি" তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন; সাহিত্য পরিষদের ছাপা বইখানিতে যে টীকা পাই, তাহা সেই টীকা কিনা জানা যায় নাই, কারণ সেই টীকায় ঠিক এই পঞ্চাশটি চর্য্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, জানি না। অদ্বয়বজ্র (শবর সিদ্ধ) সরোহর দোহাকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, আর সেই টীকার নাম দিয়াছিলেন দোহাকোষ পঞ্জিকা (সহজ আম্নায় পঞ্জিকা)। অমিতাভ নামে একজন "কৃষ্ণ ব্রজপাদ দোহাকোষ টীকা" লিখিয়াছিলেন; মুদ্রিত "মেখলা" টীকা, সেই টীকা হইতে পারে। বৈরোচন মহাযোগী কোশলবাসী ঐ টীকাখানি তিব্বতীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের দোহাকোষের টীকা যিনি তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার নাম পাই বৈরোচন ব্রজ।

এই সকল টীকা ধরিয়া পদকর্ত্তাদের পূর্ব-পরবর্ত্তীতা কতকটা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের টীকাকার দোঁহাকোষের সরহকে চর্য্যাপদের সরহের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। ভাষা সমালোচনার সময় আমরা অনেক কথা বলিব, কিন্তু এখানে এইটুকু বলি যে যাহারা প্রাচীন ও প্রাকৃতের অপভ্রংশের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণেও পরিচিত, তাহারাও দেখিবেন যে, দোঁহাকোষের ভাষা ও চর্য্যার ভাষা কত আলাদা। যদি দুইই একজনের লেখা হয়, তবে কি কারণে ভাষায় এতটা ভিন্নতা হইতে পারে, তাহা ভাষার বিচারের সময়ে বলিব। ঐ টীকাকার সরহের মত দোহাকোষের ও চর্য্যাপদের কাহ্নুকে এক বলিয়াছেন; ভাষা সম্বন্ধে সরহের রচনার সম্বন্ধে যে কথা এখানেও সেই কথা প্রযোজ্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ টীকাতে

www.pathagar.com

এই নামের সমতা দেখিয়া দায় ঠেকিয়া দোঁহার ভাষা ও চর্য্যার ভাষাকে এক সময়ের বাঙ্গলা বলিয়াছেন, যদিও উভয় ভাষায় অত্যধিক প্রভেদ রহিয়াছে।

টীকায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে লুই গুরুর শিষ্য বা পরবর্তীদের এইরূপ নাম পাওয়া যায়, যথাঃ– ৩৪ নম্বর গানের কর্ত্তা দারিককে পাই লুইএর শিষ্য বা বংশধর; দারিক নামটির অর্থ দুইটি গানের বিশ্লেষণের সময় লিখিব। দারিক একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন; যদি এই দারিক সেই দারিক হন, যিনি বজ্রযোগিনী-টীকা ও "ব্যক্ত ভাবানুগত তত্ত্বসিদ্ধি" লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাহার নিজের উল্লেখের অনুরূপে তিনি ওড়িষার ইন্দ্রভূতির দুহিতা লক্ষ্মীঙ্করার পরে আবির্ভূত; লক্ষ্মীঙ্করা "বজ্রযোগিনী সাধন" ও "ব্যক্তভাবসিদ্ধি" লিখিয়াছেন। দারিকের চর্য্যাগানে আছে, তিনি পারিম নামে নদীর কূলে বাস করিতেন। লুইএর আর একজন পরবর্তী আচার্য্যের নাম পাই কিলপাদ। "**হেবজ্র**" নামে যে সাধন প্রণালী ছিল ও যাহার ব্যাখ্যা হইবে পরে, সেই সাধন পন্থায় প্রথম নাম পাই একজন সরোরুহ বা সরহের। যে সরোরুহ পদ্মাচার্য্য হেবজ্র সাধন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাকে প্রথম সরহ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। জালন্ধরিপাদ সিদ্ধাচার্য্য শুদ্ধি-বজ্র-প্রদীপ নামে হেবজ্র সাধনের এক টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন; ৩৬নং চর্য্যার লেখক কৃষ্ণাচার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই জালন্ধরি পাদের শিষ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে, আর এই কৃষ্ণাচার্য্যই "বজ্রগীতির' প্রণেতা। দোঁহাকোষের "কৃষ্ণবজ্র" উক্ত কৃষ্ণাচার্য্যের সহিত অভিন্ন কিনা, তাহা বিবেচ্য। টীকাকার দুইজনকেই এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরায় যে "ধেতন"-এর নাম পাই, তিনিই ঢেন্ ঢন্; আর ধামপাদ ও মহিপাদকেও কৃষ্ণের বংশধররূপে পাই। উল্লেখ করিয়া রাখি যে ধামপাদের গানে ধাম অর্থাৎ বাড়ি পোড়ার দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনের কথা ধ্বনিত করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণাচার্য্যের বংশে একজন সরহকেও পাই, যিনি "বসন্ত তিলক-দোঁহাকোষগীতিকা" লিখিয়াছেন। এই সরহকে মুদ্রিত দোঁহাকোষ ও চর্য্যার সরহ হইতে ভিন্ন ধরিয়া ইহাকে তৃতীয় সরহ বলা যাইতে পারে। চর্য্যার মধ্যে একজন বিরূআ (অর্থাৎ বিরূপ সাধনের অনুগামী) পাই যে বিরূআ বা বিরূ কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহার অংশ অঙ্গীভূত করিয়া দোঁহাকোষ লিখিয়াছিলেন, তাহাকে বলিব দ্বিতীয় বিরূআ। এই বিরূআকে সেই বিরূআ বা বিরূপ বলিয়া মনে হয়, যিনি তাহার পূর্ববর্তী বিরূআ বা বিরূপের "কর্ম্মচণ্ডালিকাদোঁহাকোষগীতি" অবলম্বনে "শ্রীবিরূপপাদ চতুরশীতি" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই প্রথম বিরূপ চর্য্যার কাহ্নুর পূর্ববর্তী; কাহ্নুর ১৮নং গানে বিরূআকে লক্ষ্য করিয়া "বিরূআ বোলে" লিখিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

চর্য্যাপদের কম্বলাচার্য্য অথবা কম্বলাম্বরপাদ মহাসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য, "অভিসময় নাম পঞ্জিকা" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কঙ্কণ এই কম্বলের পরবর্তী সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, ও তিনি চর্য্যাদোঁহাকোষ-গীতিকা লিখিয়াছিলেন।

শবরসিদ্ধ সম্প্রদায়—বজ্রযোগিনীসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া যিনি মহামুদ্রা বজ্রগীতি ও চণ্ডমহাবোধন লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম হইয়াছিল শবরপাদ বা শবরীশ্বর; ইনি লক্ষ্মীঙ্করার পরবর্তী বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্মীঙ্করাই প্রথমে বজ্রযোগিনীসাধন পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শবরিপাদের ব্যাখ্যা ধরিয়া আর একজন বই লিখিয়াছিলেন, যাহার নাম 'অজপাণিনাদ'। 'সরহমহাশবর' নামে আর একজন সরহ "দোঁহাকোষনাম-মহামুদ্রোপদেশ" লিখিয়াছিলেন। এই সরহ ছাড়া শবর সাধনের আর একজন সরহ পাই যাহাকে মহাব্রাহ্মণ ও মহাযোগী বলা হইয়াছে; এই চতুর্থ সরহকেও একখানি দোহাকোষগীতির লেখকরূপে পাই। আবার কৃষ্ণ বা কাহ্নুর অনুবর্তী যে সরহকে পাই, তাহাকে হয়ত তৃতীয় সরহ বলিয়া নির্দেশ করা চলে। মুদ্রিত দোহাকোষের লেখক সরহ মহাশবর যদি হেবজ্রসাধনের গ্রন্থখানির লেখক হন তবে এই সরহকে প্রথম সরহ বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুর গুরু জালন্ধরপাদ সরহের ঐ হেবজ্রসাধনের একখানি টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। তাহা হইলে কাহ্নু সরহের অনেক পরবর্তী হন। দোঁহাকোষের কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু বজ্রধরকে (সরোজবজ্রকে বা সরহকে) শবর বলিয়াছেন; এই নির্দেশ জাতিবাচক কি কেবল সাধনবাচক, তাহা ধরা কঠিন।

সরহমহাশবরের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া কমলশীল নামে আর একজন আচার্য্য ডাকিনী বজ্রগুহ্য-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, আর এই কমলশীলই মহামুদ্রোপদেশ-বজ্রগুহ্যগীতির রচয়িতা।

সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত মহাশবর সরহের দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রকে শবরসিদ্ধ উপাধিযুক্ত পাই; পূর্বেই বলিয়াছি, এই টীকার নাম দোঁহাকোষপঞ্জিকা।

পাঠকেরা যদি এই নামগুলোর খটমট বিচার পড়িয়া থাকেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে এক নামের অনেক সাধককে পাওয়া যায়, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই বিষয় লইয়া নানা বই লিখিয়াছিলেন, আর চর্য্যাসংগ্রহে যাহাদের নাম পাই তাহারা বিভিন্ন সময়ের লেখক। যে সময়ে সঙ্গীতকারদের মুখ হইতে ঐ চর্য্যাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন মূল রচনার ভাষা সঙ্গীতকারদের মুখে পরিবর্তিত হইয়াছিল কিনা,—অথবা কোন কোন প্রাদেশিক ভাষা অল্পাধিক

www.pathagar.com

পরিমাণে উহাতে জড়াইয়া গিয়াছিল, কিনা, তাহা বিশেভাবে বিবেচ্য। রচনার মূল ভাষার বিচারের সময় সে কথার বিচার হইবে। দোঁহাকোষ দুইখানি যে বিভিন্ন সময়ের লেখা, তাহাও ধরা পড়িয়াছে; টীকাকারের মতের অনুরূপে দোঁহার সরহ যদি চর্য্যার সরহ হন তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, চর্য্যার গানগুলির ভাষা যে কারণেই হউক, রচনার ভাষা হইতে বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অনেক মাল-মসলার উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিচার হইবে পরে।

শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার

www.pathagar.com

(বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃষ্ঠা-১২০)

৩। চর্য্যাপদ ও দোঁহা রচনার সময়

আগেকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, পদকর্ত্তাদের নাম ধরিয়া রচনার সময় ঠিক করা চলে না, কেননা দুই-তিনটি নাম ছাড়া অবধূতদের সকল নামই তাহাদের সাধন-পন্থাসূচক নাম, আর ঐ নাম নানা সময়ে নানা লোকে পাইয়াছিল ও একই সাধনার কথা নানা সময়ে নানা জনে লিখিয়াছিল। ছাপা বইখানির টীকায় ও সহজিয়াদের অন্য সাহিত্যে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট থাকিলেও পণ্ডিত হরপ্রসাদ উহা ধরিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; তাই তিনি পাখী-শিকারের সঙ্কেতে পরিচিত সাধনার সাধককে বা শিকারীকে বা লুব্ধক বা লূবই বা লুইকে এক সময়ের একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ঠাওরাইয়া তাহার সুরচিত "বেনের মেয়ে" গল্পটিতে চর্য্যাপদের লুইকে মুসলমান যুগের আগে সাতগাঁ এর পুকুরের মাছ খাওয়াইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় সরহের দোহাকোষের টীকায় শিকারী ও জেলেদের বিবাদের যে উপন্যাস আছে,—অর্থাৎ যেখানে "লুবইকৈবর্ত্তাদীনাং বিসংবাদ" উল্লিখিত আছে, তাহা যদি মনোযোগ করিয়া পড়িতেন, তবে অনায়াসে লুই নামের অর্থ ধরিতে পারিতেন।

যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের নানা সময়ের রচনা একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া চর্য্যার বইখানি করা হইয়াছিল, তখন লুই এর দুইটি রচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল; চর্য্যার প্রথম ভাগের প্রথম গান ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম গান বা ২৯ নম্বরের গানটি লুই রচিত। এই দুইটি গানেরই সুর বা রাগিণীর নাম পটমঞ্জরী। গানের রাগিণীর এই নামটী যে প্রাচীন রাগ রাগিণীর নামে নয়, তাহা বলিতে হইবে না; তবে কবে পটমঞ্জরীর সৃষ্টি হইল ও চর্য্যাপদের গানের অন্য দুই-একটা সুরের জন্ম হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। রাগিণী গবড়া, মল্লারী ও পটমঞ্জরী, এই তিনটি রাগিণীর সময় সম্বন্ধে বিচার করিলেই যথেষ্ট হইবে।

•

গৌড় রাগ বা রাগিণী খুব প্রাচীন না হইলেও আমাদের এই গানগুলির বিচারের হিসাবে প্রাচীন বলিতে হইবে ; এই গৌড় রাগকে গউড় বা গউড়া নামে কয়েকটি চর্য্যার সুরে পাই। গৌড়, গউড় ও গউড়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি গানের (দৃষ্টান্ত ২ ও ৩) সুর গবড়া বলিয়া লিখিত আছে। মুসলমানদের সময়ে গানের কয়েকটা শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছিল, আর এক-একটি শ্রেণী এক-একটি বাণী নামে পরিচিত হইয়াছিল; ওড়িষার কবিতার গানের সুরে এই বাণী নাম যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাঠানদের আমলে

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুসলমান যুগে ফিরোজ খাঁ প্রবর্ত্তিত একটি বাণী তাঁহার শিষ্যদের হাতে কান্দাহার বা খাণ্ডার বাণী নাম পাইয়াছিল। ঐরূপ আবার মোগলদের সময়ে তানসেন, জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও ব্যসদ খাঁ প্রভৃতি গুণীদের একটি বাণী গৌড়ীয় বাণীর অর্থে **গবরহার** নাম পাইয়াছিল। এই সুর গৌড় নামে পরিচিত সুর হইতে অনেকটা ভিন্ন, আর এই **গবরহার** বাণীর সাধারণ নাম হইয়াছিল **গবড়া**। চর্য্যাপদেও দেখিতেছি গবড়া ও গউড়া আলাদা আলাদা সুর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কেহ দেখাইতে পারিবেন না মুসলমানদের সময়ের আগে 'গবড়া' নাম প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক চর্য্যা গানের সময় কিছুতেই মুসলমান যুগের আগের হইতে পারে না। পাঠকেরা যে কোন **কলাবৎ** (আমাদের উচ্চারণে কালোয়াৎ) আচার্য্যের কাছে এই ইতিহাস অনায়াসে পাইতে পারিবেন।

এবারে মল্লারের কথা বলিব। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত-সাহিত্যে যে ছয়টি রাগের নাম আছে; তাহা প্রাচীনতম ভারতের গ্রন্থে এইরূপভাবে আছে, যথাঃ—

ভৈরব ঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ রাগাঃ ষড়িতি কীর্ত্তিতাঃ।।

ঋতুর পর্যায় অনুসারে এই রাগগুলি ভাগ করা হইয়াছে, এইরূপ পড়িতে পাই। ঐ ছয়টি রাগের মধ্যে মেঘ রাগটির সুরের সঙ্গে কিয়দংশে মেলে, এমন একটি সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল মোগলদের সময়ে ও সেই সুরটি মল্লার নামে পরিচিত হইয়াছিল বলিয়া যে ইতিহাস আছে, তাহা অবিশ্বাস করা শক্ত ; কেননা ছত্রিশটি রাগিণীর প্রামাণ্য তালিকায় মল্লার নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে তালিকায় মল্লার নাম আছে সে তালিকা মুসলমানদের আমলে রচিত। প্রথম উদ্ভাসিত মল্লারটি সুরের স্রষ্টার নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাম পাইয়াছিল **মিঞা মল্লার**। তাহার পর ঐ সুর নানা সুরের সঙ্গে যখন জোড়া হইয়াছিল, তখন মেঘমল্লার, সুরটমল্লার প্রভৃতি নাম পাইয়াছিল। এই ইতিহাস সত্য কিনা, তাহার পরীক্ষা হইতে পারে; যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, যে সাহিত্য নিশ্চিত মুসলমান সময়ের পূর্বে রচিত তাহাতে মল্লার নামের উল্লেখ আছে, তবে অনায়াসে আমার উদ্ধৃত ইতিহাসটুকু অগ্রাহ্য হইতে পারে। তাহা না হইলে চর্য্যাপদের পূরা পাঁচটি গান মুসলমান যুগে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার পর পটমঞ্জরীর পালা। পটমঞ্জরী নামে কোন রাগিণী এদেশে ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে উল্লিখিত নাই, ও ভারতের কলাবতেরা কেহই এ রাগিণীকে

www.pathagar.com

চেনেন না। ওড়িষার যে সাহিত্য মুসলমানদের আমলে রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই পটমঞ্জরী নাম যথেষ্ট পাই। ওড়িয়া পটমঞ্জরী সুরের সঙ্গে আমি পরিচিত; ঐ সুরের সঙ্গে চর্য্যার পটমঞ্জরীর সুর কিছুতেই মেলেনা বলিতে পারি, কেননা উভয় পটমঞ্জরীর ছন্দের ধাক্কায় আদবে মিল নাই। মুসলমানদের আমলের আদিযুগে যে নতুন বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুর ছাড়া অন্যত্র পটমঞ্জরীর নাম নাই। বৈষ্ণবেরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব ও নূতনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গানের সুর হইতে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়েই নতুন নাম চালাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। এই পটমঞ্জরী নামটি নতুন শ্রেণীর বৈষ্ণবদের দেওয়া নামের মত লাগে। এই সুর প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে মনে হয় না। পটমঞ্জরিটি এই নির্দেশ মতে আধুনিক হইলে চর্য্যার অনেকগুলি গানই একেবারে আধুনিক হইয়া পড়ে।

গানগুলি যদি এত আধুনিক সময়েরই হয়, তবে উহাদের ভাষা সম্পূর্ণ আধুনিক সময়ের ভাষা নয় কেন,—ঐ ভাষার কাঠাম পূর্বাঞ্চলের মাগধী ভাষায় গড়া হইল কিরূপে, তাহা পরবর্তী প্রবন্ধেই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব। তখন দেখাইব যে কি কারণে একটি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে একেবারে নিতান্ত হালের বাঙ্গলা, হিন্দি ও ওড়িয়া ভাষা মিশিয়া যাইতে পারিয়াছে।

গানের সুরের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। আগেকার দুইটি প্রবন্ধে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছি যে, চর্য্যাপদের গানগুলি চৌপদী বা চৌপাই ছন্দের কাঠামে গড়া; একথা কিছুতেই অস্বীকার করার জো নাই। এই চৌপাই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও হিন্দি সাহিত্যের অত্যন্ত অধিক পরিচিত, তাহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। গানের সুর যেভাবে দেওয়া আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের চৌপাই যে চমৎকার হিন্দুস্থানী ধরনে পড়া যায়, তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ বলেন যে, ঐ গানগুলি নাকি বাঙ্গলা দেশের কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। ইহার কি জবাব দিব? আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গীরা Longfellow রচিত Psalm of Life টি চমৎকার কীর্ত্তনের সুরে গাইতেন; এখনও Tell me not বলিলেই সেই সুর মনে পড়ে। এ অবস্থায় চর্য্যাপদের চৌপাই কীর্ত্তনে উৎরাইয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ওগুলি বাঙ্গলার কীর্ত্তনের সুরে রচনা নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি যে, শুষ্ক Logic-এর অতি বড় শুষ্ক Barbara Celarent প্রভৃতি খাসা পিলু রাগিণীর সুরে সেকালে মুখস্থ করার উপায় ছিল।

www.pathagar.com

গানে ব্যবহৃত গোটা কতক শব্দের বিচারে রচনার সময়ের অনুসন্ধান করিব। প্রথম কুড়ি সংখ্যার গানের জাণ জৌবন কথাটির আলোচনা করিতেছি। ছত্রটিতে আছে—জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পুরা। আমাদের অর্থাৎ ভারতের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের (Idiomatic usage) জীবন-যৌবন এক সঙ্গে বলা চলে; জাণ শব্দটিকে জৌবণের বিশেষণ করিয়া উহাকে "নব" যৌবন করা চলে কিনা, তাহা বিচার্য্য। কোন সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ হইতে এমন কোন জাণ শব্দ পাওয়া যায় না যাহার অর্থ 'নব'; যান শব্দটি অন্যান্য গানে জাণরূপে যেখানে পাই সেখানে টীকাকার ঐ জাণ অর্থই দিয়াছেন, কিন্তু এখানে যে জাণ শব্দটি 'নব' অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা কোন শব্দ দিয়া টীকাকার দেখান নাই; জীবন-যৌবন অর্থ করিলে যে পদের অর্থ ভালই হয় ও টীকাকারের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধ ঘটে না, তাহা সুস্পষ্ট; কাজেই এ জাণ মুসলমানী জাণ। গানের সুরে যে সময়ের সঙ্কেত পাইতেছি, তাহাতে এই মুসলমানী শব্দের ব্যবহার খাপ খাইতেছে। ছাপা বইএ ৮৬ পৃষ্ঠায় সরহের দোহায় জীবন অর্থে জাণ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়। সে দোঁহার ভাবার্থ এই যে যাহারা সাধনার জন্য গায়ের লোমা উপড়ায় বা মোক্ষের জন্য অন্য কষ্টসাধ্য কাজ করে ও শরীরকে "বিড়ম্বিত" করে, তাহারা ভ্রান্ত। এক অর্থের একজোড়া দোঁহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

দীক্ষণখজ্জে মলিনে বেসে; ণগ্গল
হোইঅ উপাড্ডিঅ কেসে। খরণেহি
"জাণ" বিড়ম্বিয় বেসে; অপ্পণু
বাহিঅ মোকখ উএসে।

এখানে টীকাকার যান অর্থ খাটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বিড়ম্বিত হইল তাহা "জীবন" অর্থে না লইলে অসঙ্গতি ঘটে।

ইহার পর ৩৪ নম্বর গানে উহার রচয়িতা বাঙ্গালী অবধূত দারিক যেভাবে বারটি ভূবনের রাজার উল্লেখে "বার ভুঁইআর" রাজত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঐ গানটির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সময় দেখাইব। বার ভুঁইআর সময়ের উল্লেখ যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নয়, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তৃতীয়ে, রসরসাল প্রভৃতির উল্লেখের কথা আলোচনা করিতেছি। জয়নন্দীর ৪৬ নম্বর গানের শেষে মানুষের "ধাতু"কে "স্ফুটণে" শোধন করিবার ইঙ্গিত আছে; টীকাকার এখানে মহারসে (অর্থাৎ পারদে) স্ফুটন করাইয়া শোধন

www.pathagar.com

করার কথা লিখিয়াছেন। শোধনের প্রাচীন পদ্ধতি উঠিয়া গিয়া aqua regia বা মহারস দিয়া কাজ করিবার উপায় আরব জাতীয়দের নিকট হইতে এদেশে শেখা ও এই পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। ২২ নম্বর গানে রস রসায়নের যে কঙ্খা বা আকাঙ্খার কথা আছে, তাহা এইরূপ ঃ—

জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসানের কঙ্খা।

রসেশ্বর দর্শনের যোগীদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই সাধনার পরীক্ষা হইতেছিল যে, পারদ ব্যবহার করিয়া অর্থাৎ রসরসান করিয়া অজরামর হইতে পারা যায় কিনা; এখানে সেই সাধনার কথা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আরও যে সকল আভ্যন্তরিক প্রমাণে চর্য্যা প্রভৃতির রচনার সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহা এবারে বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

www.pathagar.com

(বঙ্গবাণী, ৫মে বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩২, পৃষ্ঠা- ২৪১)

৪। বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা

দোঁহা দুইখানির ভাষা যে আলাদা আলাদা, আর সে ভাষার সঙ্গে যে চর্য্যাগানগুলির নানা রকমের ভাষাকে এক করা চলে না, তাহা অতি অল্প পরীক্ষাতেই ধরা যায়; তবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ প্রভেদ ধরিতে পারেন নাই বলিয়া অল্প গোটা কতক দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক সরহের দোঁহাকোষের মধ্যেই যে কারক বুঝাইবার বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির রূপ, খাঁটি একরকমের নয় তাহা উপেক্ষা করিয়াই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইবে, কারণ সে সকল প্রভেদের হেতু বুঝাইতে গেলে দোঁহাকোষের ব্যাকরণ লিখিতে হয়। প্রথমে সরহের দোঁহাকোষে পাই ঃ—

(১) বহ্মণে হি নজানন্ত হি ভেডু। [ভেডু=ভেদ, উকার দিয়া কর্ম্মকারক] এবই [এইরূপে] পটিঅউ [পঠিত] এ চউবেঅ [চতুর্ব্বেদ]।

(২) জিম তিসি তিসিঅ-ণে ধাবই

মর সোসে নভজ্জলু কহি পাবই।

[এইখানকার "সোসে" শব্দটির গায়ে "নভজ্জলু"-র "ন"-টি লাগাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে গোল করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শ্লোকের অর্থ ঃ— তিসি অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর যেমন তিসিআ অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধায়, ও তাহার ফলে সোসে অর্থাৎ পিপাসায় মরিয়া যায়, আর কাজেই "কহিঁ" অর্থাৎ কেমন করিয়া বা নভজ্জলু অর্থাৎ নভের জলকে পাইতে পারে। এখানে কর্ম্মকারকের বিভক্তি "উকার" লক্ষ্য করার জিনিস ও কহিঁ (সং-কস্মিন-পালি-কহিং) যাহা এখন হিন্দিতে কাঁহা ও উড়িয়াতে কাঁহি —তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই "নভের জল" হঠ-যোগের পারিভাষিক শব্দ।)

এই শ্রেণীর প্রাকৃত বা অপভ্রংশকে কেবল এই হেতুর জোরে বাঙ্গলা বলা চলে, যে ঐ ভাষার পুঁথি একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত নিজে হাতে নেপাল হইতে বহিয়া আনিয়া ছাপিয়াছেন। ইহাকে বাঙ্গলা বলিলে প্রাচীন সকল প্রাকৃত ও অপভ্রংশই বাঙ্গলা,—এমন কি বেদের ভাষাও বাঙ্গলা, কেন না উহাতে আমাদের ব্যবহৃত অগ্নি আছে, পুরোহিত আছে ইত্যাদি।

ইহার পর কৃষ্ণাচার্য্য ওরফে কাহ্নুর দোঁহাকোষের দৃষ্টান্ত দিতেছি; কাহ্নুর চর্য্যাগানগুলো যে স্পষ্ট একটি প্রাদেশিক ভাষাবহুল, তাহাও পরে দেখাইব। দোহাকোষের দৃষ্টান্ত ঃ—

www.pathagar.com

(৩) বোহিচিঅ রজভূষিঅঅ ফুজ্জোহেলসি হুউ।

পোক্খরবিয় সহাবসুহ নিঅ দেহহি দিধউ।।

টীকার ব্যাখ্যা ধরিয়া যে অর্থ দিতেছি তাহাতেই ইহার ব্যাকরণের বা ভাষার ভিন্নতা দেখা যাইবে ঃ- বোধিচিত্ত, যাহা রজ-ভূষিত অর্থাৎ অপতিত, তাহা "ফুজ্জোহেলসি" চিত্তবজ্রের দ্বারা অশ্লিষ্ট হউক (হুউ); পুষ্করের বা পদ্মের বীজ স্বভাবসুখে নিজ দেহে ধারণ করুক (দিধউ=আধান করুক)।

(৪) বহি নিক্কলিত্তা কলিত্তা সুন্নাসুণ্ন পইঠত্তা।

সুন্নাসুন্ন বেণী মাজ রেবট কিংপি নহি দট্টা।।

বহিঃ-নির্গতত্ব—এইরূপ ভাব আকলন করিয়া (কলিত্তা=কলিত্বা, —অসমাপিকা ক্রিয়া) শূন্যাশূন্যে প্রবেশ করিয়া (পইঠত্তা-ত্বা) শূন্যাশূন্য এই দুই এর মধ্যে (বেণী=উভয়) হে মূঢ়, কিছুই কি দৃষ্ট হয় না? [ছাপায় মূল শ্লোকে "মাজরে" এক শব্দ করিয়া লেখা আছে; উহাতে ওড়িয়া "মাঝরে"=মধ্যে, এইরূপ হয়; কিন্তু "রে"টিকে স্বতন্ত্র করিয়াই অর্থ করা গেল। "বেণী" শব্দটি ঠিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের বটে, কিন্তু ঐ শব্দটি এই অর্থে এখন কেবল ওড়িয়াতেই ব্যবহৃত হয়। অন্য একটি দোহায় "স্থান" অর্থে "থাব"= আছে; এই "থাব"= ঠাব ঠিক স্থান অর্থে ওড়িয়ায় সর্বত্র ব্যবহৃত। ইহাতে ভাষা ওড়িয়া প্রমাণিত হয় না, কিন্তু তবুও কথাগুলি নির্দ্দেশ করা গেল।]

এই অল্প দৃষ্টান্তেই দুইখানি দোঁহাকোষের ভাষার প্রভেদ অতি সুস্পষ্ট হইবে। আর ঐ ভাষা যে বাঙ্গলা নয়, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। এখন এই ভাষার সঙ্গে চর্য্যাগানের ভাষার পরীক্ষা করিতেছি। প্রথমে সরহের নামে যে চর্য্যাগানগুলি আছে, সেগুলি হইতে এমন কয়েকটি ছত্র তুলিতেছি যাহাতে ব্যাকরণ অর্থাৎ ভাষা স্পষ্ট হয়; যথা ঃ—

(ক) মিছেঁ (বৃথায়) লোঅ (লোক) বন্ধাবএ (বন্ধাপয়তি= বাঁধে) অপনা (আপনাকে)।

(খ) জইসো (যেমন) জাম (জন্ম) মরণ বি (ও) তইসো (তেমন)।

(গ) উজুরে (সোজা বা ঋজুরে ! অর্থাৎ সোজা যাওরে) উজু ছাড়ি (ঋজুপথ ছাড়িয়া) মা লেহু (লইও না) বঙ্ক (বাঁকাপথ)।

(ঘ) হাথেরে (হাতে, ৭মী; এই "রে" সম্বোধনের না হইলে ওড়িয়া ৭মী হয়; কিন্তু এখানে সম্বোধনই মনে হইতেছে) কাঙ্কাণ (কঙ্কণ) [হাতে কঙ্কণ

www.pathagar.com

থাকিতে] মা লোউ (নিওনা; "লেহু" ও "লোউ" একইরূপে ব্যহৃত) দাপণ (দর্পণ—কর্ম্মকারক)।

(ঙ) চীঅ (চিত্ত) থির করি ধহু রে (ধর—অনুজ্ঞায়) নাহী (হে নাবিক বা নেয়ে)।

উদ্ধৃত পদগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, চর্য্যার সরহের ভাষাও যে বাঙ্গলা নয় তাহা সুস্পষ্ট। এবারে কৃষ্ণাচার্য্যের বা কাহ্নুর অল্প কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে সংক্ষেপে ভাষার কাঠাম বা ব্যাকরণ প্রত্যক্ষ হয়।

(চ) এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।।
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা।।

(ছ) নগর বাহিররে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছইছোই যাই সো বাক্ষ নাড়িআ।।

(জ) সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।।

(ঝ) তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজণ কারণ সমহর টালিউ।।

(ঞ) তিশরণ নাবী কিঅ অঠকু থারী
নিঅ দেহ করুণা শুনমে হেরী।

উদ্ধৃত চরণগুলির (অথবা ঐ চরণ সম্বলিত গানগুলির) ব্যাখ্যা না দিয়া কেবল ভাষার ব্যাকরণ অল্প একটু বুঝাইবার জন্য কয়েকটি শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (১) "মোড্ডিউ" (মদ্দিয়া) ও "তোড়িউ" (তুড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া) শব্দ দুইটিতে "উ" যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া হইয়াছে; আবার "(ঝ)" দৃষ্টান্তে "বিটলিউ" ও "টালিউ" শব্দ দুইটিতে "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" এর স্থানে "উ" হইয়াছে ও এইরূপ প্রয়োগ অনেক স্থানে আছে। অসমাপিকা ক্রিয়াতেও আরও অনেক স্থানে "উ" প্রত্যয় আছে। (২) আবার দেখা যাইবে যে, "(চ)" উদাহরণের শেষ ছত্রে "পইসি" শব্দে "প্রবেশ করিয়া" অর্থ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "উ" প্রত্যয় হইতে ভিন্ন প্রত্যয় বসিয়াছে।

www.pathagar.com

"(ছ)" উদাহরণে "পইসি" শব্দের মত "ছুই" বা "ছুঁই" (ছুঁইয়া) সিদ্ধ হইয়াছে; "(জ)" উদাহরণে আবার অসমাপিকা ক্রিয়ায় "ভাঞ্জীঅ" (ভাঙ্গিয়া) আছে, যাহা ব্যাকরণের হিসাবে "ছুঁই" প্রভৃতি হইতে অভিন্ন। ঐরূপ আবার "(ঞ)" উদাহরণের "করিয়া" অর্থে "কিঅ" রহিয়াছে। (৩) "(ছ)" উদাহরণের প্রথম শব্দটি মূলে "বারিহ" আছে, কিন্তু টীকায় "বাহির" আছে; এখন দেখিতেছি যে সপ্তমী পদে যেখানে সংস্কৃতে "বাহ্যে" হইবে, সেখানে "এ" বিভক্তি স্থলে "রে" বিভক্তি আছে; অধিকরণের এই "রে" যাহা কি কেবল ওড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব, তাহা কাহ্নুর রচনায় বহু স্থানে আছে। প্রথম ছত্রটি তিলমাত্র পরিবর্তন না করিয়া যদি ওড়িষার সর্বত্র পড়া যায়, তাহা হইলে চাষা পল্লীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বলিবে যে ঐ চরণটী তাহাদের অতি প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় রচিত; ঠিক ঐ কয়েকটি শব্দ দিয়াই যে এখন ওড়িয়াতে ছত্রটীর অর্থের অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দশ নম্বরের গান হইতে ঐ টুকু উদ্ধৃত, তাহাতে ওড়িয়া ব্যাকরণের পদ ও শব্দ প্রচুর রহিয়াছে; "পুছমি" "মারমি", "লেমি" প্রভৃতি নির্ভুলরূপে ওড়িয়া উত্তম পুরুষের এক বচনের পদ, আর "ফুলের দল" অর্থে যে "পাখুড়ী" আছে তাহাও ওড়িষার নিত্য ব্যবহৃত শব্দ; বাঙ্গলায় ঐ শব্দটি "পাপ্ড়ি",—"পাখুড়ী" কেবল ওড়িয়াতেই আছে। ঐ গানের মধ্যেই "ঘলিলি" (পরাইলাম) পদটি পাই; "ঘলিলি" "ঘড়িলি" "ঘুড়াইলি" প্রভৃতি ঠিক ঐ অর্থে ওড়িষার বিভিন্ন প্রদেশে তাজা আছে। (৪) "ঞ" দৃষ্টান্তে অধিকরণের বিভক্তি রহিয়াছে "মে" যাহা কি খাঁটি হিন্দী। যে তের নম্বরের গান হইতে দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত, তাহাতে "শূনমে" (শুন্যমে) ছাড়া "তরঙ্গে" অর্থে "তরঙ্গমে" পাইতেছি। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষারূপে পরিণত হওয়ায় যে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তি বিশেষ বিশেষ ভাষার বিশেষত্ব হইয়াছে, সেই বিভিন্ন বিশেষত্ব কেমন করিয়া এক রচনায় বা একজনের রচনায় পাওয়া যায়, তাহার বিচার পরে হইবে। এখানে এইটুকু লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইল যে কাহ্নুর রচনা বাঙ্গলা নয়। ইহাও নিশ্চিত যে চর্য্যার কাহ্নুর ভাষা দোঁহার কাহ্নুর ভাষা হইতে ভিন্ন। ইহাও এখানে বলা উচিত যে, দোঁহা দুইখানির ভাষা অল্প বিভিন্ন প্রাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ আর ঐ প্রাকৃতকে বা অপভ্রংশকে এখনকার নির্দিষ্ট প্রদেশের ভাষা বলিলে বেজায় ভুল করা হয়।

ভাষা নির্ণয় করিতে হইলে ও ভাষায় ভাষায় প্রভেদ ধরিতে হইলে ব্যাকরণের বিশেষত্ব দিয়া ধরিতে হয়, গোটাকতক শব্দ দেখিয়া ধরিতে গেলে প্রতি পদে ভুল হইবে; কারণ কাছাকাছি অনেক ভাষাতেই একই রকমের অনেক শব্দ থাকিতে পারে ও থাকে। যে প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত হইতে পূরবিয়া

www.pathagar.com

হিন্দী, মৈথিলী, নেপালী, আসামী, বাঙ্গলা ও ওড়িয়ার উৎপত্তি, সে প্রাকৃত পড়িতে গেলে ওড়িয়া বাঙ্গালী প্রভৃতি সাধারণ পাঠকদের মনে হইবে যে ঐ ভাষা তাহার নিজের ভাষার সঙ্গেই কেবল মিলিতেছে, আর সে ভাষা কেবল তাহারই নিজস্ব। প্রাকৃতে জ্ঞান থাকিলে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা জানা থাকিলে সেরূপ ভুল হয় না। প্রাচীন সময়ের পূর্বাঞ্চলের মাগধী ভাষা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার পর কোথাও হইয়াছে হিন্দী, কোথাও ওড়িয়া ও কোথাও বাঙ্গলা; এইরূপ বিশেষত্ব জমিবার পূর্বের ভাষাকে কোন প্রাদেশিক ভাষা বলা চলে না। গোটাকতক শব্দের মোহে পণ্ডিত হরপ্রসাদ এই মোটা কথাটায় ভুল করিয়াছেন।

ওড়িয়ার কাঁহি (কোথায়), তুঁহি (সেখানে), যঁহি (যেখানে), এথু বা এঠুঁ (এখান থেকে বা থে), বাহিররে (বাহিরে), মোতে (আমাকে বা মোএ বা মোরে বা মোকে বা মোক্), তোহর (তোর), করিবি বা করিমি (আমি করিব), এণু (একারণে) প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি ওড়িয়ার নিজস্ব—অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা। ওড়িয়াতে ভাব প্রকাশের যে বিশেষ রীতি-সিদ্ধি (Idiomatic use) আছে, তাহাও সেই ভাষার বিশেষত্ব; আমরা যেমন বলি নিয়ে-টিয়ে অথবা নিয়ে-থুয়ে, সেই রকম পশ্চিম ওড়িষায় পাই ঘেনি-মেলি, ঠিক যেমনটি ৬নং গানের প্রথমেই আছে; ঐরূপ রীতিসিদ্ধ প্রয়োগকে প্রাদেশিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, কোন রকমে অন্য ভাষায় টানিয়া লওয়া চলে না। এই অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরিয়া যদি কেহ চর্য্যাগানগুলি পড়েন, তবে যেখানে ওড়িয়ার প্রাদেশিকতার প্রভাব আছে তাহা সুস্পষ্ট হইবে। শব্দের প্রাদেশিকতা পাকা প্রমাণের জন্য লওয়া শক্ত, তবুও অন্য প্রাদেশিকতার সঙ্গে মিলাইলে প্রমাণের মূল্য বাড়ে; এই শ্রেণীর দুইটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালক শব্দ স্ত্রী প্রত্যয়ে হয় বালিকা না হয় বালা; উহার "বালি" রূপটি কেবল ওড়িষায় অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যন্ত পাই। মাল্য বা মালা কথাটি ওড়িয়া ভাষায় চিরকালই মালি-রূপে পাই। যে সব গানে পাঠকেরা ওড়িয়ার প্রভাব দেখিবেন, সেখানে বালি ও মালি প্রত্যক্ষ করিবেন। আরও ওড়িয়া ব্যাকরণের ও রীতিসিদ্ধির দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, কিন্তু প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী পাঠককে ওড়িয়ার প্রয়োগ যেরূপ বুঝাইবার প্রয়োজন, হিন্দীর সম্বন্ধে তত প্রয়োজন নাই। এয়্সা, যেয়্সা, এইসন্, কইসন্ অধিকরণে "মে" বিভক্তি, করণ কারকে "সে" বিভক্তি প্রভৃতি অনেকের নিকটেই পরিচিত। বাঙ্গলার যে "কি" What অর্থ-জ্ঞাপক হিন্দীতে উহার সাহিত্যিক রূপ "কিয়া," আর সাধারণ লোকমুখের প্রয়োগ—"কা," যেমন প্রথম গানেই—"কা করি আই" পদে পাই। এইরূপ "কা" যে হিন্দীর প্রাদেশিক—কোনরূপে বাঙ্গলা নয় তাহা

www.pathagar.com

নিশ্চিত। উল্লিখিত প্রথম গানের মধ্য হইতে ভুল পাঠের "পাটের" উঠিয়া যাওয়ায় এমন একটা প্রাদেশিক কথা নাই যাহা প্রাকৃত রচনার মধ্যে নিবিষ্ট হিন্দী প্রাদেশিক শব্দ নয়। লুই ঠাকুর সাতগাঁ এর পুকুরের মাছ উপন্যাসের কল্পনায় খাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কিছু বাঙ্গলায় লেখেন নাই; লুই এর রচিত গান আছে দুইটি, যথা ঃ প্রথম ও ২৯নং গান। প্রথম গানের এক স্থানে অর্থ করিতে ভুল করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গালা পাইয়াছেন; সেটি বুঝাইতেছি। চর্য্যার অবধূতদের ধর্ম হইল এই যে, কোন সমাধিতে ফল নাই, শরীরকে কোন কষ্ট দেওয়ায় ফল নাই, কেবল অবধূতিকাদের সঙ্গে কোন এক শ্রেণীর সহজানন্দ গুরুর উপদেশ অনুসারে পাওয়াই ধর্ম; তাহা না করিলে উদ্দিষ্ট সুখ দুঃখের হেতুতে (তেঁ) মরিয়া যায় ! এ অর্থ ধরিলে বাঙ্গলা বাহির হইত না।

২৯নং গানের "জাহের" ও "কাহেরে" একটু বুঝাইতে হয়; ঐ দুইটি পুরবিয়া হিন্দীতে-বিশেষ শবর দেশের লরিয়া ভাষাতে চলিত আছে; কিম্ হইতে উৎপন্ন হিন্দী শব্দের একটি দ্বিতীয়রূপ "কাহ," আর সেই শব্দের গায়ে প্রত্যয় বসিয়াছে। আর একটি প্রয়োগের কথা বলিতেছি। পাঠান্তরে যেখানে পাইতেছি "ময়, দিবোঁ," সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন—দিবি ; এক দিকে "আমি দিবি" বাঙ্গলায় হয় না, অন্যদিকে টীকায় পাইতেছি "ময়া দাতব্য"; কাজেই "দিবি" কে কোন প্রকারে—বাঙ্গলার "দিবি" করা চলে না। লুই ছাড়া আরও কয়েক জনের রচনা হিন্দীবহুল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৌদ্ধগান স্থান বিশেষে যখন পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন তখন যদুবাবু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, এ যে পাকা হিন্দী", শাস্ত্রী মহাশয় তাহা শুনিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন— "Certainly not," ও তাহার পর চলিয়া গেলেন।

যে সকল গানে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব আছে সেগুলি এ সমালোচনায় নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে, নানা প্রদেশের সহজিয়াদের পুরুষ-মেয়েরা খুব সম্ভব উত্তম-পশ্চিমের কোন একটি স্থানে আড্ডা গাড়িয়া এই সকল গান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন। পূর্বাঞ্চলের মাগধী ভাষার কাঠামোর মধ্যে (অনেক স্থলে প্রাচীন মাগধীর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া) ওড়িয়া, হিন্দী, নেপালী, মৈথিলী, বাঙ্গলা কি অবস্থায় ঢুকিতে পাইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন কালের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে যে গানগুলি প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রাদেশিক অবধূত গায়কদের মুখে পরিবর্তিত হইয়া খিঁচুড়ি পাকাইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ গানের যাঁহারা রচয়িতা তাঁহারাই এমন একালের অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন ও একালের আচারাদির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে স্বয়ং

www.pathagar.com

লেখকদিগকে একালের হইতে হয়। পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে এদেশে পারদের ব্যবহার চলিত হইবার পর উহার রসানে দীর্ঘজীবি বা চিরজীবি হইবার যে সাধনা হইয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতেই পারে না। এইরূপ আর যে সকল দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়াছি, তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না। এই হালের যুগের সকল প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। কাজেই সে সময়ে যাঁহারা কোন কারণে প্রাচীন সময়ের ভাষায় চেষ্টা করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাহাদের রচনায় আপনাদের প্রাদেশিকতা অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, নহিলে ছত্রের পর ছত্র প্রাদেশিক ভাষার মূলের সুর বজায় রাখিয়া লিখিত হইতে পারিত না। সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দনাথ শীল মহাশয় মনে করেন যে গানগুলিতে যে অপভ্রংশ বা প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায় উহাতেই অনেক কাল ধরিয়া সহজিয়াদের সম্প্রদায়ে রচনা করিবার পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই পদ্ধতি অনুসারে একালের লোকেরা প্রাচীন অপভ্রংশে পদ রচনা করিতে গিয়া যে যাহার নিজের প্রাদেশিকতা নিজের রচনায় জুড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রাদেশিক ভাষা চলনের পর ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্তও যে প্রাকৃত ভাষায় রচনা করিবার পদ্ধতি বা ফেশান চলিয়াছিল, প্রাকৃত পইঙ্গল গ্রন্থখানিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

চর্য্যাগানগুলির খাঁটি অর্থের আভাষটুকু পাইলেও পাঠকেরা দেখিবেন যে চর্য্যাগানগুলিকে ঠিক বৌদ্ধ গান নাম দেওয়া কঠিন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বইখানির দ্বিতীয় নাম দিয়াছেন—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষা"; আমরা যতটুকু সমালোচনা করিয়াছি তাহাতেই দেখিতেছি, উহা হাজার বছরের পুরাণো নয় ও ঐ ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা বলা চলে না, গান বিশেষে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব থাকিলেও বলা চলে না। তাহা হইলে ইউরোপীয় একটি বাণীতে যেমন Holy Roman Empire সম্বন্ধে বলা হয় যে উহা Holy নহে, Roman নহে, Empire-ও নহে, অবস্থাটি সেই রকম দাঁড়াইতেছে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
❑ ৪৩৫/এ/১ এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
❑ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম
❑ ৫৫ খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা